অগ্রসর কর্মী প্রশিক্ষণ সহায়িকা

(দরসে কুরআন, বিষয়ভিত্তিক আয়াত-হাদিস, ইসলামী বই নোট)

সুচী পৃষ্ঠা

অনুশীলনী- ০১ঃ জানুয়ারী-১ম সপ্তাহঃ
দারস তৈরী - সূরা বাকারা (২৫৫), ৩
বই: গঠনতন্ত্র ৪
তাওহিদ সংক্রান্ত আয়াতুল কুরসি ও ৩
তাওহিদ সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, ৮
মাসয়ালা: বিভিন্ন নামাজ সংক্রান্ত। ৮

অনুশীলনী- ০২ঃ জানুয়ারী-৩য় সপ্তাহঃ
দারস তৈরী - সূরা যিলযাল ১৪
বই: সংগঠন পদ্ধতি ১৯
তাওহিদ সংক্রান্ত সূরা হাশরের শেষ রুকু মুখস্ত, ২৩
তাওহিদ সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, ৮
মাসয়ালা: বিভিন্ন নামাজ সংক্রান্ত ৮

অনুশীলনী- ০৩ঃ ফেব্রুয়ারী-১ম সপ্তাহঃ
দারস তৈরী - সূরা তাকাসুর ২৩
বই: সাফল্যের শর্তাবলী, ৩১
তাওহিদ সংক্রান্তআয়াতুল কুরসি ও ৩
সূরা হাশরের শেষ রুকু মুখস্ত ও ২৩
তাওহিদ সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, ৮
মাসয়ালা: বিভিন্ন নামাজ সংক্রান্ত। ৮

অনুশীলনী- ০৪ঃ ফেব্রুয়ারী-৩য় সপ্তাহঃ
দারস তৈরী - সূরা যিলযাল ১৪
বই: তাফহিমুল কুরআনের ভূমিকা ১৯
দাওয়াত সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত, ২৩
দাওয়াত সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, ৮
মাসয়ালা: বিভিন্ন নামাজ সংক্রান্ত। ৮

অনুশীলনী- ০৫ঃ মার্চ- ১ম সপ্তাহঃ
দারস তৈরী- সূরা আসর, ০
বই: চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান,
দাওয়াত সংক্রান্ত আয়াত আল ইমরান-১০৪, ইউসুফ-১০৮, আন নাহল-১২৫, হামীম আস সাজদাহ-৩৩, মায়েদা-৬৭ ও
দাওয়াত সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত,
মাসয়ালা: সিয়াম সংক্রান্ত।

অনুশীলনী- ০৬ঃ মার্চ- ৩য় সপ্তাহঃ
দারস তৈরী - সূরা আলাক (১-৫ নং আয়াত), ০
বই: ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়,
দাওয়াত সংক্রান্ত আয়াত আল ইমরান-১০৪, ইউসূফ-১০৮, আন নাহল-১২৫, হামীম আস সাজদাহ-৩৩, মায়েদা-৬৭ ও
দাওয়াত সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত,
মাসয়ালা: সিয়াম সংক্রান্ত।

অনুশীলনী- ০৭ঃ এপ্রিল- ১ম সপ্তাহঃ
দারস তৈরী - সূরা তওবা (১১১ ও ১১২ নং আয়াত) ০
বই: ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পারিক সম্পর্ক,
আন্দোলন সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত সূরা নিসা-৭৪ ও ৭৬, তওবা-২৪ ও ৩৮-৪১, আস-সাফ-৯,১০,১১,১২, আশ-শুরা-১৩, হজ্জ-৭৮ ও
আন্দোলন সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত,
মাসয়ালা: যাকাত সংক্রান্ত।

অনুশীলনী- ০৮ঃ এপ্রিল- ৩য় সপ্তাহঃ
দারস তৈরী - সূরা- ইখলাস, ০
বই: ইসলামী সংগঠন, আন্দোলন সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত সূরা নিসা-৭৪ ও ৭৬, তওবা-২৪ ও ৩৮-৪১, আস-সাফ-৯,১০,১১,১২, আশশুরা- ১৩, হজ্জ-৭৮ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালা: রোজা সংক্রান্ত।

অনুশীলনী- ০৯ঃ মে- ১ম সপ্তাহঃ
দারস তৈরী - সূরা লাহাব, বই: গঠনতন্ত্র, সংগঠন সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল- ইমরান-১০৩,১০৪, আস সফ- ৪, ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালা: ঈদের নামাজ সংক্রান্ত। ০

অনুশীলনী- ১০ঃ মে- ৩য় সপ্তাহঃ
দারস তৈরী - সূরা মু'মেনুন (১-১১ নং আয়াত), বই: রুকনিয়াতের আসল চেতনা, সংগঠন সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল-ইমরান-১০৩,১০৪, আস সফ- ৪, ও ১টি হাদীস মুখস্ত মাসয়ালা: তাহারাত সংক্রান্ত। ০

অনুশীলনী- ১১ঃ জুন- ১ম সপ্তাহঃ
দারস তৈরী - সূরা ইমরান (১৯-২২ নং আয়াত), বই: ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি, তাকওয়া সংক্রান্তআয়াত মুখস্ত আল-বাকারাহ:১৭৭ ও ২৫৫, আল ইমরান: ১০২, ও একটি হাদীস মুখস্ত। মাসয়ালা: তাহারাত সংক্রান্ত। ০

অনুশীলনী- ১২ঃ জুন- ৩য় সপ্তাহঃ
দারস তৈরী - সূরা বাকারা (১৫৩-১৫৬ নং আয়াত), বই: ইসলাম ও জাহেলিয়াত, তাকওয়া সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল-বাকারাহ:১৭৭ ও ২৫৫, আল ইমরান: ১০২, ও একটি হাদীস মুখস্ত। মাসয়ালা: ঈদের নামাজ সংক্রান্ত। ০

অনুশীলনী- ১৩ঃ জুলাই- ১ম সপ্তাহঃ
দারস তৈরী - সূরা ইনফিতার, বই: সত্যের সাক্ষ্য, বাইয়াত সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আত-তওবা: ১১১, আন'আম: ১৬২, আল-ফাতহ: ১০ ও ১৮, মুমতাহিনা: ১২ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালা: নামাজ সংক্রান্ত। ০

অনুশীলনী- ১৪ঃ জুলাই- ৩য় সপ্তাহঃ
০

দারস তৈরী -সূরা ইনফিতার, বই: জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, বাইয়াত সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আত-তওবা: ১১১, আন'আম: ১৬২, আল-ফাতহ: ১০ ও ১৮, মুমতাহিনা: ১২ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালা: নামাজ সংক্রান্ত।

অনুশীলনী- ১৫ঃ আগষ্ট-১ম সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা বাকারা (১-৫ নং আয়াত), বিষয়: হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল-বাকারা: ২৬১, আল-ইমরান: ৯২, আল-হাদীদ: ১১ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালা: তাহারাত সংক্রান্ত। ০

অনুশীলনী- ১৬ঃ আগষ্ট-৩য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা নাস, বই: ইকামাতে দ্বীন, ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল-বাকারা: ২৬১, আল-ইমরান: ৯২, আল-হাদীদ: ১১ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালা: তাহারাত সংক্রান্ত। ০

অনুশীলনী- ১৭ঃ সেপ্টেম্বর-১ম সপ্তাহঃ ০

দারস তৈরী -সূরা মুদ্দাসির(১-৭নংআয়াত) ০

বই: রাসূলুল্লাহার (সা:) বিপ্লবী জীবন, ০

ইমানি পরীক্ষা সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল বাকারা: ২১৪, আনকাবুত: ১,২,৩ ও ১১২

ইমানি পরীক্ষা সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, ০

মাসয়ালা: হাজ্ব (১১৭) ও নামাজ (পৃষ্ঠা-৮) সংক্রান্ত।

অনুশীলনী- ১৮ঃ সেপ্টেম্বর-৩য় সপ্তাহঃ ০

দারস তৈরী -সূরা ফীল, ০

বই: ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, ০

ইমানি পরীক্ষা সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল বাকারা: ২১৪, আনকাবুত: ১,২,৩ ও ১১২

ইমানি পরীক্ষা সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, ০

মাসয়ালা: হাজ্ব (১১৭) ও নামাজ (পৃষ্ঠা-৮) সংক্রান্ত।

অনুশীলনী- ১৯ঃ অক্টোবর-১ম সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা হুজুরাত ১ম রুকু, বই: ইসলাম পরিচিতি, আনুগত্য সংক্রান্ত ১টি আয়াত মুখস্ত আন নিসা: ৫৯ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালা: আক্বিকা সংক্রান্ত। ০

অনুশীলনী- ২০ঃ অক্টোবর-৩য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা আহযাব (৩৫ নং আয়াত), বই: ইসলামী সংগঠন, বিভিন্ন দোয়া মুখস্ত, মাসয়ালা: আক্বিকা সংক্রান্ত। ০

অনুশীলনী- ২১ঃ নভেম্বর-১ম সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা ইখলাস, বই: পলাশী থেকে বাংলাদেশ, পরামর্শ সংক্রান্ত ১টি আয়াত ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালা: সাদাকা সংক্রান্ত। ০

অনুশীলনী- ২২ঃ নভেম্বর-৩য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা কাউসার, বই: ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ, ত্যাগ কুরবানী সংক্রান্ত ১টি আয়াত ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালা: নামাজ সংক্রান্ত। ০

অনুশীলনী- ২৩ঃ ডিসেম্বর-১ম সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা হজ্ব (১ ও ২ নং আয়াত), বই: ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্তআয়াত মুখস্ত আল-বাকারা: ২৬১, আল-ইমরান: ৯২, আল-হাদীদ: ১১ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালা: দাফন-কাফন সংক্রান্ত। ০

অনুশীলনী- ২৪ঃ ডিসেম্বর-৩য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা হাশর শেষ রুকু, বই: সত্যের সাক্ষ্য, তাওহিদ সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত সূরা বাকারা: ২৮৫ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালা: দাফন-কাফন সংক্রান্ত। ০

বি:দ্র: সহী কোরআন তেলাওয়াত, নামাজে পঠিত আমপারার সূরাগুলোর সহী তেলাওয়াত ও অর্থ যত্ন সহকারে প্রতি মাসে মশক করতে হবে। মাসের পড়া মাসেই শেষ করতে হবে, এ পড়ার পাশাপাশি সিলেবাসের বই অধ্যয়ন করে শেষ করতে হবে। ব্যক্তিগত রিপোর্টের মান প্রতিদিন বৃদ্ধি করতে হবে। সর্বাবস্থায় সবর, সাহস, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও দ্বিধাহীন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আর তাহলেই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ রাশি আমাদের উপর বর্ষিত হবে। মাসিক ব্যক্তিগত আয়ের কমপক্ষে ৫% এয়ানত দেয়া শুরু করতে হবে। দৃষ্টি আকর্ষণ: এই সিলেবাসের আলোকে উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে বাইয়াতের জন্য তৈরী করতে হবে।

অনুশীলনী -০১

জানুয়ারী-১ম সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা বাকারা (২৫৫),

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾

(২৫৫) আল্লাহ ; তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। [১] তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী [২] আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম।

সুরা আল বাকারা, **নামকরনঃ** সূরা আল বাকারার নামকরণ করা হয়েছে 'বাকারাহ' শব্দটি থেকে, যার অর্থ গাভী। এই নামকরণ করা হয়েছে কারণ এই সূরার ৬৭ থেকে ৭৩ নম্বর আয়াতে হযরত মুসা (আ.)-এর সময়ের বনী ইসরাঈলের একটি গাভী জবাই করার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

সূরা আল বাকারার নামকরণের প্রেক্ষাপট:

সূরা আল বাকারার ৬৭ থেকে ৭৩ নম্বর আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতির এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিল, এবং হত্যার রহস্য উন্মোচনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হওয়ার কারণে, সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে "আল বাকারাহ" (অর্থ: গাভী)।

কুরআনের অন্যান্য সূরার মতো, আল বাকারার নামকরণও একটি বিশেষ ঘটনার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যা এই সূরার বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করে।

সুতরাং, সূরা আল বাকারার নামকরণ "আল বাকারাহ" মূলত বনী ইসরাঈলের সেই গাভী জবাই করার ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

সূরা বাকারার শানে নুযুল (নাযিলের প্রেক্ষাপট) বেশ বিস্তৃত এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা ও প্রেক্ষাপট অন্তর্ভুক্ত। এটি ***মদিনায় অবতীর্ণ*** হয়েছে এবং এতে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, বিধি-বিধান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি আচরণ, পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী, এবং ইহুদি ও মুনাফিকদের কার্যকলাপ সহ বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে।

সূরা বাকারার বৈশিষ্ট সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

মদিনায় অবতীর্ণ: সূরা আল-বাকারার অধিকাংশ আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে, যেখানে মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা: এই সূরায় তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, ইবাদত, হালাল-হারাম, পারস্পরিক সম্পর্ক, ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

বিধি-বিধান: এতে সালাত, যাকাত, সাওম, হজ, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ বিভিন্ন বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী: হযরত মুসা (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.) সহ বিভিন্ন নবীর কাহিনী ও তাদের উম্মতের প্রতি আল্লাহর বিভিন্ন নির্দেশনার বর্ণনা রয়েছে।

মুনাফিক ও ইহুদিদের কার্যকলাপ: মদিনার ইহুদি ও মুনাফিকদের আচরণ এবং তাদের প্রতিবাদের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ আয়াতও এই সূরায় অন্তর্ভুক্ত।

গাভীর ঘটনা: সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে 'বাকারাহ' (অর্থ গাভী), যা হযরত মুসা (আ.) এর সময়ের বনী ইসরাঈলের একটি গাভী জবাই করার ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

দীর্ঘতম সূরা: এটি কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ সূরা এবং এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আয়াত ও বিধি-বিধান রয়েছে।

সূরা বাকারার আয়াতগুলো নাজিলের প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়।

বই: গঠনতন্ত্র,
গঠনতন্ত্রঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

- ভূমিকাঃ
- **যেহেতু**
    - মহান আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতিত কোন ইলাহ নাই এবং নিখিল বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহ তা'য়ালার প্রবর্তিত প্রাকৃতিক আইনসমুহ একমাত্র তাহারই বিচক্ষণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্যদান করিতেছেঃ
    - আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন।
    - আল্লাহ তা'য়ালা সত্যের নির্দেশনাসহ যুগে যগে নবী-রাসুলগনকে প্রেরণ করিয়াছেন।
    - বিশ্বনবী মুহাম্মদ সা. আল্লাহ তা'য়ালার সর্বশেষ নবী ও রাসুল এবং আল্লাহ তা'য়ালার প্রেরিত আল কুআন ও রাসুল সা. এর সুন্নাহই হইতেছে বিশ্বমানবতার অনুসরণীয় আদর্শ;।
    - মানুষকে তাহার পার্থিব জীবনকে ভাল-মন্দ কাজের পুঙ্খানো পুঙ্খানো হিসাব দিতে হইবে এবং বিচারের পর জান্নাত অথবা জাহান্নাম রুপে ইহার যথাযথ ফলাফল ভোগ করিতে হইবে।
    - আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুটি অর্জণ করিয়া জাহান্নামের আজাব থেকে নাজাত এবং জান্নাতের অনন্ত সুখ ও অনাবিল শান্তি লাভের মধ্যেই মানব জীবনের প্রতৃত সাফল্য নিহিত।

- সেহেতু
    - এই সকল মৌলিক বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে শোষণমুক্ত, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনের মহান উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর এই গঠনতন্ত্র প্রণীত ও প্রবর্তিত হইল।

- ধারাঃ০১ - নামকরণ
    - এই সংগঠনের নাম হইবে- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
- ধারাঃ০২ - ঈমান ও আক্বীদা
    - ঈমান ও আক্বীদাঃ
        - কুরআন ও সহীহ হাদীসে নির্দেশিত ঈমান ও আক্বীদাহই জামায়াতে ইসলামীর অনুসারীগন পোষণ করিয়া থাকেন। তাহার মুল কথা হইলোঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতিত কোন ইলাহ নাই মুহাম্মদ সা. আল্লাহ তা'য়ালার রাসুল।
- ঈমান ও আক্বীদার প্রথমাংশ হলোঃ আল্লাহ তা'য়ালার একমাত্র ইলাহ হওয়া। অর্থাৎ-

- আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতিত আর কাহাকেও সাহায্যকারী মনে না করা।

- আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতিত আর কাহাকেও কল্যাণকামী মনে না করা।
- আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতিত আর কাহারও নিকট প্রার্থনা না করা।
- আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতিত আর কাহারও নিকট মাথানত না করা।
- আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতিত আর কাহাকেও ক্ষমতার মালিক মনে না করা।

❖ ঈমান ও আক্বীদার দ্বিতিয়াংশ হলো- "মুহাম্ দ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'য়ালার রাসুল। অর্থাৎ

- আল্লাহর রাসুল সা. এর হিদায়াত ও আইন বিধানকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহন করা।
- যে কোন কাজে রাসুল সা. এর আদেশ ও নিষেধকে যথেষ্ট মনে করা।
- রাসুল সা. ব্যতিত আর কাউকে নেতা না মানা ।
- আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সা. এর সুন্নাহই একমাত্র উৎস মনে করা।
- সকল কিছুর উর্দ্ধে রাসুল সা. এর ভালবাসা।
- রাসুল সা. কে সত্যের মাপকাঠি মনে করা।
- রাসুল সা. ব্যতিত আর কারো আনুগত্য না করা ।

❖ ধারাঃ০৩ - উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

❖ **উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ** "বাংলাদেশে নিয়মতান্ত্রিক ও গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন"।

❖ ধারাঃ০৪ - স্থায়ী কর্মনীতি

- কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন কিংবা কোন কর্মপন্থা গ্রহনের সময় জামায়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসুল সা. এর নির্দেশ ও বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিবে।
- উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ***এমন কোন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করিবেনা*** যাহা সততা ও বিশ্বাস পরায়নতার পরিপন্থি কিংবা যাহার ফলে দুনিয়ায় ফিতনা ও ফাসাদ তৈরি হয়।
- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উহার বাঞ্চিত ***সংশোধন ও সংস্কার*** কার্যকর করিবার জন্য ***নিয়মতান্ত্রিক ও গনতান্ত্রিক*** পন্থা অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ ইসলামের ***দাওয়াত সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মানবিক, নৈতিক চরিত্রের সংশোধন এবং বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে*** পরিণত করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অনুকুলে জনমত গঠন করিবে।

❖ ধারাঃ০৫ - তিন দফা দাওয়াত

- সাধারনভাবে সকল মানুষ ও বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব ও রাসুল সা. এর আনুগত্য করিবার আহবান।
- ইসলাম গ্রহনকারী ও ঈমানের দাবীদার সকল মানুষের প্রতি বাস্তব জীবনে কথা ও কাজের মিল গরমিল পরিহার করিয়া খাঁটি ও পূর্ণ মুসলিম হওয়ার আহবান।
- সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে নিয়মতান্ত্রিক ও গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুবিচারপূর্ণ শাসন ক্বায়েম করিয়া সমাজ হইতে সকল প্রকার জুলুম, শোষণ, দুর্নীতি ও অবিচারের অবসান ঘটানোর আহবান।

❖ **ধারাঃ০৬ - স্থায়ী কর্মসূচী**

- দাওয়াত ও দাবলীগ (চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পূনর্গঠন)
- তানযিম ও তারবিয়াত (সংগঠন ও প্রশিক্ষণ)
- ইসলাহে মু'য়াসারা (সমাজ সংস্কার ও সমাজসেবা)
- ইসলাহে হুকুমত(রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও সংশোধন)

❖ ধারাঃ ০৭ - রুকন হইবার শর্তাবলী

- ব্যক্তিগত জীবনে **ফরজ ওয়াজীবসমূহ** যথাযথভাবে আদায় করেন এবং কবীরা গুনাহ হইত বিরত থাকেন।
- উপার্জনেরে এমন কোন পন্থা অবলম্বন না করেন যাহা **আল্লাহ তা'য়ালার নাফরমানির** পর্যায়ে পড়ে।

- হারাম পথে অর্জিত কিংবা **হকদারের হক** নষ্ট করা কোন সম্পদ বা সম্পত্তি তাঁহার দখলে থাকিরে তাহা পরিত্যাগ করেন বা হক্বদারকে ফেরত দেন।

- মৌলিক মানবীয় গুনাবলী অর্জনের বিচারে আশাব্যাঞ্জক অবস্থানে রয়েছেন।
- **এমন কোন পার্টি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক** না রাখেন যাহার মুলনীতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ইসলামের ঈমান ও আক্বীদা এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মনীতির পরিপন্থি।
- জামায়াতের সাংগঠনিক দায়িত্বশীলগনের দৃষ্টিতে রুকন হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

❖ **ধারাঃ০৯ - রুকনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য**

(ক) জামায়াতে শামিল হওয়ার পর প্রত্যেক রুকন নিজের জীবনে পরিবর্তনের জন্য যেসব বিষয়ে সর্বদা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিবেন-

- দ্বীন সম্পর্কে অন্তত এতটুকু জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে যাহাতে তিনি **ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পার্থক্য** বুঝতে পারিবেন এবং আল্লাহ তাৎয়ালার নির্ধারিত শরীয়তের সীমা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইবেন।
- নিজের ঈমান-আক্বীদা, চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি-কাজ-কর্মকে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক গড়িয়া লইবেন। নিজ জীবনের উদ্দেশ্য, মূল্যমান, পছন্দ-অপছন্দ, এবং আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু সবকিছুকে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তোষের অনুকুলে আনয়ন করিবেন এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মপূজা পরিহার করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরুপে আল্লাহ তা'য়ালার বিধানের একান্ত অনুসারী ও অধীন বানাইয়া লইবেন।
- আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব ও রাসুল সা. এর সুন্নাতের বিপরীত সকল প্রকার জাহিলি নিয়ম-প্রথা ও রসম-রেওয়াজ এবং কুসংস্কার হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র করিবেন এবং ভিতর ও বাহিরকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে অধিকতর প্রচেষ্টা চালাইবেন।
- আত্মম্বরিতা ও পার্থিব স্বার্থের ভিত্তিতে যেসব হিংসা-বিদ্বেষ, ঝোক-প্রবণতা, ঝগড়া-ঝাটি ও বাক-বিতন্ডার সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং দ্বীন ইসলামে যেসব বিষয়ের কোন গুরুত্ব নাই তাহা হইতে নিজের অন্তর ও জীবনকে পবিত্র রাখিবেন।
- ফাসিক ও আল্লাহ বিমূখ লোকদের সহিত দ্বীনের প্রয়োজন ব্যতিত সকল বন্ধুত্ব-ভালবাসা পরিহার করিয়া চলিবেন এবং নেক লোকদের সহিত দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করিবেন।
- নিজের সকল কাজ আল্লাহভীতি, আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসুল মুহাম্মদ সা. এর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য, সততা ও ন্যায় পরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পন্ন করিবেন।
- নিজ পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও পারিপার্শ্বিক এলাকার লোকদের মধ্যে দ্বীনি ভাবধারা প্রচার ও প্রসার এবং দ্বীনের স্বাক্ষ্যদানের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।
- দ্বীন ক্বায়েমের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়া নিজের সকল চেষ্টা-সাধনা নিয়ন্ত্রিত করিবেন এবং ***জীবন ধারনের প্রকৃত প্রয়োজন ব্যতিত এই উদ্দেশ্যর দিকে পরিচালিত করে না*** এমন সকল প্রকার তৎপরতা হতে নিজেকে বিরত রাখিবেন।
- দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকিবেন।

(খ) প্রত্যেক রুকন পরিচিতদের মধ্যে এবং উহার বাইরে যেখানে পৌঁছিতে পারেন ইসলামের ঈমান ও আক্বীদা এবং জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য লক্ষ্য সবিস্তারে বর্ণনা করিবেন। যাহারা এই প্রচেষ্টা চালাইবার প্রস্তুত হইবেন, তাহাদেরকে জামায়াতে ইসলামীর রুকন হওয়ার আহ্বান জানাইবেন।

❖ **ধারাঃ১০ - মহিলা রুকনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য**

জামায়াতে ইসলামীর মহিলা রুকনগন তাহাদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের ০৯ ধারায় উল্লেখিত সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে হইবে। অবশ্য তাহাদিগকে নিম্নলিখিত কর্তব্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবেঃ

- নিজের স্বামী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, এবং পরিচিত ও অপরিচিত অন্যান্য মহিলাদের ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত পেশ করিবেন।
- নিজের সন্তান-সন্ততির অন্তরে ঈমানের আলো সৃষ্টি করিতে এবং তাহাদিগকে ইসলামের অনুসারী বানাইতে চেষ্টা করিবেন।
- তাঁহার স্বামী, সন্তান, পিতা ও ভাই-বোন যদি জামায়াতে শামিল হইয়া থাকেন, আন্তরিকতার সহিত তাহাদিগকে সাহসী ও আশাবাদী করিয়া তুলিবেন। জামায়াতের কাজে যথাসম্ভব তাহাদিগকে সহযোগীতা করিবেন এবং এই পথে কোন বিপদ আসিয়া পড়িলে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করিবেন।
- তাঁহার স্বামী, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এবং পরিবারের কোন সদস্য যদি ইসলাম পরিপন্থি কাজে লিপ্ত থাকেন তবে ধৈর্য সহকারে তাঁহাদের সংশোধনের চেষ্টা করিবেন।

❖ **ধারাঃ১৩ - জামায়াতের সাংগঠনিক স্তরঃ**

- কেন্দ্রীয় সংগঠন
- জেলা/মহানগরী সংগঠন
- উপজেলা/থানা সংগঠন
- ইউনিয়ন/পৌরসভা সংগঠন
- ওয়ার্ড সংগঠন
- ইউনিট সংগঠন

❖ **ধারাঃ১৪ - কেন্দ্রীয় সংগঠন**

১. আমীরে জামায়াত
২. কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন
৩. জাতীয় কাউন্সিল
৪. কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা
৫. কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ
৬. কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

❖ **ধারাঃ৬৭ - বায়তুল মালের আয়ের উৎস**

জামায়াতের বায়তুল মালের আয়ের উৎস হইবেঃ

- রুকন, কর্মী, সহযোগী ও সুধীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত।
  - ক. মাসিক এয়ানত।
  - খ. যাকাত-উশর।
  - গ. এককালীন দান।
- অধস্তন সংগঠন হইতে প্রাপ্ত নির্ধারিত মাসিক আয় ।
- জামায়াতের নিজস্ব প্রকাশনীর মুনাফা।

❖ **ধারাঃ৭২ - নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়**

- জামায়াতের সকল সাংগঠনিক স্তরে যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন করা কালে কিংবা নিযুক্তকালে ব্যক্তির দ্বীনি ইলম, আল্লাহভীতি, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সা. এর প্রতি আনুগত্য, আমানতদারীতা, দেশপ্রেম, অনড় মনোবল, কর্মে দৃঢ়তা, দূরদৃষ্টি, বিশ্লেষণ শক্তি, উদ্ভাবনি শক্তি, প্রশস্তচিন্তা, সুন্দর ব্যবহার, মেজাজের ভারসাম্য, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা, সাংহঠনিক শৃংখলা বিধানের যোগ্যতা প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন পদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হওয়া বা চেষ্টা করা উক্ত পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হওয়ার জন্য অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

❖ গঠনতন্ত্র রচনা সম্পর্কিত তথ্যঃ

- গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় ১৯৭৯ সনের ২৬ মে কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনে।
- গঠনতন্ত্র কার্যকর করা হয় ১৯৭৯ সনের ২৮ মে।
- গঠনতন্ত্র প্রথম প্রকাশঃ মে ১৯৮০ ইং
- সর্বশেষ সংশোধনীঃ ২২তম সেপ্টেম্বর ২০১৯
- সর্বশেষ প্রকাশঃ জানুয়ারী ২০২০ ইং ৮০তম মুদ্রণ।
- মোট ধারাঃ ৭৭
- মোট পরিশিষ্টঃ ১১

মুখস্থঃ তাওহিদ সংক্রান্ত আয়াত- আয়াতুল কুরসি (পৃষ্ঠা-৩)

তাওহিদ সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ.

৭৩৭৬. জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করেন না, যে মানুষের প্রতি রহম করে না। [৬০১৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৮৬০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৮৭২)

মাসয়ালা: বিভিন্ন নামাজ সংক্রান্তঃ

নামাজের মাসয়ালাগুলো মূলত ফরয (বাধ্যতামূলক), ওয়াজিব (অপরিহার্য), সুন্নাত (সুন্নত) এবং নফল (ঐচ্ছিক) এই চার প্রকারের নামাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে ফরয ও ওয়াজিব নামাজ আবশ্যকীয়, আর সুন্নাত ও নফল নামাজ আদায় করলে সওয়াব পাওয়া যায়, না করলে গুনাহ হয় না। প্রত্যেক প্রকার নামাজের নির্দিষ্ট নিয়ম, শর্ত ও পদ্ধতি রয়েছে যা মেনে নামাজ আদায় করতে হয়।

❖ **নামাজের প্রকারভেদ ও মাসয়ালা**

ফরয নামাজ:

ইসলামের পাঁচটি দৈনিক ফরয নামাজ (ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা) আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। এই নামাজগুলো নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হয় এবং এগুলো বাদ দেওয়া জায়েজ নয়।

ওয়াজিব নামাজ:

ফরযের কাছাকাছি কিছু নামাজ, যেমন বিতর নামাজ, ওয়াজিব হিসেবে গণ্য হয়। এগুলোকেও নিয়মিত আদায় করতে হয়।

সুন্নাত নামাজ:

ফরয নামাজের আগে-পরে আদায় করা হয়। এটি দুই প্রকার: সুন্নতে মুয়াক্কাদা (আদায় করা উচিত) এবং সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা (আদায়ে উৎসাহিত করা হয়েছে, তবে বাধ্যতামূলক নয়)।

নফল নামাজ:

ঐচ্ছিক নামাজ যা ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য সময়ে আদায় করা হয়। যেমন: তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, জাওয়াল ও আউওয়াবিন নামাজ।

সাধারণ মাসয়ালা

পবিত্রতা:

নামাজ আদায়ের জন্য শরীর ও কাপড় পবিত্র হওয়া এবং নামাজের স্থান পবিত্র থাকা আবশ্যক। এছাড়াও ওযু ও গোসলের মাধ্যমে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া জরুরি।

শর্ত:

নামাজ শুরুর আগে কেবলামুখী হওয়া, সতর ঢাকা, নামাজের সময় হওয়া ও নিয়ত করা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

ফরজ:

নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য ১৩টি ফরজ রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি নামাজের বাইরে এবং ৭টি নামাজের ভিতরে।

ওয়াজিব:

নামাজের ১৪টি ওয়াজিব রয়েছে যা আদায় করা উচিত, না করলে সাজদা সাহু (সহজ ভুল সংশোধনের জন্য) দিতে হয়।

কিরাত:

নফল নামাজে সাধারণত আস্তে কেরাত পড়া হয়, তবে তারাবীহ ও খুসুফ (সূর্যগ্রহণের নামাজ) এর ব্যতিক্রম।

গুরুত্বপূর্ণ দিক

জামাতের নামাজ:

নফল নামাজ সাধারণত একা আদায় করা হয়, তবে জামাতে পড়ার কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন তারাবীহ ও বেতরের নামাজ।

নামাজের ভুল:

ইমামের ভুল হলে মুক্তাদী লোকমা দিয়ে তা সংশোধন করতে পারেন। তবে তা কখন করা হলো, তার ওপর নির্ভর করে নামাজ সহীহ হবে কি না।

নামায সংক্রান্ত মাসআলাঃ

নামাজের মাসআলা বা নামাজের নিয়মকানুন ইসলামিক শরিয়তে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে নামাজের **মৌলিক** বিষয়, যেমন - ওযু, কিবলামুখী হওয়া, নামাজের নিয়ত, রুকু, সিজদা, শেষ বৈঠক এবং সালাম ফেরানো সহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।
নামাজের মাসআলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক:
ওযু:নামাজের পূর্বে অবশ্যই ওযু করা ফরজ। ওযুর নিয়মাবলী সঠিকভাবে পালন করতে হবে।
কিবলামুখী হওয়া:নামাজের জন্য কিবলামুখী হওয়া ফরজ। কিবলা হলো মক্কার মসজিদুল হারামের কাবার দিক।
নিয়ত:প্রত্যেক নামাজের জন্য মনে মনে অথবা মনে মনে সংকল্প করে মুখে নিয়ত করা সুন্নত।
রুকু:রুকুতে গিয়ে সোজা হয়ে পিঠ ও মাথা সোজা করে দাঁড়ানো এবং "সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম" তিনবার পড়া সুন্নত।

সিজদা:সিজদার সময় কপাল, নাক, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলের মাথা জমিনে রাখা ফরজ। সিজদাতে "**সুবহানা রাব্বিয়াল আলা**" তিনবার পড়া সুন্নত।

শেষ বৈঠক:শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ এবং দোয়ায়ে মাসুরা পড়ার পর সালাম ফেরানো হয়।

সালাম ফেরানো:নামাজের শেষে প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে "আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ" বলে সালাম ফেরানো হয়।

অন্যান্য বিষয়:নামাজের মধ্যে মনোযোগ ধরে রাখা এবং দুনিয়াবী চিন্তা পরিহার করা উচিত।

পুরুষ ও মহিলাদের নামাজের পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

ভ্রমণ বা অসুস্থতার কারণে নামাজের কিছু ক্ষেত্রে ছাড়ের বিধান রয়েছে।

ফরজ নামাজের সাথে সাথে সুন্নত ও নফল নামাজ পড়ারও বিধান রয়েছে।

সালাতের ফরয সালাতের ফরজ হল ১৩ টিঃ

যেগুলোর কোন একটি ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিলে সালাত / নামাজ আদায় শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ সালাত শুরুর পূর্বে ৭টি আহকাম (أحكام) আর সালাতের মধ্যে ৬টি আরকান (ارکان) রয়েছে সেগুলোকে সালাত বা নামাজের ফরজ বলা হয়।

সালাতের আহকাম ও আরকান কী?

সালাত শুরুর পূর্বের ফরজসমূহকে আহকাম অন্যদিকে যে ফরজ কাজগুলো সালাতের মধ্যে আদায় করতে হয়, সেগুলোকে সালাতের আরকান বলা হয়। প্রথমে আমরা সালাত / নামাজের আহকাম সম্পর্কে আলোচনা করা হল: ক) সালাতের আহকামসমূহ (أحكام): আহকাম শব্দটি বহুবচন, একবচনে হুকুম। যে ফরজ কাজগুলো নামাজ শুরু করার আগেই করতে হয়, সেগুলোকে সালাতের আহকাম বলা হয়। সালাতের আহকাম মোট সাতটি। নিম্নে সালাত / নামাজের আহকামসূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হল:

১) শরীর পবিত্র হওয়া: সালাত নামাজ আদায় করার জন্য শরীর পাক-পবিত্র হতে হবে। গোসল, অযু বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। শরীর পবিত্র হওয়ার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সালাত / নামাজ আদায়কারীর শরীর পবিত্র হওয়া। (বুখারি, হাদিস নং ২৯৬)। পবিত্রতা অর্জন ছাড়া সালাত / নামাজ শুদ্ধ বা সহিহ হবে না। (বুখারি, হাদিস নং ৬৪৪০)।

২) কাপড় পবিত্র হওয়া: সালাত/ নামাজ আদায়কারীর কাপড় পবিত্র হতে হবে, অর্থাৎ কাপড় বা পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। এই বিষয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। (সূরা মুদ্দাসসির, সূরা নম্বরঃ ৭৪, আয়াত নম্বরঃ ৪)।

৩) জায়গা পবিত্র হওয়া: যে স্থানে সালাত / নামাজ পড়া হবে ওই স্থানটি পবিত্র হতে হবে। জায়গার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো দুই পা, দুই হাত, হাঁটু এবং কপাল রাখার স্থান। ন্যূনতম এটুকু স্থান পবিত্র হতে হবে। এই বিষয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন, وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি কা'বা গৃহকে মানব জাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর এবং ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখিতে আদেশ দিয়াছিলাম। (সূরা আল বাকারাহ, সূরা নম্বরঃ ২, আয়াত নম্বরঃ ১২৫)।

৪) সতর ঢেকে রাখা: অবশ্যই সতর ঢাকা থাকতে হবে। নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই সতর ঢাকা থাকতে হবে। এই বিষয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন- يٰبَنِىْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ হে বনী আদম ! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, আহার করিবে ও পান করিবে কিন্তু, অপচয় করিবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ, সূরা নম্বরঃ ৭, আয়াত নম্বরঃ ৩১)। পুরুষের সতর হল নাভির উপর থেকে হাঁটুর নিচ (টাখনুর উপরে) পর্যন্ত, আর নারীর সতর হল মুখমণ্ডল, দুই হাতের কব্জি ও দুই পায়ের পাতা ব্যতীত সারা শরীর। নামাজের শুরু থেকেই যদি সতরের এক-চতুর্থাংশ উন্মুক্ত থাকে তখনো নামাজ হবে না। নামাজ পড়াকালীন এক রুকন আদায় করার সময় পর্যন্ত যদি সতর খোলা থাকে তাহলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ২/৪৫১, বাদায়ে ১/৪৭৭)

৫) কিবলা মুখী / কাবামুখী হয়ে দাঁড়ানো: কিবলামুখী হওয়া (কাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা)। তবে অসুস্থ এবং অপারগ ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে সালাত / নামাজ আদায় করার এই শর্ত শিথিলযোগ্য। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ কিবলামুখী হয়ে নামাজ না পড়ে, তার নামাজ হবে না। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন- شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِىْ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ যেখান হইতেই তুমি বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। ইহা নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নহেন। তুমি যেখান হইতেই বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাইবে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে জালিমদের ব্যতীত অপর লোকের তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কিছু না থাকে। সুতরাং তাহাদেরকে ভয় করিও না, শুধু আমাকেই ভয় কর। যাহাতে আমি আমার নিয়ামত তোমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করিতে পারি এবং যাহাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হইতে পার। (সূরা আল বাকারাহ, সূরা নম্বরঃ ২, আয়াত নম্বরঃ ১৪৯ ১৫০)। কিবলা হলো সরাসরি কাবাঘর। সেদিক হয়েই সালাত / নামাজ পড়তে হবে। এটি মক্কার বাসিন্দাদের জন্য, যারা সরাসরি কাবা শরিফ দেখে দেখে

সালাত / নামাজ পড়তে সক্ষম। (বুখারি, হাদীস নং ৩৮৩)। অথবা কাবার দিকে ফিরে সালাত / নামাজ পড়বে। এটি সেসব লোকের জন্য, যারা কাবাঘর সরাসরি দেখতে পারছেন না। যারা মক্কা মুকাররামা থেকে দূরে অবস্থান করে তাদের জন্যও কাবার দিক হয়ে সালাত / নামাজ পড়া আবশ্যক। যদি কেউ রোগের কারণে বা শত্রুর ভয়ে কাবার দিক হয়ে সালাত / নামাজ পড়তে অক্ষম হয়, তাহলে সে যেদিকে সালাত / নামাজ পড়তে সক্ষম সেদিক হয়ে সালাত / নামাজ পড়তে পারবে। (বুখারি ৩৮৮, হাদীস নং ৪১৭১)। আবার কিবলার দিক কোনটি তা যদি জানা না থাকে, সে যদি কোনো বিল্ডিং এর ভিতরে থাকে অথবা নিকটে কোনো মানুষ পায়, তবে তার উচিত হবে জিজ্ঞাসা করে জানার চেষ্টা করা। অথবা মসজিদের মেহরাব, কম্পাস, চাঁদ সূর্যের অবস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে কিবলা নির্ণয়ের চেষ্টা করা। পরিশেষে ব্যর্থ হলে যান্নে গালেব তথা প্রাধান্যপ্রাপ্ত ধারণার ওপর নির্ভর করে নামাজ আদায় করে নেয়া। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো। (সূরা আত-তাগাবুন, সূরা নাম্বার: ৬৪, আয়াত নাম্বারঃ ১৬ [অংশ])

৬) ওয়াক্ত অনুযায়ী সালাত আদায় করা: সালাত / নামাজের ওয়াক্ত হওয়া ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হবে না। তাই সালাত / নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। অনিশ্চিত হলে সালাত / নামাজ হবে না, যদি তা ঠিক ওয়াক্তেও হয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআন আল কারীমে বলেন, إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ ۖ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করিবে তখন দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে, যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করিবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সূরা আন নিসা, সূরা নম্বরঃ ৪, আয়াত নম্বরঃ ১০৩)।

সালাতের সময়

১. ফজরের নামাজের সময় : সুবেহ সাদেক- অর্থাৎ পূর্বদিগন্তে যে শুভ্রতা দেখা যায়- থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

২. যোহরের সময় : সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।

৩. আসরের সময় : যোহরের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৪. মাগরিবের সময় : সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে শফকে আহমার শেষ হওয়া পর্যন্ত। শফকে আহমার হলো সূর্যাস্ত যাওয়ার সময় পশ্চিমাকাশে যে লাল আভা থাকে তা।

৫. এশার সময়: মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে সুবেহ সাদেক উদয় হওয়া পর্যন্ত। ইমামদের কারো কারো কাছে মধ্য রাতে এশার সময় শেষ হয়ে যায়। তাদের দলিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস্,এশার নামাজের সময় মধ্যরাত পর্যন্ত।-(বর্ণনায় মুসলিম) বর্তমানযুগে ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে নামাজের সময় খুব সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব। সালাত/ নামাজের ওয়াক্ত নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন- "যে ব্যক্তি নামাজের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পূর্বে মাত্র এক রাকাত নামাজ পেল সে ওই নামাজ পেয়ে গেল। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন্, যে ব্যক্তি নামাজের এক রাকাত পেল সে ওই নামাজ পেয়ে গেল।" - বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম। "যদি কারও ঘুমের কারণে নামাজ ছুটে গিয়ে থাকে অথবা মনে না থাকার কারণে নামাজ ছুটে গিয়ে থাকে, তবে জাগ্রত হওয়া ও মনে পড়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নিতে হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন্, যে ব্যক্তি কোনো নামাজ ভুলে গেল, স্মরণ হলে সে যেন তা আদায় করে নেয়।" আর এটাই হলো তার কাফ্ফারা। -বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম।

সালাতের মাকরূহ সময়ঃ সালাত / নামাজের মাকরূহ সময় তিনটি অর্থাৎ এই সময়গুলোতে নামাজ পড়া নিষেধ। সেগুলো হল:

১) সূর্যোদয়ের পর থেকে এশরাকের আগ পর্যন্ত: সূর্য উঠার শুরু থেকে হলুদ আলো পুরোপুরি দূর না হওয়া পর্যন্ত সময়টুকুতে সব ধরনের নামাজ পড়া নিষেধ। ফকিহরা গবেষণা করে দেখেছেন সূর্য উঠার পর হলুদ আলো দূর হতে ২০ মিনিট সময় লাগে। অর্থাৎ আবহাওয়া অফিস যদি বলে, সকাল ছয়টায় সূর্য উঠবে, তার মানে ৬টা ২০ পর্যন্ত সব ধরনের নামাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

২) সূর্য যখন মাথার ওপরে: সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপরে থাকে তখনও সব ধরনের নামাজ এবং সেজদা করা নিষেধ। আরবি ভাষায় এ সময়কে 'জাওয়াল' বলে। যখন সূর্য একটু হেলে পড়বে তখন জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। এ সময় সব ধরনের নামাজ এবং সেজদা করা জায়েজ। সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়তে বেশি সময় লাগে না। ফকিহরা সতর্কতাবশত সূর্য মাথার ওপরে উঠার পাঁচ মিনিট আগে এবং পাঁচ মিনিট পর পর্যন্ত নামাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

৩) সূর্য ডোবার সময়: সূর্য যখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে ডুবতে শুরু করে তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত সব ধরনের নামাজ পড়া নিষেধ। সাহাবি উকবা বিন আমের আল জুহানি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তিন সময় নামাজ এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন। ১. সূর্য উঠার সময়, যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। ২. সূর্য যখন মাথার ওপর ওঠে তখন থেকে পশ্চিমে হেলে পড়ার সময়টুকু। ৩. এবং সূর্য ডোবার সময়

সূর্য যখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে অন্ধকার হবার আগ পর্যন্ত সব ধরনের নামাজ পড়া নিষেধ।

সাহাবি উকবা বিন আমের আল জুহানি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, -রাসূলুল্লাহ্ আমাদের তিন সময়ে নামাজ এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন। ১. সূর্য উঠার সময়, যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। ২. সূর্য যখন মাথার ওপর ওঠে তখন থেকে পশ্চিমে হেলে পড়ার সময়টুকু। ৩. এবং সূর্য হলুদবর্ণ হওয়ার পর থেকে ডোবার আগ পর্যন্ত।' (বুখারি, হাদীস নং ৫৫১ এবং মুসলিম, হাদীস নং ১১৮৫)।

এ তিন সময় নামাজ পড়া নিষেধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে জ্ঞানীরা বলেন, সূর্য যখন ওঠে, যখন মাথার ওপর ওঠে এবং যখন ডুবে যায়- এ তিন সময় সূর্য পূজারিরা সূর্যকে সেজদাহ করে। তখন কেউ যদি নামাজ পড়ে তাহলে তাকেও সূর্য পূজারি মনে হতে পারে। এ জন্য এ সময় সব ধরনের নামাজ পড়া এবং সেজদাহ করা ইসলামী শরিয়ত মাকরুহে তাহরিমি তথা নিষেধ মনে করে। মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানাভী (রহ.) বলেন, এ তিন সময়ে নামাজ তো দূরের কথা এমনকি তিলাওয়াতে সেজদাহ করাও নিষেধ। জানাজার নামাজ এবং মৃতকে দাফন করাও নিষেধ। তবে মৃতকে তাড়াতাড়ি দাফন করার প্রয়োজন হলে জানাজা পড়িয়ে দাফন করার অনুমতি আছে।

৭) নিয়ত করাঃ

নিয়ত ছাড়া সালাত / নামাজ সহিহ হবে না। ফরজ সালাত / নামাজ হলে কোন সময়ের সালাত / নামাজ, তা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। যেমন -যুহর অথবা আসরের সালাত / নামাজ। সেরূপ ওয়াজিব নামাজ হলে তাও নির্দিষ্ট করা জরুরি। যেমন সালাতুল বিতর নামাজ বা সালাতুল ঈদ ইত্যাদি। কিন্তু নফল সালাত / নামাজে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করার প্রয়োজন নেই। তখন শুধু সালাত /নামাজের নিয়ত করলেই হবে। কেননা ফরজ ও ওয়াজিব সালাত সালাতের সময় বা প্রকার হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন। সে কারণে তা নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে হবে। (বুখারি, হাদিস নং ১, আল আশবাহ : ১/৪৩)। জামাতে সালাত / নামাজ হলে মুক্তাদিদের ইমামের অনুসরণের নিয়ত করা আবশ্যক। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআন আল কারীমে বলেন,

তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া একনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন। (সূরা আল বাইয়্যিনাহ, সূরা নম্বরঃ ৯৮, আয়াত নম্বরঃ ৫)

খ) সালাতের আরকানসমূহ (ارکان)ঃ

যে ফরজ কাজগুলো সালামের মধ্যে আদায় করতে হয়, সেগুলোকে সালাতের আরকান বলা হয়। সালাত / নামাজের আরকান ৬ টি। সেগুলো হল:

১) তাকবিরে তাহরিমা বা আল্লাহু আকবার বলে নামাজ শুরু করা:

তাহরীমা অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর জিকির দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা। যেমন আল্লাহু আকবার। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ১/২৩৮)। নিয়ত আর তাকবিরে তাহরীমার মাঝে কোনো অন্য কাজ না করা। যেমন খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি। (আল আশবাহ ১/৫৮)। তাহরিমার ব্যাপারে শর্ত হলো, তা রুকুর জন্য ঝুঁকে পড়ার আগে দাঁড়ানো অবস্থায় করা। (বুখারি, হাদিস নং ৭১৫)। আর নিয়ত তাকবিরে তাহরিমার পরে না করা। (বুখারি, হাদিস নং ৭১৫)

তাকবির আল্লাহু আকবার' এমনভাবে বলা, যাতে নিজে শুনতে পায়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআন আল কারীমে বলেন,

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।

(সূরা মুদ্দাসসির, সূরা নাম্বারঃ ৭৪, আয়াত নাম্বারঃ ৩)।

মূলতঃ তাকবীরে তাহরীমা (অর্থাৎ প্রথম তাকবীর) নামাযের শর্তসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু নামাযের আভ্যন্তরিন কার্যাবলীর সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত, তাই সেটিকে নামাযের ফরয সমূহের মধ্যেও গণ্য করা হয়েছে। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

(ক) মুক্তাদী -তাকবীরে তাহরীমা" এর শব্দ اَللّٰهُ ইমামের সাথে বললো, কিন্তু اَكْبَر ইমামের পূর্বে শেষ করে নিলো তবে তার নামায হবে না। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)

(খ) ইমামকে রুকূতে পেল, আর সে তাকবীরে তাহরীমা বলতে বলতে রুকূতে গেলো অর্থাৎ তাকবীর এমন সময় শেষ হলো যে, হাত বাড়ালে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, এমতাবস্থায় তার নামায হবে না। (খুলাসাতুল ফতোওয়া, ১ম খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা) (অর্থাৎ এ সময় ইমামকে রুকূতে পাওয়া অবস্থায় নিয়মানুযায়ী প্রথমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলে নিন এরপর اَللّٰهُ اَكْبَر বলে রুকূ করুন। ইমামের সাথে যদি সামান্যতম মুহুর্তের জন্যও রুকূতে অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে আপনার রাকাত মিলে গেলো আর যদি আপনি রুকূতে যাওয়ার পূর্বেই ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে যান তবে রাকাত পাওয়া হলো না।

(গ) যে ব্যক্তি তাকবীর উচ্চারণে সক্ষম নয় যেমন- বোবা বা অন্য যে কোন কারণে যার বাকশক্তি বন্ধ হয়ে গেছে, তার জন্য মুখে তাকবীর উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়, তার অন্তরের ইচ্ছাই যথেষ্ট। (তাবঈনুল হাকাইক, ১ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা)

(ঘ) اَللّٰهُ শব্দকে اٰللّٰهُ অর্থাৎ আলিফকে টেনে বা اَكْبَر কে اٰكْبَر অর্থাৎ আলিফকে টেনে বা اَكْبَر কে اَكْبَار অর্থাৎ ب কে টেনে পড়লো তবে নামায হবে না বরং যদি এগুলোর ভুল অর্থ জেনে বুঝে বলে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা) নামাযীর সংখ্যা বেশি হওয়া অবস্থায় পিছনে আওয়াজ পৌঁছানোর জন্য যেসব মুকাব্বিরগণ তাকবীর বলে থাকেন, সেসব মুকাব্বিরদের অধিকাংশই জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আজকাল اَكْبَرْ কে اَكْبَار অর্থাৎ কে দীর্ঘ টান দিয়ে বলতে শুনা যায়। এর ফলে তাদের নিজের নামাযও ভঙ্গ হয়ে যায় এবং তার আওয়াজে সে সব লোক নামাযের রুকন আদায় করে (অর্থাৎ কিয়াম থেকে রুকূতে যায়, রুকূ থেকে সিজদাতে যায় ইত্যাদি) তাদের নামাযও ভঙ্গ হয়ে যায়। এ জন্য না শিখে কখনো মুকাব্বির হওয়া উচিত নয়।

(ঙ) প্রথম রাকাতের রুকূ পাওয়া গেলো, তাহলে 'তাকবীরে উলা' বা প্রথম তাকবীরের সাওয়াব পেয়ে গেলো। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

২) কিয়াম বা দাঁড়িয়ে সালাত নামাজ আদায় করা:

নারী এবং পুরুষ উভয়কে দাঁড়িয়ে সালাত / নামাজ আদায় করতে হবে। তবে অসুস্থ হলে বসে এবং বসতে অক্ষম হলে শুয়ে ইশারায় সালাত পড়তে হবে। কিয়ামের বিষয়ে বিস্তারিত বলা যায়

(ক) কিয়ামের নিম্নতম সীমা হচ্ছে যে, হাত বাড়ালে হাত যেন হাঁটু পর্যন্ত না পৌঁছে আর পূর্ণাঙ্গ কিয়াম হচ্ছে সোজা হয়ে দাঁড়ান। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

(খ) ততটুকু সময় পর্যন্ত কিয়াম করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কিরাত পাঠ করা হবে। যতটুকু পরিমাণ কিরাত পড়া ফরয ততটুকু পরিমাণ দাঁড়ানোও ফরয। যতটুকু পরিমাণ ওয়াজীব ততটুকু পরিমাণ কিরাত ওয়াজীব এবং যতটুকু পরিমাণ কিরাত সুন্নাত ততটুকু পরিমাণ দাঁড়ান সুন্নাত। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

(গ) ফরয, বিতর, দুই ঈদ এবং ফযরের সুন্নাতে দাঁড়ানো ফরয। যদি সঠিক কারণ (ওজর) ব্যতীত কেউ এসব নামায বসে বসে আদায় করে, তবে তার নামায হবে না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

(ঘ) দাঁড়াতে শুধু একটু কষ্টবোধ হওয়া কোন ওযরের মধ্যে পড়ে না বরং কিয়াম ঐ সময় রহিত হবে যখন মোটেই দাঁড়াতে পারে না অথবা সিজদা করতে পারে না অথবা দাঁড়ানোর ফলে বা সিজদা করার কারণে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা দাঁড়ানোর ফলে প্রস্রাবের ফোটা চলে আসে অথবা এক চর্তুাংশ সতর খুলে যায় কিংবা কিরাত পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অক্ষম হয়। এমনি দাঁড়াতে পারে কিন্তু তাতে রোগ বৃদ্ধি পায় বা দেরীতে সুস্থ হয় বা অসহ্য কষ্ট অনুভব হয় তাহলে এ সকল অবস্থায় বসে পড়ার অনুমতি রয়েছে। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

(ঙ) যদি লাঠি দ্বারা খাদিমের সাহায্যে বা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয় তবে এ অবস্থায়ও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা ফরয। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

(চ) যদি শুধুমাত্র এতটুকু দাঁড়াতে পারে যে, কোন মতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলতে পারবে তবে তার জন্য ফরয হচ্ছে দাঁড়িয়ে " ঁ" বলা। এরপর যদি দাঁড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে বসে বসে নামায আদায় করা। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

(ছ) সাবধান! কিছু লোক সামান্য কষ্টের (আঘাতের) কারণে ফরয নামায বসে আদায় করে, তারা যেন শরীয়াতের এ আদেশের প্রতি মনোযোগ দেয় যে, দাঁড়িয়ে আদায় করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যত ওয়াক্ত নামায বসে বসে আদায় করা হয়েছে সবগুলো পুনরায় আদায় করে দেওয়া ফরয। অনুরূপভাবে এমনি দাঁড়াতে পারে না, তবে লাঠি বা দেয়াল কিংবা মানুষের সাহায্যে দাঁড়ানো সম্ভব ছিলো কিন্তু বসে বসে পড়েছে তাহলে তাদের নামাযও হয়নি। তা পুনরায় পড়ে নেয়া ফরয। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ৬৪ পৃষ্ঠা) ইসলামী বোনদের জন্যও একই আদেশ। তারাও শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত বসে বসে নামায আদায় করতে পারবে না। অনেক মসজিদে বসে নামায আদায় করার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে। অনেক বৃদ্ধলোক দেখা গেছে এতে বসে ফরয নামায আদায় করে থাকে, অথচ তারা পায়ে হেঁটে মসজিদে এসেছে, নামাযের পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তাও বলে, এমন সব বৃদ্ধ লোক যদি শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত বসে নামায আদায় করে থাকে তবে তাদের নামায হবে না।

(জ) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও নফল নামায বসে আদায় করতে পারবে, তবে দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضی الله عنه থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করেন: বসে নামায আদায়কারী দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক (অর্থাৎ অর্ধেক সাওয়াব পাবে)। (সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা) অবশ্য অসুবিধার (অক্ষমতার) কারণে বসে পড়লে সাওয়াবে কম হবে না। বর্তমানে সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে,

কিরাত পড়াঃ

কুরআন আল কারীমের কিছু অংশ পাঠ করা। কিরাত পড়া বিষয়ে বিস্তারিত বলা যায়

(ক) কিরাত হলো, সমস্ত অক্ষরসমূহ তার মাখরাজ (উচ্চারণের স্থান থেকে) আদায় করার নাম, যেন প্রত্যেক অক্ষর অন্য অক্ষর থেকে পৃথকভাবে বুঝা যায় ও উচ্চারণও বিশুদ্ধ হয়। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

(খ) নীরবে পড়ার ক্ষেত্রে এতটুকু আওয়াজে পড়া আবশ্যক যে, যেন নিজে শুনতে পায়। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৭১ পৃষ্ঠা)

(গ) আর যদি অক্ষরগুলো বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেছে, কিন্তু এত নিম্নস্বরে পড়েছে যে, নিজের কানেও শুনেনি অথচ এ সময় কোন অন্তরায় যেমন হৈ চৈও ছিলো না, আবার কান ভারী (অর্থাৎ বধির)ও নয় তবে তার সালাত / নামায হলো না। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

(ঘ) যদিও নিজে শুনাটা জরুরী তবে এটার প্রতিও এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক যে, নীরবে কিরাত পড়ার নামাযগুলোতে যেন কিরাতের আওয়াজ অন্যজনের কানে না পৌঁছে, অনুরূপভাবে তাসবীহ সমূহ আদায় কালেও এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

(ঙ) নামায ব্যতীত যেসব স্থানে কিছু বলা বা পড়াটা নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানেও এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য যে, কমপক্ষে এমন আওয়াজ হয় যেন নিজে শুনতে পায়। যেমন্ তালাক দেয়া, গোলাম আযাদ করা অথবা জন্তু যাবেহ করার জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নাম নেয়া। এসব ক্ষেত্রে এতটুকু আওয়াজ আবশ্যক যেন নিজের কানে শুনতে পায়। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা) দরূদ শরীফ ইত্যাদি ওযীফা সমূহ পড়ার ক্ষেত্রে কমপক্ষে এতটুকু আওয়াজ হওয়া উচিত যেন নিজে শুনতে পায়, তবেই পাঠ করা হিসেবে গণ্য হবে।

(চ) শুধুমাত্র বড় এক আয়াত পাঠ করা ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে ফরয, আর বিতর, সুন্নাত ও নফলের প্রত্যেক রাকাতে ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী সকলের উপর ফরয। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাক্বিউল ফালাহ, ২২৬ পৃষ্ঠা)

(ছ) মুক্তাদির জন্য নামাযে কিরাত পড়া জায়েয নেই। না সূরায়ে ফাতিহা, না অন্য আয়াত, না নীরবে কিরাতের নামাযে, না উঁচু আওয়াজের কিরাতের নামাযে। ইমামের কিরাতই মুক্ততাদীর জন্য যথেষ্ট। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ২২৭ পৃষ্ঠা)

(জ) ফরয নামাযের কোন রাকাতে কিরাত পড়লো না বা শুধু এক রাকাতে পড়লো তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

(ঝ) ফরয নামাযগুলোতে ধীরে ধীরে, তারাবীতে মধ্যম গতিতে ও রাতের নফল নামাযে তাড়াতাড়ি কিরাত পড়ার অনুমতি রয়েছে। তবে এমনভাবে পড়তে হবে যেন কিরাতের শব্দ সমূহ বুঝে আসে অর্থাৎ কমপক্ষে মদের (দীর্ঘ করে পড়ার) যতটুকু সীমা কারীগণ নির্ধারণ করেছেন ততটুকু যেন আদায় হয়, নতুবা হারাম হবে। কেননা তারতীল (অর্থাৎ থেমে থেমে) সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের আদেশ রয়েছে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা) বর্তমানে অধিকাংশ হাফিয সাহেবগণ এভাবে পড়ে থাকেন যে, মদ সমূহের আদায়তো দূরের কথা আয়াতের শেষের দু'একটি শব্দ যেমন- يَعْلَمُوْنَ /تَعْلَمُوْنَ ছাড়া বাকী কোন শব্দই বুঝা যায় না। এক্ষেত্রে অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ হয় না বরং দ্রুত পড়ার কারণে অক্ষরগুলো একটি অপরটির সঙ্গে সংমিশ্রণ হয়ে যায় আর এভাবে দ্রুত পড়ার কারণে গর্ববোধ করা হয় যে, অমুখ হাফিয সাহেব খুব তাড়াতাড়ি পড়ে থাকেন! অথচ এভাবে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হারাম ও শক্ত হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৮৬, ৮৭ পৃষ্ঠা)

রুকূ করাঃ

এতটুকু ঝুঁকা যাতে হাত বাড়ালে হাত উভয় হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এটা রুকূর নিম্নতম পর্যায়। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) আর পূর্ণাঙ্গ রুকূ হচ্ছে পিঠকে সমান করে সোজাসুজি বিছিয়ে দেয়া। (তাহতাবীর পাদটিকা, ২২৯ পৃষ্ঠা), রাসূলুল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বান্দার ঐ নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যাতে রুকূ ও সিজদা সমূহের মাঝখানে পিঠ সোজা করা হয় না।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হাদীস নং ১০৮০৩)

সিজদা করাঃ

(ক) নবী করীম ﷺ বলেন, আমাকে হুকুম করা হয়েছে সাতটি হাঁড় দ্বারা সিজদা করার জন্য। ঐ সাতটি হাড় হলো মুখ (কপাল) ও উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের পাতা আরও হুকুম হয়েছে যে, কাপড় ও চুল যেন সংকুচিত না করি।" (সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

(খ) প্রত্যেক রাকাতে দুইবার সিজদা করা ফরয। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

(গ) সিজদাতে কপাল জমিনের উপর ভালভাবে স্থাপন করা আবশ্যক। ভালভাবে স্থাপনের অর্থ হচ্ছে; জমিনের কাঠিন্যতা ভালভাবে অনুভূত হওয়া। যদি কেউ এভাবে সিজদা করে যে, কপাল ভালভাবে জমিনে স্থাপিত হয়নি তাহলে তার সিজদা হয়নি। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

(ঘ) কেউ কোন নরম বস্তু যেমন ঘাস (বাগানের সতেজ ঘাস), তুলা অথবা কার্পেট ইত্যাদির উপর সিজদা করলো, যদি এমতাবস্থায় কপাল ভালভাবে স্থাপিত হয় অর্থাৎ কপালকে এতটুকু চাপ দিলো যে, এরপর আর চাপা যায় না, তাহলে তার সিজদা হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না। (তাবঈনুল হাকাইক, ১ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)।

শেষ বৈঠকে বসাঃ

শেষ বৈঠকে তাশাহুদ, দরুদ, দোয়া মাছুরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা হয় তাকেই বলে শেষ বৈঠক। ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা।

একে কা'দায়ে আখিরা বলা হয়। শেষ বৈঠকে বসা (যে বৈঠকে তাশাহুদ, দরুদ, দোয়া মাছুরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত / নামাজ শেষ করা হয় তাকেই বলে শেষ বৈঠক) ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত / নামাজ শেষ করা। অর্থাৎ নামাযের রাকাত সমূহ পূর্ণ করার পর সম্পূর্ণ তাশাহহুদ অর্থাৎ (আততাহিয়াত) পর্যন্ত পড়তে যত সময় লাগে এতক্ষণ পর্যন্ত বসা ফরয। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযে চতুর্থ রাকআতের পর কেউ ভুলে কা'দা করলো না, তাহলে পঞ্চম রাকাতের সিজদা না করা পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে যখনই মনে পড়বে তৎক্ষণাৎ বসে যাবে আর যদি পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে ফেলে অথবা ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতে বসলো না তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে নিলো কিংবা মাগরিবে তৃতীয় রাকাতে না বসে চতুর্থ রাকাতের সিজদা করে নিলো, তবে এসব অবস্থায় ফরয বাতিল হয়ে যাবে। মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য নামাযে আরো এক রাকাত মিলিয়ে নামায শেষ করবেন। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৮৪ পৃষ্ঠা)

(ক) খুরুজে বিসুনইহী (সালামের মাধ্যমে সালাত / নামাজ শেষ করা)ঃ অর্থাৎ কা'দায়ে আখিরাহ্ এরপর সালাম বা কথাবার্তা ইত্যাদি এমন কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা যা নামায ভঙ্গ করে দেয়। তবে সালাম ব্যতীত অন্য কোন কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করে নামায শেষ করলে ঐ নামায পুনরায় আদায় করে দেয়া ওয়াজীব। আর যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে এ ধরণের কোন কাজ করা হয় তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৮৬ পৃষ্ঠা)।

পরিশেষে বলা যায় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূল কে যেভাবে সালাত / নামাজ আদায় করার শিক্ষা দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেভাবে সালাত / নামাজ আদায় করেছেন তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরামদের সালাত / নামাজ আদায় করা শিখিয়েছেন আমরা সকলেই যেন সেভাবে খুশু খুযুর সাথে সালাত / নামাজ আদায় করতে পারি, আমীন।

সুত্রঃ https://site.proshikkhon.net/ahkam-and-arkan-of-salah/

অনুশীলনী -০২
(জানুয়ারী-৩য় সপ্তাহঃ)

দারস তৈরী - সূরা যিলযালঃ

(১) যখন পৃথিবী তার চূড়ান্ত কম্পনে প্রকম্পিত হবে,
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
(২) যখন ভূগর্ভ তার বোঝাসমূহ বের করে দেবে,
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
(৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হ'ল?
وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا
(৪) সেদিন পৃথিবী তার সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
(৫) কেননা তোমার পালনকর্তা তাকে প্রত্যাদেশ করবেন।
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
(৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো যায়।
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ
(৭) অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে।
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
(৮) আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে।
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

বিষয়বস্ত্ত :
সূরাটির মূল বিষয়বস্ত্ত হ'ল ক্বিয়ামত অনুষ্ঠান। যা দু'টি ভাগে আলোচিত হয়েছে। প্রথমভাগে ক্বিয়ামত অনুষ্ঠানের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে (১-৫ আয়াত)।

দ্বিতীয়ভাগে বলা হয়েছে যে, মানুষকে ঐদিন স্ব স্ব আমলনামা দেখানো হবে। অতঃপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের মাধ্যমে তার যথাযথ প্রতিদান দেওয়া হবে (৬-৮ আয়াত)।

গুরুত্ব`:
(১) সূরাটিতে ক্বিয়ামত প্রাক্কালের চূড়ান্ত ভূকম্পনের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে এবং মানুষকে অণু পরিমান সৎকর্ম হ'লেও তা করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।
(২) কবি ফারাযদাক্ব`-এর চাচা (বরং দাদা) ছা'ছা'আহ বিন মু'আবিয়া রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে সূরা যিলযাল পুরাটা শুনিয়ে দিলেন। শেষে পৌঁছে গেলে তিনি বলে উঠলেন, حَسْبِى لاَ أُبَالِى أَنْ لاَ أَسْمَعَ غَيْرَهَا 'যথেষ্ট! এটা ব্যতীত কুরআনের আর কিছু না শুনলেও চলবে'।[১]
(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এল। অতঃপর বলল, أَقْرِئْنِى يَا رَسُولَ اللهِ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি 'আলিফ লাম রা' বিশিষ্ট সূরা সমূহের তিনটি পাঠ কর। লোকটি বলল, আমার বয়স বেশী হয়ে গেছে, হৃদয় শক্ত হয়ে গেছে, জিহবা মোটা হয়ে গেছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'হা-মীম' বিশিষ্ট সূরা পড়। লোকটি আগের মতই বলল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে 'মুসাব্বিহাত' থেকে তিনটি পড়। লোকটি আগের মতই বলল। অতঃপর বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি ব্যাপক অর্থপূর্ণ সূরা (سُوْرَةٌ جَامِعَةٌ) শিক্ষা দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সূরা যিলযাল পাঠ করে শুনালেন। ক্বিরাআত শেষ হ'লে লোকটি বলল, وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَداً 'যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি, আমি এর উপরে মোটেই বৃদ্ধি করব না'। অতঃপর লোকটি পিঠ ফিরে চলে যেতে থাকল। তখন রাসূল (ছাঃ) দু'বার বললেন, أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ 'লোকটি সফলকাম হ'ল'।[২] অতঃপর বললেন, عَلَىَّ بِهِ 'ওকে আমার কাছে ডেকে আনো'। লোকটিকে ফিরিয়ে আনা হ'ল। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى جَعَلَهُ اللهُ عِيداً لِهَذِهِ الأُمَّةِ 'আমি ঈদুল আযহা সম্পর্কে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ এদিনকে এ উম্মতের জন্য ঈদ হিসাবে নির্ধারিত করেছেন'। লোকটি বলল, হে রাসূল! আমি যদি ছোট একটি মাদী বকরীছানা ব্যতীত কিছুই না পাই, তাহ'লে আমি কি সেটাকে কুরবানী করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। বরং তুমি وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 'তোমার চুল-নখ কাটো, গোফ ছাটো, গুপ্তাঙ্গের লোম ছাফ কর, এটাই তোমার জন্য আল্লাহর নিকটে পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হবে'।[৩]
(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, সূরা যিলযাল নাযিল হ'লে আবুবকর (রাঃ) কাঁদতে থাকেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, لَوْلا أَنَّكُمْ تُذْنِبُوْنَ لَخَلَقَ اللهُ خَلْقًا يُذْنِبُوْنَ وَيَغْفِرُ لَهُمْ 'যদি তোমরা পাপ' না হ'তে, তাহ'লে অবশ্যই আল্লাহ আরেকটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করতেন, যারা পাপী হ'ত এবং তিনি তাদের ক্ষমা করতেন'।[৪]
(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্র সূরার শেষ দু'টি আয়াতকে একত্রে الْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ। 'অনন্য ও সারগর্ভ আয়াত' বলে অভিহিত করেছেন।[৫]

তাফসীর :

(১) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ‘ যখন পৃথিবী তার চূড়ান্ত কম্পনে প্রকম্পিত হবে’।

زَلْزَلَ يُزَلْزِلُ زَلْزَلَةً زِلْزَالاً وَزَلْزالاً ‘ভূমিকম্প হওয়া’। অর্থাৎ حرَّكت الأرض من أصلها পুরা পৃথিবী জড়শুদ্ধ প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠবে (কুরতুবী)। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ- يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ -كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ ‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর বিষয়’। ‘যেদিন তোমরা তা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবে। যেদিন প্রত্যেক স্তন্যদায়িনী মা তার দুগ্ধপানকারী সন্তান থেকে উদাসীন হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভ খালাস করে ফেলবে। আর মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল সদৃশ। যদিও সে মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি অতীব কঠিন’ (হজ্জ ২২/১-২)। এটি ইস্রাফীলের শিঙ্গায় ফুঁকদানের পরের ঘটনা। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ‘যেদিন কম্পিত করবে কম্পিতকারী’। ‘যার পিছে পিছে আসবে আরেকটি নিনাদ’ (নাযে‘আত ৭৯/৬-৭)। প্রথম নিনাদকে نفخة صعق ‘কম্পনের নিনাদ’ এবং দ্বিতীয় নিনাদকে نفخة بعث বা ‘পুনরুত্থানের নিনাদ’ বলা হয়। প্রথম নিনাদে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে নতুন পৃথিবী হবে। অতঃপর দ্বিতীয় নিনাদের পরেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। তাতে মৃতরা সব জীবিত হয়ে উঠে যাবে। দুই নিনাদের মাঝে সময়ের ব্যবধান হবে চল্লিশ। সেটি দিন, মাস না বছর, সে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলতে অস্বীকার করেন’।[৬] পরবর্তী আয়াতের বক্তব্যের আলোকে অত্র আয়াতের অর্থ দ্বিতীয় কম্পনের বলে অনুমিত হয়।

(২) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ‘যখন ভূগর্ভ তার বোঝাসমূহ বের করে দেবে’।

অর্থাৎ কবরবাসীরা সবাই জীবিত হয়ে বের হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ‘অতঃপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তখন সবাই উঠে দাঁড়িয়ে যাবে ও দেখতে থাকবে’ (যুমার ৩৯/৬৮)। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ‘যেদিন মানুষ বিশ্বপালকের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে’ (মুত্বাফফেফীন ৮৩/৬)। আল্লাহ আরও বলেন, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ‘যেদিন পৃথিবী প্রসারিত হবে’। ‘এবং তার ভিতরকার সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে যাবে’ (ইনশিক্বাক্ব ৮৪/৩-৪)।

এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ভূগর্ভে বহু সোনা-দানা খনি আকারে মানুষের জন্য সঞ্চিত রাখা হয়েছে যা উত্তোলন করে জনকল্যাণে ব্যয় করা মানুষের যরূরী কর্তব্য। যেমন হাদীছেও এ বিষয়ে বক্তব্য এসেছে যে, ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ‘পৃথিবী উগরে দিবে ভূগর্ভে সঞ্চিত মূল্যবান স্বর্ণ-রৌপ্যসমূহ, যা বড় বড় স্তম্ভের মত’।[৭] অর্থাৎ কবর সমূহ থেকে মানুষ এবং ভূগর্ভ থেকে অন্যান্য সবকিছু বের করে দেওয়া হবে।

(৩) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ‘এবং মানুষ বলবে, এর কি হ’ল’?

অর্থাৎ পৃথিবীর এই ভয়ংকর পরিবর্তিত অবস্থা দেখে বিশেষ করে কাফেররা ভীতবিহবল হয়ে বলবে, ما الذي حدث لها وما شأنها ‘এর কি হ’ল? এর কি অবস্থা’? কেননা তারা ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল না। মুমিনরা ভীতচকিত হ’লেও বিস্মিত হবে না। কেননা আগে থেকেই তারা ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল।

(৪) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ‘সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে’।

কুরতুবী ও ইবনু কাছীর বলেন, এর অর্থ হ’ল أى تخبر الأرض يومئذ بما عمل عليها من خير أو شر -‘পৃথিবী সেদিন তার উপরে যে সব ভাল ও মন্দ কর্ম সংঘটিত হয়েছে, সব বলে দেবে’। يَوْمَئِذٍ ‘বদল’ হয়েছে إِذَا زُلْزِلَتِ থেকে। সেকারণ يَوْمَ -এর উপরে ‘যবর’ হয়েছে। في ذلك الوقت تحدث أخبارها ‘সেই সময় পৃথিবী তার সব খবর বলে দেবে’ (ক্বাসেমী)।অথবা এটি جواب شرط হয়েছে إِذَا زُلْزِلَتِ থেকে। অর্থাৎ যেদিন ক্বিয়ামত হবে, সেদিন পৃথিবী সবকিছু বলে দেবে’। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘মুওয়াযযিনের আযানের ধ্বনি জিন, ইনসান, গাছ, পাথর, মাটি সহ যেই-ই শুনবে, সকল বস্তুই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে’।[৮] আর এটা হবে আল্লাহর ন্যায়বিচারের প্রমাণ হিসাবে এবং পাপীদের অস্বীকারের জওয়াব হিসাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ -الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ- ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ‘স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমরা সকলকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা আমার সাথে অন্যকে শরীক করেছিল তাদেরকে আমরা বলব, কোথায় তোমাদের শরীকগণ যাদেরকে তোমরা উপাস্য বলে ধারণা করতে’? ‘তখন তাদের শিরকের ফল এছাড়া আর কিছুই হবে না যে তারা বলবে, আল্লাহর কসম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুশরিক ছিলাম না’ (আন‘আম ৬/২২-২৩; মুমিন ৪০/৭৪)। তবে পৃথিবী সাক্ষ্য দেওয়ার ফলে তাদের আর কিছুই বলার থাকবে না।

(৫) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ‘কেননা তোমার পালনকর্তা তাকে প্রত্যাদেশ করবেন’।

أَذِنَ لَهَا فِي أَنْ تُحَدِّثَ أَخْبَارَهَا ‘তার প্রতি নির্দেশ দিবেন’। অর্থাৎ أوحى إليها অর্থ أَوْحَى لَهَا ‘আল্লাহ তাকে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করার অনুমতি দিবেন’। কেবল পৃথিবীকে নয়, বরং মানুষের চোখ, কান ও দেহচর্ম সবাইকে আল্লাহ কথা বলার অনুমতি দিবেন এবং তারা যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُوْنَ، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوْا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِيْ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ‘যেদিন আল্লাহর শত্রুদের জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে, সেদিন তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বিভিন্ন দলে’। ‘অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের

সন্নিকটে পৌঁছবে, তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে'। 'জাহান্নামীরা তখন তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দান করেছেন' (হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/১৯-২১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 'আজ আমরা তাদের মুখে মোহর মেরে দেব এবং আমাদের সাথে কথা বলবে তাদের হাত ও তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে তাদের পা' (ইয়াসীন ৩৬/৬৫)।

(৬) يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ 'সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো যায়'।

অর্থাৎ সেদিন মানুষ তাদের কবর হ'তে হিসাবস্থলের দিকে দলে দলে সমবেত হবে। অতঃপর হিসাব শেষে সেখান থেকে কেউ জান্নাতীদের ডান সারিতে কেউ জাহান্নামীদের বাম সারিতে প্রকাশ পাবে (ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭-৯; বালাদ ৯০/১৭-১৯)। এভাবে মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا- وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا 'সেদিন আমরা দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব'। 'এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেব' (মারিয়াম ১৯/৮৫-৮৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ، فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُحْبَرُوْنَ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ-

'যে দিন ক্বিয়ামত সংঘঠিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে'। 'অতঃপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে'। 'পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী হয়েছে এবং আমার আয়াত সমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে, তাদেরকে আযাবের মধ্যে হাযির করা হবে' (রূম ৩০/১৪-১৬)।

أَشْتَاتًا অর্থ 'দলে দলে'। একবচনে شَتٌّ (কুরতুবী)। لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ অর্থ ليريهم الله جزاء ماعملوه فى الدنيا من خير وشر 'দুনিয়ায় তাদের ভাল-মন্দ কর্মের ফলাফল আল্লাহর পক্ষ হ'তে দেখানোর জন্য'। সেদিন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দিয়ে বলা হবে, اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا 'তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট' (ইসরা ১৭/১৪)। অতএব মানুষের কর্তব্য প্রতিদিন শুতে যাবার আগে নিজের কর্মের হিসাব নিজে নেওয়া। কেননা তার সব কর্মই লিখিত হচ্ছে।

(৭) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَّرَهُ 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে'।
(৮) وَمَن يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ 'এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে'।

ذَرَّةٍ অর্থ বিন্দু, সরিষাদানা, ছোট্ট পিপীলিকা। এর দ্বারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছোট্ট বস্তুর উপমা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পাপ বা পূণ্য যত ছোটই হৌক না কেন ক্বিয়ামতে বিচারের দিন তা দেখা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এক অণু পরিমান যুলুম করবেন না। যদি কেউ অণু পরিমান সৎকর্ম করে, তবে তিনি তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেন এবং আল্লাহ তার পক্ষ হ'তে মহা পুরস্কার দান করে থাকেন' (নিসা ৪/৪০)। সেদিন সব আমল ওযন করা হবে। যার ওযন ভারী হবে, সে জান্নাতী হবে। আর যার ওযন হালকা হবে, সে জাহান্নামী হবে' (ক্বারে'আহ ১০১/৬-৯)। ঐ ওযন কিভাবে করা হবে, সেটি গায়েবী বিষয়। যা কেবল আল্লাহ জানেন।

অর্থাৎ সৎ বা অসৎকর্ম, তা যত ছোটই হৌক না কেন, সবকিছু ঐদিন হিসাবে চলে আসবে এবং তার যথাযথ প্রতিদান ও প্রতিফল পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوْءٍ، 'সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে, চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও..., (আলে ইমরান ৩/৩০)। তবে যে ব্যক্তি অন্যায় কর্ম থেকে খালেছ অন্তরে তওবা করে, সে ব্যক্তির উক্ত মন্দকর্ম হিসাব থেকে বাদ যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَار، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর নিকটে তওবা কর খালেছ তওবা। আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের পাপ সমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়' (তাহরীম ৬৬/৮)। বিচারের দিন কিছু মুমিনের গোপন পাপ সম্পর্কে আল্লাহ একাকী তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন। তখন সে সব কথা স্বীকার করবে। যখন আল্লাহ দেখবেন যে, এতে সে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তিনি তাকে বলবেন, إِنِّى قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَإِنِّى أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ 'আমি এগুলি তোমার উপর দুনিয়ায় গোপন রেখেছিলাম। আর আজ আমি তোমার জন্য ঐগুলি ক্ষমা করে দিলাম'।[৯]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছের শেষ দিকে অত্র আয়াতটি (যিলযাল ৭-৮) সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ 'এটি অনন্য ও সারগর্ভ আয়াত'।[১০] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) অত্র আয়াতটিকে أحكم آية فى القرآن 'কুরআনের সবচেয়ে বড় বিধান দানকারী আয়াত' বলে অভিহিত করেছেন এবং সকল বিদ্বান এ বিষয়ে একমত' (কুরতুবী)।

শিক্ষাঃ

কিয়ামত ও পৃথিবীর কম্পন:

সূরাটির প্রথম অংশে কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর ওপর প্রবল ভূমিকম্প হবে এবং ভূমি তার অভ্যন্তরে থাকা সব ভার বা মৃতদের বের করে দেবে।

মানুষের জিজ্ঞাসা ও পৃথিবীর সাক্ষ্য: এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানুষ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, 'পৃথিবীর কী হলো?' তখন আল্লাহ পৃথিবীকে তার গোপন কথা জানানোর আদেশ দেবেন, যার ফলে পৃথিবী তার ভেতরের সকল রহস্য প্রকাশ করবে।

মানুষের কর্মের বিচার: এরপর মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের কর্মের ফল দেখতে আসবে। আল্লাহ বলেন, "সুতরাং যে কেউ অণু পরিমাণও ভালো কাজ করেছে, সে তা দেখবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করেছে, সেও তা দেখবে।"

কাজের হিসাব ও পরকালীন জীবন: এই সূরার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, দুনিয়াতে করা প্রত্যেকটি ভালো বা খারাপ কাজের হিসাব কিয়ামতের দিন মানুষের সামনে উপস্থিত হবে। এটি মৃত্যুর পরের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত।

কর্মের গুরুত্ব: সূরা যিলযাল গুরুত্ব দেয় প্রতিটি কাজের উপর, তা যতই সামান্য হোক না কেন। এই শিক্ষা মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতে উৎসাহিত করে।

পরকালের প্রস্তুতি: এই সূরা পরকালের বাস্তবতাকে তুলে ধরে এবং মানুষকে দুনিয়ার জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করে, কারণ প্রত্যেকের কাজের হিসাব দিতে হবে।

সতর্ক বার্তা: এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সতর্ক বার্তা, যা মানুষকে তাদের কর্ম সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং তাদের ভালো ও মন্দ কাজের পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে।

জাহান্নাম থেকে বাঁচুন :

(১) হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ 'তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো একটা খেজুরের টুকরা দিয়ে হ'লেও কিংবা একটু মিষ্ট কথা দিয়ে হ'লেও'।[১১]

(২) আবু যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ 'সামান্য নেকীর কাজকেও তুমি ছোট মনে করো না। এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে হ'লেও'।[১২]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ 'হে মুমিন নারীগণ! তোমরা প্রতিবেশীকে বকরীর পায়ের দুই ক্ষুরের মধ্যেকার সামান্য গোশত দিয়ে সাহায্য করাকেও তুচ্ছ মনে করো না'।[১৩]

উম্মে বুজাইদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ 'পোড়ানো ক্ষুর হ'লেও সায়েলকে দাও'।[১৪]

(৪) আদী বিন হাতেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يَّسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ একটা খেজুরের টুকরা দিয়েও নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখে, তবে সে যেন তা করে'।[১৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً 'হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ হ'তেও বেঁচে থাকো। কেননা উক্ত বিষয়েও আল্লাহর পক্ষ হ'তে কৈফিয়ত তলব করা হবে'।[১৬]

(৫) হযরত জাবের ও হুযায়ফা (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ 'প্রত্যেক নেকীর কাজই ছাদাক্বা'।[১৭]

কাফিরের সৎকর্ম : প্রশ্ন হ'ল, ক্বিয়ামতের দিন কাফিররা তাদের সৎকর্মের পুরস্কার পাবে কি?

এর জবাব এই যে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে বা তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে, তারা আখেরাতে কিভাবে পুরস্কার পেতে পারে? আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُوْرٍ-

'যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের সেখানে মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবেনা যে তারা মরবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও হালকা করা হবেনা। এভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি' (ফাত্বির ৩৫/৩৬)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ- قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ-

'জাহান্নামের অধিবাসীরা তাদের প্রহরীদের বলবে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বল, তিনি যেন একদিনের জন্য আমাদের শাস্তি হালকা করেন'। জবাবে 'তারা বলবে, তোমাদের নিকটে কি নিদর্শনাবলীসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি? জাহান্নামীরা বলবে, নিশ্চয়ই এসেছিল। প্রহরীরা বলবে, তাহ'লে তোমরাই প্রার্থনা কর। আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়ে থাকে' (গাফের/মুমিন ৪০/৪৯-৫০)।

বস্তুত কাফিরদের সৎকর্মের পুরস্কার আল্লাহ দুনিয়াতেই দিবেন তাদের নাম-যশ বৃদ্ধি, সুখ-সমৃদ্ধি, সন্তানাদি ও রূযী বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু আখেরাতে তারা কিছুই পাবে না। যেমন তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, তার জন্য আমরা তার ফসল বর্ধিত করে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সেখান থেকে কিছু দেই। তবে তার জন্য আখেরাতে কিছুই থাকবে না' (শূরা ৪২/২০)। আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا 'আর আমরা তাদের কৃতকর্মগুলোর দিকে অগ্রসর হব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' (ফুরক্বান ২৫/২৩)। কেননা কুফরী তাদের সকল সৎকর্মকে বিনষ্ট করে দিবে এবং তারা আল্লাহর রহমত

থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি ক্বিয়ামতের দিন তাদের আমল ওযন করার জন্য দাড়িপাল্লাও খাড়া করা হবেনা। যেমন আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا '(ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারী হ'ল তারাই) যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অবিশ্বাস করে, তাদের সমস্ত আমল নিস্ফল হয়ে যায়। অতএব ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাদের জন্য দাড়িপাল্লা খাড়া করব না' (কাহফ ১৮/১০৫)। কেননা তা নেকী হ'তে খালি থাকবে।

তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। তবে তাদের পাপের তারতম্য অনুযায়ী শাস্তির তারতম্য হ'তে পারে। যেমন আবু ত্বালিবের শাস্তি সবচেয়ে কম হবে। তাকে আগুনের জুতা ও ফিতা পরানো হবে। তাতেই তার মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটবে। তবে এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ। যেমন তিনি বলেন, 'আমি তাকে আগুনে ডুবন্ত পেয়েছিলাম। অতঃপর (সুফারিশের মাধ্যমে) আমি তাকে হালকা আগুনে উঠিয়ে আনি। অর্থাৎ টাখনু পর্যন্ত আগুনে পুড়বে'। তিনি বলেন, 'যদি আমি না হ'তাম, তাহ'লে তিনি থাকতেন জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে'।[১৮] শাস্তির এই তারতম্য আখেরাতে সকল কাফিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি-না, সেটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর এখতিয়ারে। তবে এটা নিশ্চিত যে, কাফেররা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ- خَالِدِينَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ-

'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের উপর আল্লাহর লা'নত এবং ফেরেশতামন্ডলী ও সকল মানুষের লা'নত'। 'সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তাদের শাস্তি হালকা করা হবেনা এবং তাদের কোনরূপ অবকাশ দেওয়া হবেনা' (বাক্বারাহ ২/১৬১-৬২)।

সারকথা :

কর্ম যত ছোটই হৌক তা ধ্বংস হয় না। অতএব সৎকর্ম যত ছোটই হৌক তা করতে হবে এবং পাপ যত ছোটই হৌক তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

সূত্রঃ

[১]. নাসাঈ কুবরা হা/১১৬৯৪; আহমাদ হা/২০৬১২, হাদীছ ছহীহ; ফারাযদাক্ব-এর দাদা হওয়াটাই সঠিক। তাঁর বংশ পরিচয় হ'ল : ফারাযদাক্ব আল-হাম্মাম বিন গালিব বিন ছা'ছা'আহ বিন নাজিয়াহ (আল-ইছাবাহ ক্রমিক সংখ্যা ৭০২৯)।

[২]. الرُّوَيْجِلُ শব্দটি الراجل থেকে تصغير হয়েছে। অর্থ الماشى ضد الراكب 'পায়ে চলা ব্যক্তি, যা আরোহীর বিপরীত'।

[৩]. আহমাদ হা/৬৫৭৫, আরনাঊত্ব, সনদ হাসান; হাকেম হা/৩৯৬৪, সনদ ছহীহ; তাফসীর ইবনু কাছীর।

[৪]. ত্বাবারাণী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১১৫১২; হায়ছামী বলেন, এর সকল রাবী ছহীহ-এর রাবী এবং এর দুর্বলতাটুকুর জন্য শাওয়াহেদ রয়েছে, যা তাকে শক্তিশালী করে। কুরতুবী হা/৬৪৩৬; হাদীছের শেষের অংশটি (لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ الخ) মুসলিম হা/২৭৪৮ ও তিরমিযী হা/৩৫৩৯-য়ে বর্ণিত হয়েছে।

[৫]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭৩।

[৬]. বুখারী হা/৪৯৩৫, মুসলিম হা/২৯৫৫, মিশকাত হা/৫৫২১ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, 'শিঙ্গায় ফুঁক দান' অনুচ্ছেদ; ফাৎহুল বারী হা/৬৫১৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[৭]. মুসলিম হা/১০১৩; তিরমিযী হা/২২০৮; মিশকাত হা/৫৪৪৪ 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ।

[৮]. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৮৯; বুখারী হা/৬০৯; নাসাঈ, আহমাদ, মিশকাত হা/৬৫৬, ৬৬৭।

[৯]. বুখারী হা/২৪৪১; মুসলিম হা/২৭৬৮।

[১০]. বুখারী হা/৪৯৬২; মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩ 'যাকাত' অধ্যায়।

[১১]. বুখারী হা/৮৪১৭' যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৮৫৭ 'নবুঅতের নিদর্শন সমূহ' অনুচ্ছেদ।

[১২]. মুসলিম হা/২৬২৬, তিরমিযী হা/১৮৩৩, মিশকাত হা/১৮৯৪ 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

[১৩]. বুখারী হা/২৫৬৬; মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৯২।

[১৪]. আহমাদ হা/১৬৬৯৯; নাসাঈ হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/১৯৪২ 'শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ।

[১৫]. মুসলিম হা/১০১৬ 'যাকাত' অধ্যায়, ২০ অনুচ্ছেদ।

[১৬]. নাসাঈ, ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩, মিশকাত হা/৫৩৫৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬; ছহীহাহ হা/২৭৩১।

[১৭]. বুখারী হা/৬০২১, মুসলিম হা/১০০৫, মিশকাত হা/১৮৯৩ 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-৬।

[১৮]. বুখারী হা/৫১৭; মুসলিম হা/৩৬১, ৩৫৮; মিশকাত হা/৫৬৬৮ 'জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

বই: সংগঠন পদ্ধতি

প্রকাশক ঃ আবু তাহের মুহাম্মাদ মা'ছুম চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বরঃ ১৯৮৩
৫২ তম প্রকাশঃ জানুয়ারী ২০২১

প্রকাশকের কথা ইসলামী আন্দোলনের কাজকে সুন্দর, সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সম্পাদন করার জন্য জামায়াতে ইসলামী যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত ০৪ (চার) দফা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সংগঠন পদ্ধতি বইটি মূলত জামায়াতের ৪ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতিগত বিষয় সমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সমষ্টি।

ভূমিকা ঃ সংগঠন পদ্ধতির ২টি দিক গুরূত্বপূর্ণঃ- ১। কর্মনীতি বা কর্ম কৌশল; ২। কর্মসূচি বা আন্দোলনের বহুমুখী কাজের নির্ঘন্ট।

(খ) জামায়াতের স্থায়ী কর্মসূচি ঃ রাসূল (সা.) যে কর্মসূচির মাধ্যমে একটি সফল সমাজ বিপ্লব সাধন করে তদানীন্তন বিশ্বে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন, সে বিপ্লবী কর্মসূচিকেই জামায়াতে ইসলামী তার কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে যা নিম্নরূপ ঃ

১। চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন ঃ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশেষণ করিয়া চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা।

২। সংগঠন ও প্রশিক্ষণ ঃ ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রামে আগ্রহী সৎ ব্যক্তিদিগকে সংগঠিত করা এবং তাহাদিগকে ইসলাম কায়েম করিবার যোগ্যতাসম্পনড়ব হিসাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান করা।

৩। সমাজ সংস্কার ও সমাজ সেবা ঃ ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, জনতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন এবং দুস্থ মানবতার সেবা করা।

৪। রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও সংশোধন ঃ গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সৎ ও চরিত্রবান নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা।

প্রথম দফা কর্মসূচি ঃ

দাওয়াত ও তাবলীগ দাওয়াতের মাধ্যমে চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠনের কাজ গঠনতন্ত্রের ভাষায় জামায়াতের প্রথম দফা কর্মসূচি হলো ঃ "বাংলাদেশের সকল নাগরিকের নিকট ইসলামের প্রকৃতরূপ বিশেষণ করিয়া চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা।" **প্রথম দফার তিনটি দিক ঃ**

১। সকল নাগরিকের নিকট ইসলামের সঠিক ধারণা তুলে ধরা।

২। ব্যক্তি ও সমাজের ভেতর ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণার অবসান।

৩। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান।

এ দফার কাজগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। ব্যক্তিগত যোগাযোগ (টার্গেট ভিত্তিক ও সাধারণ)। ২। গ্রুপ ভিত্তিক যোগাযোগ ৩। ইসলামী সাহিত্য বিতরণ ৪। বই বিলিকেন্দ্র স্থাপন ৫। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ৬। বই বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যক্তিগতভাবে বই বিক্রয় ৭। পরিচিতি, লিফলেট বিতরণ ও পোস্টারিং ৮। মাসিক সাধারণ সভা ৯। দাওয়াতী জনসভা ও ইসলামী মাহফিল ১০। দাওয়াতী ইউনিট গঠন ১১। আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ ১২। সিরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল ১৩। আল কুরআনের দারস ও তাফসীর মাহফিল ১৪। ইসলামী দিবস পালন ১৫। মসজিদ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ ও মসজিদ সংগঠিতকরণ ১৬। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াত সম্প্রসারণ ১৭। দাওয়াতী সপ্তাহ/পক্ষ পালন ও দাওয়াতী অভিযান/গণসংযোগ অভিযান ১৮। জুম'আ বক্তৃতা ও ঈদগাহে আলোচনা ১৯। দাওয়াতী চিঠি/ফোন আলাপ ও ইন্টারনেট ব্যবহার ২০। দাওয়াতী বই উপহার প্রদান ২১। ইফতার মাহফিল ২২। সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম ২৩। চা-চক্র ও বনভোজন ২৪। হামদ-না'ত ইত্যাদির চর্চা ২৫। দাওয়াতী ক্যাসেট তৈরি ও প্রচার ।

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি ঃ সংগঠন ও প্রশিক্ষণ

গঠনতন্ত্রের ভাষায় জামায়াতের দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি হলো ঃ "ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রামে আগ্রহী সৎ ব্যক্তিদিগকে সংগঠিত করা এবং তাহাদিগকে ইসলাম কায়েম করিবার যোগ্যতাসম্পন্নব হিসাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান করা।"

দ্বিতীয় দফার প্রধানত দুটো দিক রয়েছে ঃ (ক) সংগঠন ও (খ) প্রশিক্ষণ

(ক) সংগঠন

জামায়াতের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যঃ

১। জামায়াতের সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত পরামর্শের ভিত্তিতে গৃহীত হয়।

২। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ উন্নবত রাখার জন্য পারস্পরিক সংশোধনের সম্মানজনক পদক্ষেপ নেয়া হয়।

৩। সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার নিরিখে গ্রহণ করা হয়।

জামায়াতের স্তর বিন্যাসের দু'টি দিক ঃ

(ক) সাংগঠনিক জনশক্তির স্তর বিন্যাস (খ) সাংগঠনিক কাঠামোর স্তর বিন্যাস

(ক) সাংগঠনিক জনশক্তির স্তর বিন্যাস ঃ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে জনশক্তিকে সদস্য (রুকন) ও সহযোগী সদস্য ২ (দুই) ভাগে ভাগ করা থাকলেও কার্যত জনশক্তি তিন ভাগে বিভক্ত। সহযোগী সদস্য, কর্মী ও সদস্য (রুকন)।

ক। সহযোগী সদস্য

খ। কর্মী ঃ কর্মীর ৫ টি কাজঃ ১) নিয়মিতভাবে বৈঠকে যোগদান করেন, ২) ইয়ানত দেন, ৩) রিপোর্ট রাখেন ও বৈঠকে পেশ করেন ৪) দাওয়াতী কাজ করেন ও ৫) সামাজিক কাজ করেন তাদেরকে জামায়াতের কর্মী বলা হয়।

গ। সদস্য বা রুকন।

খ) সাংগঠনিক কাঠামোর স্তর বিন্যাসঃ

❖কেন্দ্র ❖জেলা/মহানগরী ❖উপজেলা/থানা ❖পৌরসভা/ইউনিয়ন ❖ওয়ার্ড ❖ইউনিট

ক) কেন্দ্রঃ ১। আমীরে জামায়াত ২। মজলিশে শুরা ৩। কর্ম পরিষদ ৪। নির্বাহি পরিষদ ৫। কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলন ৬। জেলা/মহানগরী আমীর সম্মেলন

খ) জেলা/মহানগরীঃ ১। জেলা/মহানগরী আমীর ২। জেলা/মহানগরী মজলিশে শুরা ৩। জেলা/মহানগরী কর্ম পরিষদ ৪। জেলা/মহানগরী সদস্য (রুকন) সম্মেলন ও মাসিক সদস্য (রুকন) বৈঠক ৫। জেলা/মহানগরী বৈঠক ৬। জেলা/মহানগরী পর্যায়ে বিভাগ বন্টন

গ) উপজেলা/থানাঃ ১। উপজেলা/থানা আমীর বা সভাপতি ২। উপজেলা/থানা মজলিশে শুরা ৩। উপজেলা/থানা কর্ম পরিষদ ৪। উপজেলা/থানা সদস্য (রুকন) বৈঠক ৫। উপজেলা/থানা বৈঠক ৬। সংগঠিত উপজেলা/থানা

ঘ) পৌরসভা/ইউনিয়নঃ ১। পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ডে আমীর বা সভাপতি ২। পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সদস্য (রুকন) বৈঠক ৩।পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড বৈঠক ৪। সংগঠিত ইউনিয়ন

ঙ) ওয়ার্ডঃ

১। দাওয়াতী ইউনিট

২। ইউনিট, শর্তসমুহঃ ঃ (ক) কমপক্ষে চারজন কর্মী থাকা (খ) নিয়মিত বৈঠকাদি হওয়া; (গ) মাসে কমপক্ষে একবার দাওয়াতী গ্রুপ বের করা; (ঘ) ও একজন সক্রিয় সভাপতি কর্তৃক কাজ পরিচালিত হওয়া; (ঙ) মাসিক রিপোর্ট ও নিছাব যথারীতি আদায় করা;

৩। ইউনিট প্রোগ্রামঃ ইউনিটে প্রতিমাসে কমপক্ষে নিমেড়বাক্ত ৪টি প্রোগ্রাম করতে হবে।

- i) কর্মী বৈঠক। ইউনিট সভাপতি কর্মী ভ্বঠক পরিচালনা করবেন।
- ii) সাধারণ সভা বা দাওয়াতী সভা
- iii) প্রশিক্ষণ (তারবিয়াতী) বৈঠক
- iv) দাওয়াতী অভিযান

৪। কর্মী বৈঠক

দ্বিতীয় দফার অন্যান্য সাংগঠনিক কাজ নিম্নরূপ

১। টার্গেট ভিত্তিক যোগাযোগঃ

ক) দাওয়াতি টার্গেট,

খ) কর্মী টার্গেট ঃ টার্গেট নেয়ার সময় যে সকল গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তি বাছাই করা দরকার।

❖ কর্মঠ; ❖ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ; ❖ সামাজিক; ❖ সৎ ও সত্যপ্রিয়। ❖ নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন।

গ) রুকন (সদস্য) টার্গেট

২। কর্মী যোগাযোগঃ

ক) কর্মী যোগাযোগের উদ্দেশ্যঃ মান উন্নন, সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, দুর্বলতা দূর করা, কাজে আরও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা, সম্পর্ক আরো মধুর করা, সমস্যা অবগত হওয়া এবং সমাধান বের করা ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে দায়িত্বশীলদের কর্মী যোগাযোগ করতে হবে।

খ) কর্মী যোগাযোগের পদ্ধতি i) পূর্বেই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে স্থান ও সময় নির্দ্ধারণ। ii) সাক্ষাতের শুরুতে সালাম বিনিময়ের পর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা জানার চেষ্টা। iii) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার খোঁজ-খবর নেওয়া ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান। iv) সাংগঠনিক বিষয়াদী নিয়ে আলোচনা করা। v) আন্দোলন সংগঠন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য অবহিতকরণ। vi) কর্মীর দুর্বলতাগুলো দরদ ভরা মন দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া। vii) মান উন্নয়নের জন্য উৎসাহিত করা। viii) সময় ও অর্থ ব্যয়ের ফজিলতগুলো কোরআন ও হাদীস থেকে বর্ণনা করা। ix) কুরআন হাদীসের বর্ণনা অনুসারে ব্যক্তিগত গুণাবলী অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা। [সূরা মুমিনুন এর ১-১১, ফুরকান শেষ রুকু, মুজাম্মিল ১-৭ আয়াত] x) পারস্পরিক দোয়া কামনা করে শেষ করা।

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার অধঃস্তন সংগঠনের ব্যক্তিদের সাথে কর্মী যোগাযোগ করতে হবে।

৩। সফর;

৪। পরিকল্পনাঃ

ক) পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় নিম্লোক্ত বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখতে হবেঃ ◆ জনশক্তি (সংগঠনের জনশক্তি) ◆ নেতৃত্বের মান ◆ কাজের পরিধি বা এলাকা ◆ বিভিন্ন দিকের পরিসংখ্যানমূলক জ্ঞান (জনসংখ্যা, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ইত্যাদি)। ◆ কর্মীদের মান ◆ অর্থনৈতিক অবস্থা ◆ পরিবেশ ◆ বিরোধী মহলের শক্তি ও তৎপরতা।

খ) পরিকল্পনা পর্যালোচনা বৈঠক।

৫। সাংগঠনিক সপ্তাহ/পক্ষ পালন।

৬। নেতৃত্ব নির্বাচন।

৭। **বায়তুল মালঃ** ক) কর্মীদের আর্থিক কুরবাণী; খ) শুভাকাঙ্খীদের থেকে।

৮। **রেকর্ডিংঃ** বিশেষ করে নিমেড়বাক্ত জিনিসগুলো সংরক্ষণ করতে হয় ঃ

১. কর্মী ও সদস্যদের (রুকনদের) তালিকা (ঠিকানাসহ)
২. দায়িত্বশীলদের ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার
৩. রিপোর্ট (সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত)
৪. বই-এর তালিকা

৫. সহযোগী সদস্যদের ফরম ও ফরমের মুড়ি
৬. সদস্যপ্রার্থী (রুকন প্রার্থী) আবেদনপত্র
৭. রশিদ বই-এর মুড়ি
৮. ক্যাশ বই
৯. লেজার
১০. বিভিন্ন পরামর্শ ফাইল
১১. বিভিন্ন বৈঠকের কার্যবিবরণী (শূরা/কর্মপরিষদ/ টীম, ষান্মাসিক সদস্য (রূকন) সম্মেলন, মাসিক সদস্য (রূকন) বৈঠক, কর্মী সম্মেলন, সভাপতি সম্মেলন, জনসভা, শিক্ষা শিবির, কেন্দ্রীয় সফর ইত্যাদি)।
১২. ছাপানো পোস্টার ও লিফেলেটের নমুনা কপি।
১৩. প্রকাশিত সংবাদ কাটিং, প্রেরিত সংবাদ কপি।
১৪. প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের তৎপরতা (নেতৃবৃন্দের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার)।
১৫. সার্কুলার ঃ (ক) ঊর্ধ্বতন থেকে প্রাপ্ত, (খ) অধঃস্তনে প্রেরিত।
১৬. বিশিষ্ট লোকদের তালিকা প্রণয়ন ও নিয়মিত যোগাযোগ। যেমন রাজনৈতিক, উলামা-মাশায়েখ, আইনজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, জনপ্রতিনিধি ব্যক্তিবৃন্দ।

উপরিউক্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য কমপক্ষে নিমড়বলিখিত রেজিস্টার ও ফাইলের প্রয়োজন ঃ
রেজিস্টার ঃ i) কর্মী তালিকা (উপজেলা/থানায়) ii) বই তালিকা ও ইস্যু রেজিস্টার iii) সদস্য (রুকন) তালিকা iv) বিভিন্ন বৈঠকের কার্যবিবরণী v) ক্যাশবুক ও লেজার বুক vi) হাজিরা রেজিস্টার (বিভিন্ন বৈঠকে উপস্থিতি) vii) সদস্য (রুকন) টার্গেট তালিকা ও প্রার্থী রেজিস্টার viii) সাংগঠনিক রিপোর্ট রেকর্ড রেজিস্টার ix) সদস্যদের (রুকনদের) ব্যক্তিগত রিপোর্ট রেজিস্টার x) দায়িত্বশীলদের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার xi) বিশিষ্ট লোকদের তালিকা xii) রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের নাম ও ঠিকানা।

ফাইল ঃ i) সহযোগী সদস্য ফাইল (মুড়ি) ii) ভাউচার ফাইল iii) রিপোর্ট ফাইল (উপরে পাঠানো, অধঃস্তনের কপি) iv) সার্কুলার ফাইল (উপর থেকে প্রাপ্ত, নিচে প্রেরিত) v) চিঠির ফাইল (ঐ) vi) পরিকল্পনা ফাইল (কেন্দ্রীয়, জেলা/মহানগরী, উপজেলা/থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড) vii) সদস্যদের (রুকনদের) ব্যক্তিগত রিপোর্ট ফাইল viii) সদস্য প্রার্থী (রুকন প্রার্থী) আবেদনপত্র ফাইল ix) রশিদ বই-এর মুড়ি x) পরামর্শ ফাইল।

৯। রিপোর্ট সংরক্ষণ
১০। অফিস।

(খ) প্রশিক্ষণ

১। পাঠ্যসূচি ভিত্তিক ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন।
২। প্রশিক্ষণ বৈঠক
৩। সামষ্টিক পাঠ।
৪। পাঠচক্রঃ পাঠচক্রের অধিবেশন মাসে কমপক্ষে ১টি হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতি অধিবেশন ২ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হবে না। পাঠচক্রকে ফলপ্রসূ করতে হলে নিম্নোক্ত দিকগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকারঃ
i) পাঠচক্রেরর সদস্যগণ সমমানের হবে। ii) পরিচালককে অবশ্যই অভিজ্ঞ ও যোগ্য হতে হবে। iii) পরিচালক পড়াশুনা ও চিন্তাভাবনার জন্য প্রথম অধিবেশনেই প্রয়োজনীয় গাইড লাইন দেবেন। iv) সকল সদস্যই বিষয়বস্তুর উপর পড়াশুনা করে আসবেন এবং আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় নোট সাথে রাখবেন। v) অধিবেশনে সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে। vi) যথাসময়ে উপস্থিত হতে হবে। vii) যথাযথ মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। পূর্ণ আন্তরিকতা ও একাগ্রতা নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে হবে। viii) পরিচালক আলোচনাকে একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করবেন এবং প্রতিটি পয়েন্টের উপসংহার পেশ করবেন। ix) প্রতিটি পয়েন্টের মূল কথাগুলোকে সকলে নোট করবেন।
৫। আলোচনা চক্র।
৬। শিক্ষা বৈঠক।
৭। শিক্ষা শিবির।
৮। গণশিক্ষা বৈঠক।
৯। গণ নৈশ ইবাদত
১০। ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ।
১১। মুহাসাবা।
১২। বক্তৃতা অনুশীলন।
১৩। দোয়া, যিকর ও নফল ইবাদত।
১৪। সামষ্টিক খাওয়া।
১৫। আত্মসমালোচনা।

তৃতীয় দফা কর্মসূচি ঃ সমাজ সংস্কার ও সমাজ সেবা

গঠনতন্ত্রের ভাষায় জামায়াতের তৃতীয় দফা কর্মসূচি হলো ঃ "ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন ও দুস্থ মানবতার সেবা করা।" কেবলমাত্র কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন বা কিছু দাওয়াতী ও সাংগঠনিক কাজ করলেই পুরাপুরি ইসলাম গ্রহণ এবং মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব পালনের কাজ সম্পূর্ণ হয় না। সাথে সাথে সামাজিক সংস্কার ও সমাজ সেবামূলক প্রয়োজনীয় কিছু কাজেও হাত দেয়া দরকার।

এর আলোকে এ দফায় তিনটি প্রধান কাজ রয়েছে ঃ ক) সমাজ সংশোধন ও সমাজ সংস্কার খ) অপসংস্কৃতি রোধ ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ গ) দুস্থ মানবতার সেবার লক্ষ্যে সমাজ সেবা

ক) সমাজ সংশোধন ও সমাজ সংস্কার

১। প্রচলিত কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্কীকরণ।
২। ইসলামী আচার অনুষ্ঠান চালুকরণ।
৩। পেশাভিত্তিক কাজ।
৪। গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন।
৫। মসজিদ সংস্কারঃ এতে ২টি সমস্যা প্রধানত দেখা যায়, যেমন- ক) অব্যবস্থাপনা ও খ) অযোগ্য ও দুর্বল লোকদের পরিচালনা।
৬। হাট-বাজার সংস্কার।
৭। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা।
৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
৯। ক্লাব, সমিতি স্থাপন ও পরিচালনা।
১০। সমাজবিরেধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

খ) অপসংস্কৃতি রোধ ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ

এ দফায় ২টি কাজ–
ক) অপসংস্কৃতি রোধ ও
খ) ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশঃ ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যম-
১) পত্র-পত্রিকা প্রকাশ; ২) ইসলামী গান রচনা ও প্রচলন; ৩) কিরাআত, ইসলামী গানের রেকর্ড; ৪) প্রদর্শনী; ৫) জ্ঞান চর্চার অভ্যাস।

গ) দুস্থ মানবতার সেবার লক্ষ্যে সমাজ সেবা

১) দাতব্য চিকিৎসালয়; ২) রোগীর পরিচর্যা; ৩) পরিচ্ছন্নতা অভিযান; ৪) রাস্তাঘাট মেরামত; ৫) অফিস আদালতে কাজের সহযোগিতা; ৬) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আকস্মিক দুর্ঘটনায় জনগণের পাশে দাড়ানো; ৭) দুর্দশাগ্রস্ত, বিত্তহীন ও ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা; ৮) গরীব ছাত্রদের সহযোগিতা দান; ৯) বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান; ১০) কর্জে হাসানা; ১১) ভ্রাম্যমান দাতব্য চিকিৎসালয়; ১২) বিয়ে-সাদী; ১৩) পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রেরণ; ১৪) মাইয়েতের কাফন-দাফন ও জানাযায় অংশগ্রহণ; ১৫) প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ; ১৬) সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সৃষ্টি।

চতুর্থ দফা কর্মসূচি ঃ রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও সংশোধন

গঠনতন্ত্রের ভাষায় জামায়াতের চতুর্থ দফা কর্মসূচি হলো ঃ "গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্ড়রে সৎ ও চরিত্রবান লোকের নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা।" অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সংস্কার বা সরকারের সংশোধনই হ'ে ছ এ দফার মূল কাজ। এসব কাজের মাধ্যমেই আলাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম হবে। নিমেড়বাক্ত কাজগুলো এ দফার অন্তর্ভুক্ত ঃ

১। সমাজ বিশ্লেষণ। ২) রাজনৈতিক বিশ্লেষন; ৩) বিবৃতি প্রদান; ৪) স্মারকলিপি পেশ; ৫) দাওয়াতী জনসভা; ৬) পথসভা, গণজমায়েত, মিছিল, জনসভা ও বিক্ষোভ; ৭) প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ; ৮) রাজনৈতিক যোগাযোগ; ৯) সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ ও সাংবাদিক সম্মেলন; ১০) বার লাইব্রেরীতে যোগাযোগ; ১১) ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ; ১২) পত্র-পত্রিকা প্রকাশ; ১৩) জনমত গঠন; ১৪) নির্বাচন; ১৫) রাজনৈতিক বিভাগ সৃষ্টি; ১৬) যাকাত আদায়ের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি; ১৭) সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক জুলুমের প্রতিবাদ ও সমাধান পেশ।

তাওহিদ সংক্রান্ত সূরা হাশরের শেষ রুকু মুখস্ত (১৮-২৪)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

(১৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী (পুণ্য কাজ) অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন।

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٩﴾

(১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে করেছেন আত্মভোলা (আল্লাহ কে স্মরন করার কথা মনেই আসে না) । আর তারাই হল ফাসিক।

لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۲۰﴾
(২০) জাহান্নামের অধিবাসী আর জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না, জান্নাতের অধিবাসীরাই সফল।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾
(২১) আমি যদি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি আল্লাহর ভয়ে তাকে বিনীত ও বিদীর্ণ (গলে গেছে) দেখতে। এ সব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা (নিজেদের ব্যাপারে) চিন্তা-ভাবনা করে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۲﴾
(২২) তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, অদৃশ্য ও দৃশের জ্ঞানের অধিকারী, পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾
(২৩) তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, পূর্ণ শান্তিময়, নিরাপত্তা দানকারী, প্রতাপশালী, পর্যবেক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য, প্রকৃত গর্বের অধিকারী। তারা যাকে (তাঁর) শরীক করে তাথেকে তিনি পবিত্র, মহান।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۴﴾
(২৪) তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবনকারী, আকার আকৃতি প্রদানকারী। সমস্ত উত্তম নামের অধিকারী। আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত মহা প্রজ্ঞাবান।

তাওহিদ সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত (পৃষ্ঠা-৮),
মাসয়ালা: নামাজ সংক্রান্তঃ **(পৃষ্ঠা-৮)**।

অনুশীলনী -০৩ ফেব্রুয়ারী-১ম সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - **সূরা তাকাসুর**

দারসুল কোরআন সূরা আত-তাকাসূর:
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ
প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, The mutual rivalry for piling up (the good things of this world) diverts you (from the more serious things),
حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও। Until ye visit the graves.
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। But nay, ye soon shall know (the reality).
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। Again, ye soon shall know!
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ
কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে। Nay, were ye to know with certainty of mind, (ye would beware!)
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, Ye shall certainly see Hell-Fire!
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য প্রত্যয়ে, Again, ye shall see it with certainty of sight!
ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। Then, shall ye be questioned that Day about the joy (ye indulged in)
নামকরণ:- নামকরণ বিষয়বস্তু অনুসারে হয়ে থাকে, আবার আয়াতের অংশবিশেষ থেকে ও নেওয়া হয়ে থাকে।
দু'পদ্ধতির মধ্যে এ সুরায় প্রথম আয়াত থেকে সরাসরি নেওয়া হয়েছে।

তাকাসুর শব্দটি আরবি: كَثْرَة থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ প্রচুর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হাসান বসরী (রহঃ) তফসীর করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ্ (রহঃ) এ অর্থই করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন,

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার এ আয়াত তেলাওয়াত করে বললেনঃ এর অর্থ অবৈধ পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং আল্লাহ নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা।

নাযিল হওয়ার সময় ও স্থান বা শানে নুযূলঃ-

ইবনে আবু হাতেম আবু বুরাইদার (রাঃ) রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছেঃ বনী হারেসা ও বনিল হারস নামক আনসারদের দুটি গোত্রের ব্যপারে এ সূরাটি নাযিল হয়। উভয় গোত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে প্রথমে নিজেদের জীবিত লোকদের গৌরবগাঁধা বর্ণনা করে। তারপর কবরস্থানে গিয়ে মৃত লোকদের গৌরবগাঁধা বর্ণনা করে। তাদের এই আচরণের ফলে আল্লাহ এই বাণী নাযিল হয়। কিন্তু শানে নূযুলের জন্য সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাকে এই সূরা নাযিলের উপলক্ষ বলে মেনে নেবার সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

ইমাম বুখারী ও ইবনে জারীর হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রাঃ) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ তাতে তিনি বলেছেনঃ "আমরা রসূলে করীম (সাঃ) এর এ বাণীটিকে কুরআনের মধ্যে মনে করতাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত আলহাকুমুত্তাকাসুর সূরাটি নাযিল হয়।"

রসূলে করীম (সাঃ) একবার সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন তোমাদের মধ্যে কারও এমন ক্ষমতা নেই যে, এক হাজার আয়াত পাঠ করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ হাঁ, এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনের আছে। তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ কি সূরা তাকাছুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য এই যে, দৈনিক এই সূরা পাঠ করা এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান।

তথ্যসূত্র

১. কুরতবী
২. তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন (১১ খন্ডের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা)।
৩. তাফহীমুল কোরআন।
৪. মাযহারী

- ❖ কুরআন শরীফের ১০২ তম সূরা
- ❖ তাকাসুর
- ❖ পরিসংখ্যান
- ❖ সূরার ক্রম ১০২
- ❖ আয়াতের সংখ্যা ৮
- ❖ পারার ক্রম ৩০
- ❖ রুকুর সংখ্যা ১
- ❖ পূর্ববর্তী সূরা সূরা ক্বারিয়াহ
- ❖ পরবর্তী সূরা সূরা আছর

বনি আদমের কাছে যদি দুই উপত্যকা সমান সম্পদ থাকে তারপরও সে তৃতীয় একটি উপত্যকার আকাংক্ষা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া আর কিছু দিয়ে ভরে না। (আল হাদিস)

রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রখ্যাত সাহাবী তারজুমানুল কুরআন ইবন আব্বাস (রা) এর মতানুযায়ী সূরা আত তাকাসুর মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

এই সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতিকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন মানুষের জীবনের যে সাধারণ লক্ষ্য অর্থাৎ সম্পদ আহরণ তা থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে মুমিনদের জন্য জীবনের যথার্থ লক্ষ্য যা হওয়া উচিৎ যা কিনা আমাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ এবং ইবাদত সেদিকে মনোনিবেশ করার। এ সূরার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু হাদীস রয়েছে।

বুখারী শরীফের একটি হাদীস অনুযায়ী, আল্লাহর রাসূল (সা) ভবিষ্যত সম্পর্কে মুসলিমদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: *আল্লাহর শপথ! আমি এ ভয় করি না যে তোমরা দরিদ্র হয়ে পড়বে। (উল্লেখযোগ্য সে সময় আল্লাহর রাসূলের (সা) অধিকাংশ সাহাবীই দরিদ্র ছিলেন) আমি ভয় করি যে তোমাদেরকে দুনিয়াবী সম্পদ দেয়া হবে প্রচুর পরিমাণে, যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে দেয়া হয়েছিল, এবং তোমরা এর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করবে যেমনটি তারা করেছিল, অতঃপর তাদের মত তোমাদেরকেও তা (সঠিক পথ থেকে) দূরে সরিয়ে দেবে। তাই মুসলিমদের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) ভয় ছিল এ ব্যাপারে যে, মুসলিমরা পার্থিব ধনসম্পদ লাভ করবে এবং তা তাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় বিপথে নিয়ে যাবে।*

অপর একটি হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন তাঁর সাহাবীদেরকে প্রশ্ন করলেন

" তোমাদের মধ্যে কেউ কি দৈনিক কুরআনের এক হাজারটি আয়াত তিলাওয়াত করতে সক্ষম নয়?" এবং সাহাবীদের মাঝে একজন বলে উঠলেন: "আমাদের মাঝে কে আছে যে দৈনিক কুরআনের হাজারটি আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি 'আলহাকুমুত তাকাসুর' তিলাওয়াত করতে সক্ষম নয়?"

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে গভীর চিন্তাভাবনা সহকারে সূরা আত তাকাসুর একবার তিলাওয়াতের (শুধু না বুঝে মুখস্থ বলে যাওয়া নয়) সওয়াব কুরআনের হাজারটি আয়াত তিলাওয়াতের সওয়াবের সমতুল্য। এ থেকে বোঝা যায় যে কুরআনের প্রায় এক হাজার আয়াতে বিভিন্নভাবে সেই সমস্ত বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো সূরা আত তাকাসুরে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপর এক সাহাবী বর্ণনা করেন যে তিনি একদিন আল্লাহর রাসূল (সা) এর নিকট আসলেন যখন তিনি সূরা আত তাকাসুর তিলাওয়াত করছিলেন, এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: "মানুষ বলে: আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। কিন্তু হে আদম সন্তান, কোন সম্পদই কি তোমার সেটুকু ছাড়া, যতটুকু তুমি খেয়েছ, ব্যবহার করেছ, পরিধান করে নষ্ট করে ফেলেছ, আর যা তুমি সাদকা করেছ এবং এর দ্বারা একে স্থায়িত্ব দিয়েছ?"

মানুষের সব সম্পদ এই দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত, যা মানুষ খরচ করে ফেলে, আর এরপর তা তার আর কোন কাজে আসে না, কিংবা যা সে সাদকা করে, ফলে তা (তার প্রতিদান, অনেকগুণ বর্ধিত আকারে) তার জন্য রয়ে যায় এমনকি মৃত্যুর পরেও।

ব্যখ্যাঃ

আয়াত ১: " أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ" ভাবার্থ: "সম্পদ আহরণ তোমাদেরকে বিক্ষিপ্ত (গাফিল) করে রাখে।"

- মানুষ তার জীবনের জাগ্রত সময়ের অধিকাংশই ব্যয় করে সম্পদ আহরণে, এই বাস্তবতার মাঝেই আমরা বাস করছি। আমরা যতই আত্মিক উন্নতি লাভ করতে চাই না কেন আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয় হয় সম্পদাহরণে। এখানে সম্পদ বলতে শুধু টাকা-পয়সা বোঝানো হয় নি, বরং তা অন্য প্রকারও হতে পারে, যেমন: সন্তান-সন্ততি। কেননা অধিক সন্তান-সন্ততি থাকা মানে সমাজে অধিকতর শক্তিশালী অবস্থান সমাজে অনেকেই তাদের সন্তান-সন্ততির বড়াই করে থাকে। যদিও বর্তমান যুগে এই ধারণাটি বদলে গেছে পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রভাবে, যেখানে পশ্চিমে মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবার ছোট রাখার পক্ষপাতি, এবং তারা মুসলিমদেরকেও এই ধোঁকায় ফেলছে যে অধিক সন্তান-সন্ততি হলে তাদের ভরণ-পোষণ করা সম্ভব হবে না, ফলে মুসলিমরাও তাদের বংশবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) উপদেশ দিয়েছেন: "তোমরা বিয়ে কর এবং অধিক

সন্তান লাভ কর।" যাহোক সাধারণভাবে ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি মানুষের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য এবং অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, এবং মানুষ যথাসম্ভব সম্পদাহরণে সচেষ্ট হয় কেননা তা বিভিন্নভাবে তাদের জীবনকে উপভোগ্য করে তোলে। বর্তমান সমাজের সাধারণ চিত্র হচ্ছে এই যে পরিবারের কর্তা সারাদিন ঘরের বাইরে অবস্থান করবেন, তার কর্মক্ষেত্র থেকে সম্পদ আহরণের জন্য, আর কর্ত্রী ঘরে অবস্থান করে সেই সম্পদকে ব্যয় করবেন এবং তিনিও তা জমা করবেন ঘরে সঞ্চিত বিভিন্ন ভোগ্য বস্তুর আকারে নতুন এটা, নতুন ওটা, বছর বছর ঘরে নতুন পর্দা, নতুন সোফা ইত্যাদি কখনও পরিতৃপ্ত না হয়ে আরও বেশী করে সম্পদ জমা করতে থাকা। উভয়পক্ষেই চলে এই সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া, পুরুষ ঘরের বাইরে থেকে সম্পদাহরণে ব্যস্ত, আর নারী ঘরের ভেতর বিভিন্ন ভোগ্য পণ্যের আকারে সেই সম্পদকে জমা করতে সক্রিয়। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আনফালের ২৮ নং আয়াতে আমাদেরকে সাবধান করছেন:

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"আর জেনে রাখ, তোমাদের সম্পদ এবং সন্তানুসন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা বৈ নয়, আর নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার (যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের জন্য)।" (সূরা আল আনফাল, ৮ : ২৮)

আল্লাহ এখানে আমাদের সামনে সম্পদ এবং সন্তানের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছেন, এ সবই আমাদের জন্য পরীক্ষা, এগুলোর সাহায্যে আমাদেরকে শুধুই পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা পৃথিবীতে এসেছি এগুলো না নিয়ে, আবার পৃথিবী থেকে বিদায়ও নেব এগুলো না নিয়েই। সুতরাং ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির প্রতি আমাদের বাসনা যেন আমাদেরকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে না পারে এ কথা জানা যে আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত, এবং এর দ্বারা তাঁকে স্মরণ করা। আল্লাহ পাক পুনরায় সূরা আল মুনাফিকুনের ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

" হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সম্পদ এবং সন্তানুসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত না করে, এবং যারা এমনটি করবে (সম্পদ ও সন্তান সন্ততির দ্বারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিক্ষিপ্ত হবে), তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা আল মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯)

যারা সম্পদাহরণ ও সন্তানের প্রতি তাদের বাসনার কারণে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত হল, তারা প্রকৃতপক্ষেই তাদের জীবনের মূল লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলল। আল্লাহ পাক বলেন:

وَالْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে...।" (সূরা আল আসর, ১০৩:১৩)

অর্থাৎ তারাই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হবে না যারা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। কিন্তু আমরা যদি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং ধারাকে হারিয়ে ফেলি এবং আল্লাহকে স্মরণ না করি, তার অর্থ হচ্ছে শয়তান আমাদেরকে কব্জা করে ফেলেছে এবং আমরা শয়তানের দাসে পরিণত হয়েছি, আমাদের নিজেদের কামনা-বাসনার দাসে পরিণত হয়েছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

"তুমি কি তাকে দেখনি যে তার প্রবৃত্তিকে তার দেবতা বানিয়েছে?" (সূরা আল ফুরকান, ২৫ : ৪৩)

এটা এমন অবস্থা যখন একজন মানুষ তার বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করে, প্রাচুর্যের বাসনা তার ইলাহতে পরিণত হয়। আর সম্পদের প্রতি এই বাসনা অনির্বাণ, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যদি আদম সন্তানকে স্বর্ণের একটি উপত্যকা দেয়া হয়, সে আরেকটি চাইবে। শুধুমাত্র যে জিনিসটি তার মুখ পূর্ণ করতে পারবে, তা হল তার কবরের মাটি।" এই কবরের মাটিই কেবল তাকে নিরস্ত করতে পারে, এর পূর্ব পর্যন্ত সে যতই পাবে, ততই সে চাইতে থাকবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন "দীনার এবং দিরহামের দাস সবর্দাই দুর্দশাগ্রস্ত থাকবে।" তাদের জীবন হবে দুর্বিষহ। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন, আমরা যেন এমনটি হতে না দেই। যদিও আমাদের

চারপাশে আমরা তাদেরকে দেখতে পারব যারা ঐশ্বর্যে আমাদের থেকে সমৃদ্ধশালী। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্টত: জানিয়ে দিচ্ছেন:

وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ

আল্লাহ তা'আলা জীবনোপকরণে "আল্লাহ তোমাদের মাঝে কতককে রিযিকের ব্যাপারে কতকের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।" (সূরা আন নাহল, ১৬:৭১)

এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন কোন মানুষ অন্যদের থেকে অধিক লাভ করবে। এবং তিনি আমাদেরকে আরও বলেছেন:

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

" তোমরা সে জিনিসের কামনা করো না যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কাউকে অন্যদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন।" (সূরা আন নিসা, ৪:৩২)

কেন নয়? কারণ এই প্রাধান্য দেয়া একটি পরীক্ষা। তিনি কাউকে তোমার চেয়ে বেশী দিয়েছেন, তিনি যদি তোমাকে তা দেন যা অন্যকে দিয়েছেন, তবে তা তোমার জন্য মাত্রাতিরিক্ত হবে (তুমি সীমা লংঘন করবে), তিনি ততটুকুই তোমাকে দিয়েছেন যতটুকু তোমার জন্য ভাল। তিনি সবাইকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী রিযিক বন্টন করেছেন, এবং আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন:

ط لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার যোগ্যতার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না।" (সূরা বাক্বারাহ, ২:২৮৬)

সুতরাং প্রত্যেকেই ততটুকু পাবে যতটুকু তার জন্য যথার্থ। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যারা তোমার ওপরে অবস্থান করছে, তাদের দিকে তাকিও না, তাদের দিকে তাকাও যারা তোমার নীচে রয়েছে।" কেননা কেউ যদি তার চেয়ে হতভাগ্যদের দিকে তাকায়, তখন সে তার নিজের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহ দেখতে পাবে এবং কৃতজ্ঞ হবে। কিন্তু কেউ যদি সবসময় তার চেয়ে বেশী সৌভাগ্যবানদেরকে লক্ষ্য করে, তাহলে তার মনে হবে "আমি কেন বঞ্চিত হলাম?" এ অবস্থায় মানুষ কখনও সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, সে সর্বদা বিচলিত, হতাশ, চিন্তিত ও ব্যস্ত থাকে অধিক আহরণের জন্য। এমনকি সম্পদ হাতে আসার পরও এমন লোক ভীত থাকে যে কখন আবার তা নিঃশেষ হয়ে যায়, সে চারপাশের মানুষকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, এই বুঝি কেউ তার সম্পদ হ্রাস করতে এল। কাউকে যদি সে তার সাথে হাসিমুখে কথা বলতে দেখে, তবে সে ধারণা করে, এ বোধহয় আমার কাছে কিছু চাইতে এসেছে। এভাবে তারা জীবনের খুব সরল বিষয়গুলো থেকে সহজতম আনন্দও নিতে পারে না। সবকিছুই তাদের কাছে অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়ায়, তাদের অন্তর কখনই স্থিতি লাভ করতে পারে না, কেননা তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার স্মরণ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

" কেবলমাত্র আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

তাই যদি আমরা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাই, তবে আমরা কিছুতেই অন্তরে প্রশান্তি ও বিশ্রাম লাভ করতে পারব না। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: "তাদের সম্পদ এবং সন্তানুসন্ততি যেন তোমাকে চমৎকৃত না করে..." (সূরা আত তাওবা , ৯ : ৫৫)

এখানে কাফির, পথভ্রষ্টদের কথা বলা হচ্ছে, তাদের অর্জন যেন তোমাকে চমৎকৃত না করে। কেননা "...আল্লাহর পরিকল্পনা হচ্ছে তাদেরকে দুনিয়ার এসমস্ত জিনিস দ্বারা শাস্তি দেয়া, যেন তাদের জান এ অবস্থায় কবয করা হয় যে তারা অবিশ্বাসী।" (সূরা আত তাওবা, ৯ : ৫৫)

কেননা তারা যখন সীমা-লংঘন করা সত্ত্বেও আরও বেশী করে সম্পদ লাভ করে, তখন তারা উৎফুল্ল হয় এই ভেবে যে আমরা খুব ভাল-ভাল কাজই করছি, সবই ঠিকমত চলছে, তখন তাদের সীমা-লংঘন আরও বেড়ে যায়, কিন্তু এটা প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য শাস্তি, কেননা আরও বেশী সম্পদ লাভ করার কারণে তারা কখনও তা ‡ দর ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করবে না, কারণ যখন সম্পদের ক্ষতি হয়, তখন একজন মানুষ এ চিন্তা করার অবকাশ পায়, যে তার হয়ত এভাবে সম্পদের পেছনে ছোটা উচিৎ নয়, বিশেষতঃ যখন তা এত সহজেই হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাকে যদি আল্লাহ দিতেই থাকেন, তবে কখনও সে ফিরে আসবে না এবং এই অবস্থায় ম„ত্যুবরণ করবে। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের মাঝে তোমাদের জন্য শত্রু" রয়েছে, অতঃপর তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও।"

এখানে তাদেরকে সাধারণভাবে শত্রু" বলা হয়নি, কিন্তু আমরা যদি তাদের সাথে সেভাবে আচরণ করতে ব্যর্থ হই যেভাবে আল্লাহ চান, তবে তারা আমাদের শত্রুতে পরিণত হয়। যেমন কারও স্ত্রী যদি সাজসজ্জা করে এবং সুগন্ধী মেখে বেড়াতে যেতে চায়, অথচ সে ব্যক্তি জানে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

" যে মহিলা সুগন্ধী ছড়িয়ে বাইরে যায়, সে একজন যিনাকারী, যতক্ষণ না সে ঘরে ফিরে আসে।"

কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার কারণে তাকে বাধা দিতে চায় না এবং এভাবে তাকে ঘরের বাইরে যেতে দেয়, এ অবস্থায় এই স্ত্রী তার শত্র"তে পরিণত হয়, কারণ এই স্ত্রী তাকে আল্লাহর আদেশ পালন থেকে বিরত রেখে আখিরাতে শাস্তির উপযুক্ত করে তুলল। কারণ এ কাজের জন্য এই ব্যক্তিকে আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে, রাসূল (সা) বলেন: " তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল, এবং প্রত্যেককে সে যার রাখাল (অর্থাৎ যারা বা যা কিছু তার ক্ষমতাধীন ও অধীনস্থ) তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

সুতরাং এই ক্ষেত্রে এই স্ত্রী তার পাপের জন্য শাস্তির যোগ্য, এবং এই স্বামী তার অধীনে তার স্ত্রীকে এ কাজ করতে দেয়ার জন্য শাস্তির যোগ্য, এভাবে তার স্ত্রী প্রকৃতপক্ষে তার শত্র"তে পরিণত হল। একইভাবে ধরা যাক সন্তানরা তাদের জন্মদিন করতে চাচ্ছে, এবং তারা তাদের বাবার মন গলানোর জন্য বলছে, যে আমার বন্ধুদের জন্মদিন হয়, অমুকের জন্মদিন হয়, আমি কেন করতে পারব না, অথচ আপনি জানেন **যে জন্মদিন পালন** করা ইসলামে নিষিদ্ধ কেননা এই অনুষ্ঠানের মূল প্রোথিত পৌত্তলিকতায়। আপনি যদি স্নেহপরবশ হয়ে আপনার সন্তানদেরকে জন্মদিন পালন করার অনুমতি দেন, তাহলে এই সন্তানরা আপনার শত্র" ‡ ত পরিণত হল কেননা আপনাকে তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত করে দিল। এখানে প্রকৃতপক্ষে যে অবস্থাটি তৈরী হয়েছে, তা হল আপনার স্ত্রী-সন্তানের প্রতি আপনার ভালবাসা আল্লাহর প্রতি আপনার

ভালবাসাকে ছাড়িয়ে গেছে, ফলে আপনি ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক করতে শুরু করেছেন। তাওহীদের দাবী এটাই যে আমরা কোন মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কোন আদেশ অমান্য করব না।

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত ২: " حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ " অর্থ: "যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।"
অর্থাৎ বিভিন্নভাবে সম্পদ আহরণের পেছনে সাধনা তোমাদেরকে ব্যস্ত রাখে একেবারে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। সূরা আনআমের ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:
فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ
"অতএব যখন তারা সতর্কবাণী ভুলে গেল, যার দ্বারা তাদেরকে স্মরণ করানো হয়েছিল, আমরা তাদের জন্য প্রতিটি (উপভোগ্য) বস্তুর দরজা খুলে দিলাম, যতক্ষণ না তারা এই ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়ল এবং হঠাৎ এর মাঝে আমি তাদেরকে ছিনিয়ে নিলাম (মৃত্যু ঘটিয়ে দিয়ে শাস্তিতে নিক্ষেপ করলাম)..." (সূরা আল আনআম, ৬ : ৪৪)
তাদের এই পরিণতি এজন্য যে তারা সম্পদের দ্বারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার উপদেশকে ভুলে গিয়ে শয়তানের কব্জার মধ্যে চলে যায়, এবং আল্লাহ তাদেরকে যাবতীয় পার্থিব সম্পদ দান করতে থাকেন, এবং তাদের এই ভোগ-বিলাসের মধ্যস্থলে হঠাৎ তাদের জান কবয করা হয় এ অবস্থায় যে তারা কাফির। এভাবে যখন মৃত্যু আমাদেরকে স্পর্শ করে, আমরা উপলব্ধি করি যে, জীবিত অবস্থায় এ সবকিছুই ছিল আমাদের জন্য পরীক্ষামাত্র। এই জীবনে মানুষ সহজে বিভ্রান্ত হয় কেননা এখানে আমরা যা করছি, তার পরিণতি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এই পরিণতি আমরা কেবল জানতে পারি ওহীর মাধ্যমে। দৃশ্যত আমাদের মগ্ন হয় যে একজন লোক ভাল কাজ করেও খারাপ পরিণতি বরণ করছে, অথচ অপর একজন খারাপ কাজ করেও পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করছে, বহু বড় বড় পাপাচারীকে দেখা যায় সম্পদ এবং সম্মানের স্তুপের ওপর অধিষ্ঠিত অবস্থায়। তাই কাজের পরিণতি আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট নয়। কেবল আল্লাহর নবীরাই আমাদেরকে কাজের প্রকৃত পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করেন যে, চূড়ান্ত পরিণতিতে আমাদের সবার কাজের হিসাব নেয়া হবে, এবং এ পৃথিবীতে সেটা না হলেও পরবর্তী জীবনে অবশ্যই তা হবে। তাই আল্লাহ যখন আমাদের এই সংবাদ দিচ্ছেন যে মানুষ তাদের সম্পদাহরণের প্রচেষ্টার জালে আটকে পড়ে থাকে মৃত্যুমুখে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত, তিনি আমাদেরকে এই উপদেশই দিচ্ছেন যে আমরা যেন সেই রাস্তায় না যাই। আমরা যেন এই অবস্থায় আটকে পড়ার আগেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করি। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা নিসার ১৮ নং আয়াতে বলেন:
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (১৮)
আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকেঃ আমি এখন তওবা করছি। অতএব তার তাওবাহ কোনন কাজজে আসবে না, তারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা আন নিসা, ৪ : ১৮)
যদি মৃত্যুযন্ত্রণা একবার শুরু হয়ে যায়, এ অবস্থায় তওবা কবুল করা হবে না, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। বাস্তব কথা হচ্ছে আমরা জানি না যে মৃত্যু কখন হাজির হবে, এটা যেকোন মুহূর্তে হতে পারে। যদি আমরা সত্যিই না জানি যে মৃত্যু কখন আসবে আমরা কি আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন থাকার সাহস দেখাতে পারি? নিশ্চয়ই নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: *"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দার তওবা কবুল করবেন মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।"*
যে অবস্থায় একজন ব্যক্তি নিশ্চিত হয়ে যায় যে তার মৃত্যু উপস্থিত, এ অবস্থায় তার তওবা কবুল হবে না, আর আমরা কেউই জানিনা কখন আমার সে অবস্থাটি চলে আসবে। আমরা যদি জীবনের কোন এক সময় **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** শিখে থাকি, *আর মৃত্যুর সময় যদি শিয়রে বহু লোক বসে এই কলেমা পড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে, তবুও একজন মৃত্যুপথযাত্রী এটা উচ্চারণ করতে পারবে এবং সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারবে, এর কোন নিশ্চয়তা নেই। এই নিশ্চয়তা লাভের একটিই উপায়, এখন থেকেই নিজের জন্য নেক কাজের জীবন বেছে নেয়া, সৎকর্মের পথে চলার জন্য এখনই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া অর্থাৎ যেসব কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, সেগুলো করতে চেষ্টা করা, এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এমন কাজ পরিহার করতে সচেষ্ট হওয়া।*
কেননা আল্লাহ পাক বলেন:
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
"এবং নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ কোন আত্মাকে অবকাশ দেন না, এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।" (সূরা আল মুনাফিকুন, ৬৩ : ১১)
আমাদের সকলের মৃত্যুর ক্ষণটি নির্ধারিত হয়ে আছে, আমরা একে এগোতেও পারব না, পিছাতেও পারব না, এটা নির্ধারিত, তবে কখন, তা আমাদের জানা নেই। এজন্য, মৃত্যু যেকোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে এ বিশ্বাস নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। এর মানে এই নয় যে সবসময় মৃত্যুর ভয়ে দরজা আটকে ঘরে বসে থাকতে হবে, কেননা আল্লাহ পাক আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে মৃত্যু যথাসময়ে উপস্থিত হবেই, যদিও বা কেউ সুউচ্চ টাওয়ারে তার বিছানায় অবস্থান করে, তাহলেও মৃত্যু নির্ধারিত সময় হলে তার কাছে পৌঁছে যাবেই। তাই আমাদের জীবনকে অতিবাহিত করতে হবে, কিন্তু এ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে যে যেকোন সময়ে আমি মৃত্যুবরণ করতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালাম: "***...যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।***" কোন কোন পণ্ডিত এর ব্যাখ্যা এটা নিয়েছেন যে কিছু মানুষ তাদের কবরকে পর্যন্ত বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের প্রতীকে পরিণত করে থাকে কবরের ওপর বিশাল সৌধ নির্মাণ করে ও এ নিয়ে গর্ববোধ করে থাকে। কেউ কেউ তাদের পারিবারিক কবরস্থান নিয়ে বড়াই করে যে কত সৌখিনভাবে একে সাজানো হয়েছে! এদের কাছে মৃত্যুর কোন অর্থ নেই, এরা মনে করে সম্পদ তাদেরকে চিরস্থায়ী করবে। আর তাই আমরা দেখতে পাই পৃথিবীতে সপ্তাশ্চর্যের একটি হচ্ছে তাজমহল। তাজমহলের বর্ণনায় দেখা যায় বাগাড়ম্বর এবং আবেগের প্রাচুর্য, সম্রাট শাহজাহান তার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন! এটা এমন ভালবাসা যা আপাদমস্তক আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা) কে আদেশ দিয়েছিলেন যে ***এক হাতের চেয়ে উঁচু কোন কবর পেলে তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে।*** এই ধরনের কাঠামো ইসলামে হারাম। অথচ একে মুসলিম স্থাপত্য এবং মুসলিমদের কীর্তির

নিদর্শন বলে প্রচার করা হয়! কখনও নয়। বরং এটা মুসলিমদের অধঃপতন এবং মূর্খতার জলজ্যান্ত প্রতীক, সীমাহীন অজ্ঞতার পরিচয়! তারা কিভাবে এমন বিলাসবহুল একটি সৌধ নির্মাণ করতে পারল যা কিনা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনবে! তেমনি উল্লেখ করা যায় *পাকিস্তানে জিন্নাহর কবরস্থানের কথা*, যেখানে সুবিশাল সৌধ নির্মিত হয়েছে, অথচ পাকিস্তান শব্দের অর্থ: পবিত্র ভূমি, কিংবা পবিত্রদের ভূমি! এবং আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ দেশেই এরূপ নমুনা পাওয়া যাবে, এমনকি আমাদের বাপ-দাদাদের কবরেও কোন না কোন ধরণের কাঠামো খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়, তা ফলক, কিংবা ফুলের তোড়া কিংবা সাদা রং করা কবর যে রূপেই হোক না কেন এ সবই পৌত্তলিকদের রীতির অনুসরণ, যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কবরকে এর চারপাশের জমি থেকে মোটেই ভিন্ন দেখানো উচিৎ নয়।

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত ৩: " كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُون"
অর্থ: "কিন্তু শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।"
অর্থাৎ সত্য হচ্ছে এই যে মৃত্যু অতি নিকটে, এই পার্থিব জীবনের বাস্তবতা তোমাদের কাছে শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের জুতার ফিতা থেকেও তার অধিক নিকটবর্তী, এবং জাহান্নামও।"
তোমরা ভুল ধারণার শিকার হয়েছ। বৈষয়িক সম্পদের এ প্রাচুর্য এবং এর মধ্যে পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী হয়ে যাওয়াকেই তোমরা উন্নতি ও সাফল্য মনে করে নিয়েছো। অথচ এটা মোটেই উন্নতি ও সাফল্য নয়। অবশ্যই অতি শীঘ্রই তোমরা এর অশুভ পরিণতি জানতে পারবে। [ইবন কাসীর, আদ্ওয়াউল বায়ান]

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত ৪: " ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُون "
অর্থ: "এবং অতঃপর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।"
এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একই কথা পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে এ ব্যাপারটিকে জোর দিচ্ছেন যে জীবনের বাস্তবতা বুঝতে পারার এই মুহূর্তটি অতি অতি নিকটে! যেমন আমরাও কোন কিছু জোর দিয়ে বলতে চাইলে দুবার বলে থাকি। কুরআনে কোন কোন আয়াত এভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বিশেষ জোর দেয়ার জন্য। কখনও কোন অতীব গুরুত্ববহ বক্তব্য বহনকারী আয়াতকে বিভিন্ন সূরায় পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, কখনও একই সূরার শুরুতে এবং শেষে আনা হয়েছে, কখনও পর পর আনা হয়েছে। মৃত্যুর ব্যাপারটি এত গুরুত্বপূর্ণ কারণ একবার কেউ কবরে শায়িত হয়ে গেলে তার বাকি জীবন কেবলই একের পর এক সত্যের উন্মোচন। তার কবর হয় জান্নাতের একটি বাগান, কিংবা একটি আগুনের বিছানা! আমাদের মৃত্যুর মুহূর্ত থেকেই আমাদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত ৫: " كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِين "
অর্থ: "যদি তোমরা নিশ্চিতভাবে জানতে!"
যদি আমরা সত্যিই জানতাম এই পার্থিব জীবনের প্রকৃত রূপ, তাহলে আমরা যেভাবে জীবন যাপন করছি, সেভাবে জীবন যাপন করতাম না, আমাদের জীবন সম্পূর্ণ বদলে যেত। কিন্তু আমাদের যদি এই নিশ্চিত জ্ঞান থাকত, তাহলে এই জীবন পরীক্ষার বিষয় হত না, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইচ্ছা করেই আমাদেরকে সেই জ্ঞান দান করেন নি। এই জ্ঞান আমাদেরকে দেয়া হয়েছে ওহীর মাধ্যমে যা ধর্মগ্রন্থে এসেছে, এবং এক্ষেত্রে আমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, আমরা নবীদেরকে বিশ্বাস করতে পারি, নাও করতে পারি, ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করতে পারি বা অবিশ্বাস করতে পারি। যদি মুমিনদেরকে নিশ্চিত জ্ঞান দেয়া হত, তবে তারা কখনও পথভ্রষ্ট হত না, তারা ফেরেশতায় পরিণত হত। কিন্তু আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করতে চান, আর এ জীবন আমাদের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত এক পরীক্ষা মাত্র, আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, আমরা এই পরীক্ষা ক্ষেত্রেই অবস্থান করছি, আর এই পরীক্ষা চলছে প্রতিনিয়ত।
বুখারী শরীফের হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: ***"আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে তোমরা অল্পই হাসতে এবং অধিক ক্রন্দন করতে।"*** কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রতি তা নাযিল করেছেন, যা তিনি আমাদের প্রতি করেননি, যেহেতু তাঁকে এই বাণী বহন করার গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়েছে, যা করার কারণে তিনি সে সময়ের মুশরিকদের শত্রুতার বোঝা কাঁধে নিয়েছেন, যারা তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে হত্যা করার, ঘর থেকে বের করে দেয়ার এবং ইসলামের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আর তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে আত্মিক শক্তি দান করার জন্য এমন কিছু বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁকে দিয়েছেন যা আমাদেরকে দেন নি যেন তিনি এই জীবনের বাস্তব রূপ উপলব্ধি করতে পারেন। অবশ্য এই হাদীসের মানে এই নয় যে আমাদেরকে সবসময় বিমর্ষ থাকতে হবে এবং ভুরু কুঁচকে হাঁটাচলা করতে হবে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও হাসতেন, এমনকি তিনি কখনও কৌতুকও করতেন। কিন্তু এটা তার অভ্যাস ছিল না। যেমন কিছু মানুষ আছে প্রতি কথার সাথেই হাসতে থাকে যা অত্যন্ত ক্ষতিকর, যারা প্রতিটি বিষয়েই কৌতুক বোধ করে, তাদের নিকট গোটা জীবনটাই একটা বিরাট কৌতুকে পরিণত হয়, ফলে জীবনের প্রতিনিয়ত পরীক্ষার ব্যাপারে যে সচেতনতা থাকা দরকার তা তারা হারিয়ে ফেলে।

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত ৬: " لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ "
অর্থ: "তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে।"
আমরা প্রত্যেকেই জাহান্নামের আগুন প্রত্যক্ষ করব, এই জীবনে নয়, মৃত্যুর পরের জীবনে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা মারইয়ামে উল্লেখ করছেন:
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا
"তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, যাকে এর (জাহান্নামের আগুনের) নিকটে আনা হবে না..." (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৭১)
বুখারী শরীফের হাদীসের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন *"কাউকে ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে না যতক্ষণ না তাকে জাহান্নামে তার স্থানটি দেখানো হয়, যেখানে তাকে নিক্ষেপ করা হত যদি সে অবিশ্বাস করত, যেন সে অধিকতর কৃতজ্ঞ হয়। তেমনি*

কাউকে ততক্ষণ জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে না, যতক্ষণ না তাকে জান্নাতের ঐ স্থানটি দেখানো হয়, যা সে বিশ্বাসী হলে লাভ করতে পারত, যেন সে অধিকতর শোকাচ্ছন্ন ও বিমর্ষ হয়।"

অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেন জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি সেতু স্থাপন করা হবে। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সেতুটি কি?' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: এটি পিচ্ছিল এবং এতে সাঁড়াশি রয়েছে। বিশ্বাসীদের মধ্যে একদল চোখের পলকে তা পার হয়ে যাবে। অন্যদল বিদ্যুত গতিতে পার হবে। কেউ ঝড়ো বাতাসের গতিতে। কেউ দ্রুতগামী অশ্বের গতিতে, কেউ উটের গতিতে। কেউ কোন ক্ষতি ছাড়াই এটা পার হবে। অন্যদের কিছু আঁচড় লাগবে। আর কেউ কেউ জাহান্নামে পড়ে যাবে। শেষ যে ব্যক্তি এই সেতু অতিক্রম করবে, সে এমনভাবে এটা পার হবে যেন তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এর নাম সীরাত।

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত ৭: " ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ "

অর্থ: "অতঃপর নিশ্চয়ই তোমরা একে (জাহান্নাম) স্বচক্ষে দেখবে।"

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে আমরা একে স্বচক্ষে দেখতে পারব, এ জীবনে আমরা একে দেখতে পাই নবীদের (আ) বর্ণনায় অংকিত চিত্রানুযায়ী। তাঁরা কিতাব ও ওহী অনুযায়ী জাহান্নামের বর্ণনা আমাদের সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে আমরা একে নিশ্চিতভাবে দেখব: ***"আইনুল ইয়াকীন"।*** রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যাখ্যা করেছেন, *মুমিনগণ যখন জাহান্নামের আগুন দেখবে, তারা তা দেখে উৎফুল্ল হবে, কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে এ থেকে বাঁচিয়েছেন, তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়বে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের এ দৃশ্য দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের কষ্ট বৃদ্ধি করা, এ দৃশ্য দেখে তারা চরম দুঃখ, ক্ষোভ (নিজেদের মূর্খতার কারণে), হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, একথা উপলব্ধি করে যে তাদেরকে এখানে থাকতে হবে চিরকাল!*

উপরে বলা হয়েছে (আরবি) এর অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। [আদ্ওয়াউল বায়ান] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, খবর কোনদিন চাক্ষুষ দেখার মত নয়। মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন তূর পর্বতে অবস্থান করছিলেন এবং তার অনুপস্থিতিতে তার সম্প্রদায় গোবৎসের পূজা করতে শুরু করেছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তূর পর্বতেই তাকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী-ইসরাঈলরা গোবৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম এর মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল; তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তাওরাতের তক্তিগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, ফলে সেগুলো ভেঙ্গে যায়। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২৭১]

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত ৮: " ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ "

অর্থ: "অতঃপর সেদিন তোমরা অবশ্যই (পার্থিব) আনন্দউপভোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই পৃথিবীতে আমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন, তা সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হব। কেননা যেমনটি আগে বর্ণনা করা হয়েছে, এই জীবনে আল্লাহ পাক আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তার সবই পরীক্ষা। আমাদের সম্পদ পরীক্ষার বিষয়, আমরা রিক্ত হস্তে পৃথিবীতে এসেছি এবং কপর্দকহীন অবস্থায় এখান থেকে বিদায় নেব। এই সম্পদ পৃথিবীতে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে আমানত হিসেবে। যদি আমরা একে আল্লাহর পছন্দনীয় পথে ব্যয় করি, তাহলে এর কল্যাণ আমাদের সাথে রয়ে যাবে, যদি আমরা একে অন্যায় পথে ব্যয় করি, তবে এর পাপ আমাদেরকে গ্রাস করতে আসবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন তিনটি জিনিস *"একজন মৃত ব্যক্তিকে কবর পর্যন্ত অনুসরণ করে, দুটি ফিরে আসে, একটি থেকে যায়। তার আত্মীয়, তার সম্পদ এবং তার আমল তাকে কবর পর্যন্ত অনুসরণ করে, তার আত্মীয় এবং সম্পদ ফিরে আসে, আর তার আমল তার সাথে থেকে যায়।"*

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন, দুটি নিয়ামত রয়েছে যা সম্পর্কে মানুষ প্রতারিত হয়, সুস্বাস্থ্য এবং অবসর। মানুষ এর দ্বারা প্রতারিত হয় এই ভেবে যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এ দুটি অনুগ্রহ আমাদের সাথে সর্বদা থাকবে। কিন্তু আমরা সহজেই এগুলো হারাতে পারি, এবং যখন আমরা দুর্বল কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ি, আমাদের অবসর সময় শেষ হয়ে আসে, তখন আমরা ইচ্ছা থাকলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত করতে পারি না, এবং তখন আমাদের আপসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন **"ফা ইযা ফারগতা, ফানসাব।"** ভাবার্থ: "যখন তুমি (নিয়মিত ইবাদতের) ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হও, অন্য ইবাদতে লেগে যাও।" (সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:৭)

আমাদের জীবন প্রকৃতপক্ষে ইবাদতের এক অবিরাম প্রক্রিয়া।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُکِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

"...নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার ত্যাগ, আমার জীবনুমরণ, জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।"(সূরা আল আনআম, ৬:১৬২)

আমাদের গোটা জীবনই আল্লাহর জন্য হতে হবে, এই পার্থিব জীবনে আমাদের কোন ছুটি নেই। সৎকর্ম থেকে কিংবা ইসলাম থেকে আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ছুটি নিতে পারব না। ইসলাম শ্বাস-প্রশ্বাস কিংবা খাদ্যগ্রহণের মতই এক অবিরাম প্রক্রিয়া, এ থেকে এক মুহূর্তও বিরত থাকার উপায় নেই, ইসলাম যেন আমাদের একটি অংশ। আমরা যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া একটি মুহূর্তও টিকতে পারি না, তেমনি একজন বান্দা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণের অবস্থা ছাড়া একটি মুহূর্ত থাকতে পারে না। যদি আমরা ইসলাম থেকে সাময়িক ছুটি নেই, তবে বুঝতে হবে আমার ইসলাম নিছক কিছু আচার অনুষ্ঠান, প্রকৃত ইসলাম নয়।

যেমন আমাদের সমাজে দেখা যায় **"রামাদান মুসলিম"** , যারা কেবল রামাদান মাসে নামায পড়ে, অন্যদের চেয়ে বেশী পরিমাণেই পড়ে, কিন্তু রামাদান শেষ হলে সে এগার মাসের জন্য ইসলাম থেকে ছুটি নেয়, সে মনে করে যে পরবর্তী রামাদানে সে তার সমস্ত ইবাদত পূর্ণ করে নেবে প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলাম নয়। আরও দেখা যায় **"জুম্মাবারের মুসলিম "**, যে কোন নামায পড়ে না, কেবল জুমআর নামাযে হাজির হয়, সপ্তাহের বাকী সময় সে ইসলাম থেকে ছুটি কাটায়। এধরনের লোকেরা ভীষণ ক্ষতি ও ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। এমন জুম্মার নামায আল্লাহর নিকট মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা যদি আমাদের জীবনে নিয়মিত সালাত প্রতিষ্ঠা না করি, তাহলে হঠাৎ করে একদিন কিংবা বছরে একটি মাস আমাদের

পক্ষে কিছুতেই একনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে সালাতকে আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশের মত প্রতিষ্ঠা করা চাই, এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে 'নামায পড়' এ আদেশ দেননি, তিনি আদেশ দিয়েছেন 'সালাত প্রতিষ্ঠা কর।' পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমাদের জীবনের মৌলিক কাঠামো।

তাই আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদেরকে এ কথাগুলো চিন্তা করতে হবে। কুরআনের ১০২ নং সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আহবান জানিয়েছেন আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করার। মুমিন হিসেবে আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত করা। আল্লাহ পাক বলেন:

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

"আমি জ্বিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করা ছাড়া আর কোন কারণে সৃষ্টি করিনি।"(সূরা আয যারিয়াত, ৫১:৫৬)

অর্থাৎ তোমরা সবাই কেয়ামতের দিন আল্লাহ্-প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। যে, সেগুলোর শোকর আদায় করেছ কি না, সেগুলোতে আল্লাহ্‌র হক আদায় করেছ কি না; নাকি পাপ কাজে ব্যয় করেছ? [সা'দী] এতে সকল প্রকার নেয়ামত এসে যায়। কুরআন ও হাদীসের অন্যত্র এরকম কিছু নেয়ামতের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে,

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿۳۶﴾

"আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।" [সূরা আল-ইসরা:৩৬]

এতে মানুষের শ্রবণশক্তি দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নেয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে। বিভিন্ন হাদীসেও নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে এসেছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ***"দু'টি নেয়ামত এমন আছে যাতে অধিকাংশ মানুষই ঠক খায়। তার একটি হলো, স্বাস্থ্য অপরটি হচ্ছে অবসর সময়।" [বুখারী: ৬৪১২]***

অন্য বর্ণনায় এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষুধায় কাতর হয়ে বের হলেন, পথে আবুবকর ও উমরও বের হলেন, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন বের হয়েছ? তারা বলল, ক্ষুধা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার নফস তার শপথ, আমিও সেকারণেই বের হয়েছি। তারপর তিনি বললেন, চল। তারা সবাই এক আনসারীর বাড়ীতে আগমন করলেন। আনসারী লোকটির স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সঙ্গিদ্বয়কে দেখে যার-পর-নাই খুশী হয়ে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানানোর মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অমুক কোথায়? স্ত্রী জানালো যে, সে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে গেছে। ইত্যবসরে আনসারী লোকটি এসে তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আজি কেউ আমার মত মেহমান পাবে না। তারা বসলে তিনি তাদের জন্য এক কাঁদি খেজুর নিয়ে আসলেন যাতে কাঁচা-পাকা, আধাপাকা, ভাল-মন্দ সবধরণের খেজুর ছিল। তারপর আনসারী লোকটি ছুরি নিয়ে দৌড়াল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সাবধান! দুধ দেয় এমন ছাগল যবাই করো না। আনসারী তাদের জন্য যবাই করলে তারা ছাগলের গোস্ত খেল, খেজুর গ্রহণ করল, পানি পান করল। তারপর যখন তৃপ্ত হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর ও উমরকে বললেন, "তোমরা কিয়ামতের দিন এ সমস্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদেরকে ক্ষুধা তোমাদের ঘর থেকে বের করল, তারপর তোমরা এমন নেয়ামত ভোগ করার পর ফিরে গেলে"। **[মুসলিম: ২০৩৮]**

অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ আয়াত নাযিল হলে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কোন নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? এটা তো শুধু (আসওয়াদান বা দুই কালো জিনিস) খেজুর ও পানি। রাসূল বললেন, "অবশ্যই তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" [তিরমিয়ী: ৫/৪৪৮, ইবনে মাজাহ:৪১৫৮, মুসনাদে আহমাদ: ৩/২৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন প্রথম যে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে তা হচ্ছে, আমি কি তোমাকে শারীরিকভাবে সুস্থ করিনি? আমি কি তোমাকে সুপেয় পানি পান করাইনি?" [তিরমিয়ী: ৩৩৫৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, আদম সন্তান! তোমাকে ঘোড়া ও উটে বহন করিয়েছি, তোমাকে স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তোমাকে ঘুরাফিরা ও নেতৃত্ব করার সুযোগ দিয়েছি, এগুলোর কৃতজ্ঞতা কোথায়?" [মুসলিম: ২৯৬৮, মুসনাদেআহমাদ; ২/৪৯২]

এই হাদীসগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিজ্ঞাসাবাদ কেবল কাফেরদের কে করা হবে না, সৎ মুমিনদেরকেও করা হবে। আর আল্লাহ্ মানুষকে যে নিয়ামতগুলো দান করেছেন সেগুলো সীমা সংখ্যাহীন। সেগুলো গণনা করা সম্ভব নয়। বরং এমন অনেক নিয়ামতও আছে যেগুলোর মানুষ কোন খবরই রাখে না। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামত গুলো গণনা করতে থাকো তাহলে সেগুলো পুরোপুরি গণনা করতেও পারবে না।" [সূরা ইবরাহীম: ৩৪] [আদ্‌ওয়াউল বায়ান, আত-তাফসীরুস সহীহ]

কুরআনের এই আয়াতে আমাদের জীবনের লক্ষ্য সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। তাই আমাদের এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। সেইসাথে আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ইবাদত এ কারণে নয় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আমাদের ইবাদতের কোন প্রয়োজন রয়েছে, বরং তাঁকে আমাদের ইবাদত করতে হবে শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদেই। আমাদের ইবাদত করতে হবে সেই অবস্থান অর্জনের জন্য, যে অবস্থানে উন্নীত হওয়ার জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জান্নাতে কেবল এই অবস্থানে উন্নীত ব্যক্তিরাই প্রবেশ করতে পারবে। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেছেন, লোকদেরকে জানিয়ে দাও, কেবল প্রকৃত বিশ্বাসীরাই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। তাই আসুন আমরা জীবন নিয়ে চিন্তা করি, জীবন নিয়ে আমাদের পরিতৃপ্তির অভাবের কারণ নিয়ে চিন্তা করি, এই অতৃপ্তির উৎস কোথায়? এর উৎস হচ্ছে জীবনের সঠিক লক্ষ্যের ওপর আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হওয়া। শয়তান আমাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে জীবনের বিভিন্ন আকর্ষণের ফাঁদে আটকে ফেলেছে, এগুলো হয়ত আমাদের পার্থিব জীবনকে কিছুটা আনন্দদায়ক করবে, কিন্তু এগুলো জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, আর এ অবস্থাতেই আমাদের স্ত্রী-সন্তানেরা পর্যন্ত আমাদের শত্রুতে পরিণত হয়, আমাদের অজান্তেই।

শিক্ষা:-

১: এমন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা, যে বিষয় সমূহ মানুষকে হিসাবের দিন কে ভুলিয়ে রাখে।

২:বেশি বেশি কবর জিয়ারত করা,জিয়ারত মানুষ কে সে দিনের কথা সরণ করিয়ে দেয় যে একদিন নিজের চির স্থায়ী ঠিকানা হবে এ কবর।
৩: জাহান্নাম থেকে রক্ষা চাওয়া, যেন এক সেকেন্ডের জন্য ও জাহান্নামের ধারে কাছে যেতে না হয়।
৪: আমার উপর অর্পিত নিয়ামত যেন আল্লাহর সরণে সপনে রক্ষনা বেক্ষন করতে পারি তার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া।
৫: সে সময়ের জন্য দোয়া করা যে সময় এ পৃথীতে বিচরন করবে আমাদের উত্তরসূরী,তারা যেন আমাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে আল্লাহ কবুল করে।
© আরিয়ান জোহান হিমু
প্রশিক্ষণ সম্পাদক
বাকলিয়া থানা উত্তর
চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর শাখা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির।

বই: ইসলামী আন্দোলন " সাফল্যের শর্তাবলী"

সাইয়েদ আবুল আলা মাওদুদী, অনুবাদক: আব্দুল মান্নান তালিব

প্রকাশকের কথা:

১. এই পৃথিবীর বুকে মানুষের কোন উদ্দেশ্য, আন্দোলন, সংস্কামূলক কোন পদক্ষেপ সফল হতে হলে সে আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে সে আন্দোলনের বিশেষ গুণগুলো দেখা যায়।

২. সমস্যা সঙ্কুল এই দুনিয়ায় ইসলামী সমাজ-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার উত্তম পথ নেই।

৩. এ আন্দোলন তার কর্মীদের কাছে আশা করে অধিক কর্মপ্রেরণা, ত্যাগ আর কুরবাণী। দাবী করে বিশেষ যোগ্যতা ও বৈশিষ্টের।

ভুমিকা:

*** সমস্যা:**

১. জাতির মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আকাঙ্খিত লোকের অভাব নেই। অভাব হলো আগ্রহ ও উদ্যোগের, তার চেয়ে বেশী অভাব যোগ্যতার।

২. জাতি সমগ্র প্রভাবশালী অংশ সমাজে বিকৃতি ও ভাঙ্গণ সৃষ্টিতে মুখর। আর যারা সমাজে বিকৃতি ও ভাঙ্গণের কাজে লিপ্ত নেই তারাও সৃষ্টি বিন্যাসের চিন্তামুক্ত।

৩. বর্তমান যুগে সমাজ জীবন পরিগঠন ও ভাঙ্গার বৃহত্তম শক্তি হচ্ছে সরকার।

*** সম্ভাবনা:**

১. জাতি সামগ্রিকভাবে অসৎপ্রবন নয়।

২. বিচক্ষনতার সাথে সুসংঘবদ্ধ প্রচেষ্ঠা চালালে জনমত একদিন সত্যের পথে আসবেই।

৩. বিকৃতির কাজে লিপ্ত বাতিলের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তির অভাব। এক- চারিত্রিক শক্তি, দুই- ঐক্যের শক্তি।

শিক্ষনীয়:

১. দ্বীনপ্রতিষ্ঠার কাজ আল্লাহর কাজ । এ জন্য শর্ত হল ধৈর্য্য, আন্তরিকতা এবং বুদ্ধি বিচক্ষনতা দিয়ে সামনে আগানো।

২. আল্লাহরপ্রদত্ত নীতির অনুসরন।

৩. সাময়িক আবেগ দিয়ে নয় সুস্থ মস্তিষ্কে, সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

বইটির মূল অংশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত:

১. ব্যক্তিগত গুণাবলী- ক. ইসলামের যথার্থ জ্ঞান। খ. ইসলামেরপ্রতি অবিচল বিশ্বাস। গ.চরিত্র ও কর্ম। ঘ. দ্বীন হচ্ছে জীবনোদ্দেশ্য।

২. দলীয় গুণাবলী- ক.ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা। খ.পারস্পরিক পরামর্শ। গ.সংগঠন ও শৃংখলা। ঘ.সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনা।

৩. পূর্ণতাদানকারী গুণাবলী- ক. খোদার সাথে সম্পর্ক ও আন্তরিকতা। খ.আখেরাতের চিন্তা। গ.চরিত্র মাধুর্য।
ঘ. ধৈর্য্য। ও ঙ. প্রজ্ঞা।

চরিত্র ও মাধুযের্র কতিপয় বিষয়াবলী:

১. উদার হৃদয় ও বিপুল হিম্মত।

২. সৃষ্টিরপ্রতি সহানুভুতিশীল ও মানবতার দরদী।

৩. ভদ্র ও কোমল স্বভাব সম্পন্ন।

৪. আত্মনিভর্রশীল ও কষ্টসহিষ্ণু।

৫. মিষ্টভাষী ও সদালাপী।

৬. তাদের দ্বারা কোন ক্ষতির আশংকা ও কেউ করবে না বরং তাদের থেকে কল্যান কামনা করবে।

৭. নিজেদেরপ্রাপ্যের চেয়ে কমের উপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং অপরকে বেশী দিতেপ্রস্তুত থাকবে।

৮. মন্দের জবাব ভাল দিয়ে দেবে।

৯. নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করবে এবং অন্যের গুণাবলীর কদর করবে।
১০. অন্যের দুর্বলতারপ্রতি নজর না দেয়ার মতো বিরাট হৃদয়পটের অধিকারী হবে।
১১. অন্যের দোষ-ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি মাফ করে দেবে এবং নিজের জন্য কারোর উপরপ্রতিশোধ নেবে না।
১২. অন্যের সেবা গ্রহন করে নয় ,অন্যকে সেবা করে আনন্দিত হবে।
১৩. নিজের স্বার্থে নয় , অন্যের ভালোর জন্য কাজ করবে।
১৪. কোনপ্রশংসার অপেক্ষা না করে , কোন নিন্দার তোয়াক্কা না করে নিজের দায়িত্ব পালন করবে।
১৫. খোদা ছাড়া আর কারোর পুরষ্কারেরপ্রতি দৃষ্টি দেবে না।
১৬. তাদেরকে বলপ্রয়োগে দমন করা যাবে না।
১৭. ধন-সম্পদের বিনিময়ে ক্রয় করা যাবে না কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের সামনে নির্দ্বিধায় ঝুকে পড়বে।
১৮. তাদের ভদ্রতা ও ন্যায়নীতির ব্যাপারে শত্রুদের ও আস্থা থাকবে।

ধৈর্য্যের কতিপয় বিষয়াবলী:

১. তাড়াহুড়ো না করা , নিজেরপ্রচেষ্টার ত্বরিত ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত না হারানো।
২. তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া।
৩. বাধা বিপত্তির বীরোচিত মোকাবেলা করা।

প্রজ্ঞার কতিপয় বিষয়াবলী:

১. গভীর দৃষ্টি।
২. চিন্তাশক্তি।
৩. বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিরপ্রয়োজন।
৪. পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।
৫. বিচার বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা রাখে এবং জীবন সমস্যা বুঝার ও সমাধানের যোগ্যতা রাখে।

এসব গুণকেই এক কথায় বলা হয় প্রজ্ঞা।
৪. মৌলিক ও অসৎ গুণাবলী: ক. গর্ব ও অহঙ্কার। খ.প্রদর্শনেচ্ছা গ. ত্রুটিপূর্ণ নিয়ত।
গর্ব ও অহঙ্কার থেকে বাঁচার উপায়:

১. বন্দেগীর অনুভূতি। ২. আত্মবিচার । ৩. মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি। ৪. দলগত প্রচেষ্টা।

প্রদর্শনেচ্ছা থেকে বাঁচার উপায়: ১. ব্যক্তিগতপ্রচেষ্টা। ২. সামষ্টিকপ্রচেষ্টা।
৫. মানবিক দুর্বলতা- ক) আত্মপুজা। খ) আত্মপ্রীতি।
বাঁচার উপায় : তওবা ও এস্তেগফার।
গ) হিংসা বিদ্বেষ । ঘ) কু-ধারণা। ঙ) গীবত। চ) চোগলখোরী। ছ) কানাকানি ও ফিসফিসানী। জ) মেজাজের ভারসাম্যহীনতা। ঝ) একগুয়েমী। ঞ) একদেশদর্শীতা। ট) সামষ্টিক ভারসাম্যহীনতা। ঠ) সংকীর্ণমনতা।

মুখস্থঃ তাওহিদ সংক্রান্ত আয়াত-
আয়াতুল কুরসি (পৃষ্ঠা-৩)
সূরা হাশরের শেষ রুকু (পৃষ্ঠা-১৭),
তাওহিদ সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত (পৃষ্ঠা-৮),
মাসয়ালা: নামাজ সংক্রান্তঃ পৃষ্ঠা-০৮

অনুশীলনী- ০৪ঃ ফেব্রুয়ারী-৩য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা যিলযাল,
মোট আয়াতঃ ৮

১. যখন প্রবল কম্পনে যমীন প্রকম্পিত করা হবে	إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
২, আর যমীন তার ভার বের করে দেবে,	وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
৩. আর মানুষ বলবে, এর কী হল?	وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا
৪. সেদিন যমীন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে,	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
৫. কারণ আপনার রব তাকে নির্দেশ দিয়েছেন,	بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
৬. সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখান যায়,	۬ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ
৭.তারপর যে অতি অল্প পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখে নেবে	فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
৮. এবং যে অতি অল্প পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে তা দেখে নেবে	وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

নামকরনঃ সুরার প্রথম আয়াতের زِلْزَالَهَ থেকে এর নামকরন করা হয়েছে। 'যালযালাহু' মানে হচ্ছে, প্রচণ্ডভাবে জোরে জোরে ঝাড়া দেয়া, ভূকম্পিত হওয়া।

নাযিলের সময়কালঃ মদীনায় অবতীর্ণ(মতভেদ)
এই সূরার মাক্কী ও মাদানী হওয়ার ব্যাপারে উলামাগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর কেউ বলেন, এটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরার ফযীলতে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটিও সহীহ নয়।
এটি একটি মক্কী সূরা। এর বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনাভংগী থেকে অনুভূত হবে, এটি মক্কায় প্রাথমিক যুগে এমন সময় নাযিল হয় যখন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে ইসলামের বুনিয়াদি আকিদা ্ বিশ্বাস মানুষের সামনে পেশ করা হচ্ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য
এর বিষয়বস্তু মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং সেখানে দুনিয়ায় করা সমস্ত কাজের হিসেব মানুষের সামনে এসে যাওয়া ।
সর্বপ্রথম তিনটি ছোট ছোট বাক্যে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর মানুষের দ্বিতীয় জীবনের সূত্রপাত কিভাবে হবে এবং মানুষের জন্য তা হবে কেমন বিস্ময়কর।
তারপর দু'টি বাক্যে বলা হয়েছে , মানুষ এই পৃথিবীর বুকে অবস্থান করে নিশ্চিন্তে সব রকমের কাজ করে গেছে । সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি যে , এই নিষ্প্রান জিনিস কোনদিন তার কাজকর্মের পক্ষে ্ বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহর হুকুমে সেদিন সে কথা বলতে থাকবে। প্রত্যেকটি লোকের ব্যাপারে সে বলবে , কোন সময় কোথায় সে কি কাজ করেছিল । তারপর বলা হয়েছে , সেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষের নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে দলে দলে আসতে থাকবে । তাদের কর্মকাণ্ড তাদেরকে দেখানো হবে। এমন পূর্ণাংগ ও বিস্তারিতভাবে এই কর্মকাণ্ড পেশ করা হবে যে , সামান্য বালুকণা পরিমাণ নেকী বা পাপও সামনে এসে যাবে।

আয়াতের ব্যাখ্যাঃ
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
১. যখন প্রবল কম্পনে যমীন প্রকম্পিত করা হবে। 'যালযালাহু' মানে হচ্ছে, প্রচণ্ডভাবে জোরে জোরে ঝাড়া দেয়া, ভূকম্পিত হওয়া।

অর্থাৎ, এর অর্থ হল ভূমিকম্পের কারণে সারা পৃথিবী কেঁপে উঠবে। আর সমস্ত বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এই অবস্থা তখন হবে, যখন শিঙ্গায় প্রথমবার ফুৎকার করা হবে। অর্থাৎ حرَّكت الأرض من أصلها পুরা পৃথিবী জড়শুদ্ধ প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠবে (কুরতুবী)।
আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ- يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ-

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর বিষয়'। 'যেদিন তোমরা তা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবে। যেদিন প্রত্যেক স্তন্যদায়িনী মা তার দুগ্ধপানকারী সন্তান থেকে উদাসীন হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভ খালাস করে ফেলবে। আর মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল সদৃশ। যদিও সে মাতাল নয়। বৃত্তঃ আল্লাহর শাস্তি অতীব কঠিন' (হজ্জ ২২/১-২)।
এটি ইস্রাফীলের শিঙ্গায় ফুঁকদানের পরের ঘটনা। যেমন আল্লাহ বলেন " يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ" *'যেদিন কম্পিত করবে কম্পিতকারী'। 'যার পিছে পিছে আসবে আরেকটি নিনাদ'* **(নাযে'আত ৭৯/৬-৭)।**

প্রথম নিনাদকে نفخة صعق 'কম্পনের নিনাদ' এবং দ্বিতীয় নিনাদকে نفخة بعث বা 'পুনরুত্থানের নিনাদ' বলা হয়। প্রথম নিনাদে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে নতুন পৃথিবী হবে। অতঃপর দ্বিতীয় নিনাদের পরেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। তাতে মৃতরা সব জীবিত হয়ে উঠে

যাবে। দুই নিনাদের মাঝে সময়ের ব্যবধান হবে চল্লিশ। সেটি দিন, মাস না বছর, সে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলতে অস্বীকার করেন'।বুখারী হা/৪৯৩৫, মুসলিম হা/২৯৫৫, মিশকাত হা/৫৫২১ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, 'শিঙ্গায় ফুঁক দান' অনুচ্ছেদ; ফাৎহুল বারী হাদিস/৬৫১৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী আয়াতের বক্তব্যের আলোকে অত্র আয়াতের অর্থ দ্বিতীয় কম্পনের বলে অনুমিত হয়।

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

২, আর যমীন তার ভার বের করে দেবে,

মাটির নিচে যত লোক দাফন আছে, তাদেরকে পৃথিবীর ভার বা বোঝা বলা হয়েছে। মাটি তাদেরকে কিয়ামতের দিন বের করে উপরে ফেলবে। অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুমে সকলে জীবিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। আর এরূপ হবে শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকারের পর। অনুরূপভাবে যাবতীয় খনিজ পদার্থ ও গুপ্ত ধনসমূহও বাহির হয়ে পড়বে।

(১) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

এক. মরা মানুষ মাটির বুকে যেখানে যে অবস্থায় যে আকৃতিতে আছে দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পরে তাদের সবাইকে বের করে এনে সে বাইরে ফেলে দেবে এবং যাবতীয় মৃতকে বের করে হাশরের মাঠের দিকে চালিত করবে। মানুষের শরীরের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলো এক জায়গায় জমা হয়ে নতুন করে আবার সেই একই আকৃতি সহকারে জীবিত হয়ে উঠবে যেমন সে তার প্রথম জীবনের অবস্থায় ছিল। এই

বিষয়টি অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে, يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴿١﴾ *"হে মানুষ! তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার!" [সূরা আল-হাজ্জ: ১]*

আরও এসেছে, وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ﴿٣﴾ وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ ۙ﴿٤﴾

"আর পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে।" [সূরা আল-ইনশিকাক: ৩-৪]

দুই. এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, কেবলমাত্র মরা মানুষদেরকে সে বাইরে নিক্ষেপ করে ক্ষান্ত হবে না বরং তাদের প্রথম জীবনের সমস্ত কথা ও কাজ এবং যাবতীয় আচার-আচরণের রেকর্ড ও সাক্ষ্য-প্রমাণের যে স্তূপ তার গর্ভে চাপা পড়ে আছে সেগুলোকেও বের করে বাইরে ফেলে দেবে।

পরবর্তী বাক্যটিতে একথারই প্রকাশ ঘটেছে। তাতে বলা হয়েছে, যমীন তার ওপর যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করবে।

তিন. কোন কোন মুফাসসির এর তৃতীয় একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে, সোনা, রূপা, হীরা, মণি-মাণিক্য এবং অন্যান্য যেসব মূল্যবান সম্পদ ভূ-গর্ভে সঞ্চিত রয়েছে সেগুলোর বিশাল বিশাল স্তূপও সেদিন যমীন উগলে দেবে। [দেখুন: আদওয়াউল বায়ান]

আর যদি দুনিয়ার জীবনের শেষভাগে কিয়ামতের আলামত হিসেবে এ সম্পদ বের করা বোঝায় তবে এতদসংক্রান্ত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালাকার স্বর্ণ খণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধনসম্পদের জন্যে কাউকে হত্যা করেছিল, সে তা দেখে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এতবড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যেই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না। [মুসলিম:

আল্লাহ বলেন, ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ

'অতঃপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তখন সবাই উঠে দাঁড়িয়ে যাবে ও দেখতে থাকবে (যুমার ৩৯/৬৮)।

আল্লাহ বলেন, ' يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

† যদিন মানুষ বিশ্বপালকের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে' (মুত্বাফফেফীন ৮৩/৬)।

আল্লাহ আরও বলেন, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ

' ‡ যদিন পৃথিবী প্রসারিত হবে'। 'এবং তার ভিতরকার সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে যাবে' (ইনশিক্বাক্ব ৮৪/৩-৪)।

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا

৩. আর মানুষ বলবে, এর কী হল?

(১) মানুষ অর্থ প্রত্যেকটি মানুষ হতে পারে। কারণ পুনরায় জীবন লাভ করে চেতনা ফিরে পাবার সাথে সাথেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া এটিই হবে যে, এসব কি হচ্ছে? এটা যে হাশরের দিন একথা সে পরে বুঝতে পারবে। আবার মানুষ অর্থ আখেরাত অস্বীকারকারী মানুষও হতে পারে। কারণ যে বিষয়কে অসম্ভব মনে করতো তা তার সামনে ঘটে যেতে থাকবে এবং সে এসব দেখে অবাক ও পেরেশান হবে। তবে ঈমানদারদের মনে এ ধরনের বিস্ময় ও পেরেশানি থাকবে না। কারণ তখন তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও প্রত্যয় অনুযায়ীই সবকিছু হতে থাকবে।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে সে সময় আখেরাত অস্বীকারকারীরা বলবে, "কে আমাদের শয়নাগার থেকে আমাদের উঠালো?" এর জবাব আসবে, "এটি সেই জিনিস যার ওয়াদা করুণাময় করেছিলেন এবং আল্লাহর পাঠানো রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন।" [সূরা ইয়াসিন: ৫২] [আদওয়াউল বায়ান]

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

৪. সেদিন যমীন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে,

(১) যমীন কি জানিয়ে দেবে এ নিয়ে তাফসীরবিদদের মধ্যে কয়েকটি মত রয়েছে। সম্ভবত সব কয়টি মতই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে।

এক. ইয়াহইয়া ইবনে সালাম বলেন, এর অর্থ, যমীন তার থেকে যা যা বের করে দিল (সম্পদরাজি) তা জানিয়ে দিবে। এর সমর্থনে একটি হাদীসে এসেছে, "কোন মানুষের জীবন যদি কোন সুনির্দিষ্ট স্থানে অবসান হওয়ার কথা থাকে তখন আল্লাহ তার জন্য সেখানে যাওয়ার একটি প্রয়োজন তৈরী করে দেন। তারপর যখন সে স্থানে পৌঁছে তখন তাকে মৃত্যু দেয়া হয়। তারপর যমীন কিয়ামতের দিন বলবে, হে রব! এটা তুমি আমার কাছে আমানত রেখেছিলে।" [ইবনে মাজাহ: ৪২৬৩]

দুই. ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ আয়াতের অর্থ, আগের আয়াতে যে বলা হয়েছে মানুষ প্রশ্ন করবে, যমীনের কি হল? এর জওয়াব যমীনই দিবে যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

তিন. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এর অর্থ, যমীন তার মধ্যে কৃত ভাল-মন্দ যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব দাখিল করবে। যমীনের ওপর যা কিছু ঘটে গেছে তার সবকিছু সে কিয়ামতের দিন বলে দেবে। [কুরতুবী]

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا

৫. কারণ আপনার রব তাকে নির্দেশ দিয়েছেন,

কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন।

অর্থাৎ, মাটিকে কথা বলার শক্তি আল্লাহই সেদিন দান করবেন। অতএব এটা কোন আশ্চর্যজনক কথা নয়। যেমন সেদিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ বাকশক্তি দান করবেন, ঠিক মাটিও আল্লাহর হুকুমে কথা বলবে। (জড়পদার্থের কথা বা শব্দ ধরে রাখা এবং প্রয়োজনে তা শুনিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তো বিজ্ঞানও প্রমাণ করে ‡ ছ। অতএব সৃষ্টিকর্তার আদেশে মাটির কথা বলার ব্যাপারটা কোন আশ্চর্যের নয়।

† যদিন আল্লাহর শত্রুদের জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে, সেদিন তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বিভিন্ন দলে'। 'অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে, তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে'। 'জাহান্নামীরা তখন তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দান করেছেন' (হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/১৯-২১)।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ,

'আজ আমরা তাদের মুখে মোহর মেরে দেব এবং আমাদের সাথে কথা বলবে তাদের হাত ও তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে তাদের পা' (ইয়াসীন ৩৬/৬৫)।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۞

৬. সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখান যায়,

এর অর্থ, মানুষ সেদিন হাশরের মাঠ থেকে তাদের আমল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে; তাদের কেউ জান্নাতে যাবে, কেউ যাবে জাহান্নামে। [জালালাইন, মুয়াস্‌সার, সাদী]

এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, বিগত হাজার হাজার বছরে সমস্ত মানুষ যে যেখানে মরেছিল সেখান থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে থেকে দলে দলে চলে আসতে থাকবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, "যে দিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তোমরা দলে দলে এসে যাবে। [সূরা আন-নাবা: ১৮] [ফাতহুল কাদীর]

অর্থাৎ তাদের আমল তাদেরকে দেখানো হবে। প্রত্যেকে দুনিয়ায় কি কাজ করে এসেছে তা তাকে বলা হবে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কাফের মুমিন, সৎকর্মশীল ও ফাসেক, আল্লাহর হুকুমের অনুগত ও নাফরমান সবাইকে অবশ্যি তাদের আমলনামা দেয়া হবে।

অর্থাৎ সেদিন মানুষ তাদের কবর হ'তে হিসাবস্থলের দিকে দলে দলে সমবেত হবে। অতঃপর হিসাব শেষে সেখান থেকে কেউ জান্নাতীদের ডান সারিতে কেউ জাহান্নামীদের বাম সারিতে প্রকাশ পাবে (ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭-৯; বালাদ ৯০/১৭-১৯)।

يَصْدُرُ শব্দের অর্থ হল, বের হবে, ফিরে যাবে। অর্থাৎ, কবর থেকে বের হয়ে হিসাবের ময়দানের দিকে অথবা হিসাব শেষে জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে ফিরে যাবে। أَشْتَاتًا শব্দের অর্থ হল, ভিন্ন ভিন্ন; অর্থাৎ, দলে দলে। কিছু লোক ভয়শূন্য হবে, কিছু ভয়ে ভীত হবে। কিছু লোকের রঙ গৌরবর্ণের হবে; যেমন জান্নাতীদের হবে। আবার কিছু লোকের রঙ কাল বর্ণের হবে; যা তাদের জাহান্নামী হওয়ার নিদর্শন হবে। কিছু লোক ডান দিকের অভিমুখী হবে। আবার অনেকে বাম দিকের অভিমুখী হবে। অথবা এই বিভিন্নতা ধর্ম, মযহাব ও আমল এবং কর্ম অনুপাতে হবে।

এটি يَصدُرُ ক্রিয়ার সাথে সম্বদ্ধ। অথবা এর সম্বন্ধ أَوحَى لَهَا -এর সাথে। অর্থাৎ, মাটি (সেদিন) নিজের বৃত্তান্ত এ জন্য বর্ণনা করবে; যাতে মানুষকে নিজ আমল দেখানো হয়।

এভাবে মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন

' يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا- وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ,

† সদিন আমরা দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব। 'এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেব' (মারিয়াম ১৯/৮৫-৮৬)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ، فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُحْبَرُوْنَ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ-

' ‡ য দিন ক্বিয়ামত সংঘঠিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে'। 'অতঃপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে'। 'পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী হয়েছে এবং আমার আয়াত সমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে, তাদেরকে আযাবের মধ্যে হাযির করা হবে' (রূম ৩০/১৪-১৬)।

****

† সদিনটিতে তোমাদেরকে পেশ করা হবে। †তামাদের কোন গোপনীয় বিষয়ই আর সেদিন গোপন থাকবে না।

† স সময় যাকে তার আমলনামা ডান হতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো।

আমি জানতাম, আমাকে হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।

তাই সে মনের মত আরাম আয়েশের মধ্যে থাকবে।

উন্নত মর্যাদার জান্নাতে।

যার ফলের গুচ্ছসমূহ নাগালের সীমায় অবনমিত হয়ে থাকবে

(এসব লোকদের কে বলা হবেঃ) অতীত দিনগুলোতে তোমরা যা করে এসেছো তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান করো।

আর যার আমলনামা তার বাঁ হাতে দেয়া হবে সে বলবেঃ হায়! আমার আমলনামা যদি আমাকে আদৌ দেয়া না হতো

এবং আমার হিসেব যদি আমি আদৌ না জানতাম তাহলে কতই না ভাল হত।

হায়! আমার সেই মৃত্যুই (যা দুনিয়াতে এসেছিলো) যদি চূড়ান্ত হতো।

আজ আমার অর্থ-সম্পদ কোন কাজে আসলো না।

) আমার সব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে।

(আদেশ দেয়া হবে) পাকড়াও করো ওকে আর ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও।

তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।

এবং সত্তর হাত লম্বা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলো।

† স মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করতো না

এবং দুস্থ মানুষের খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না।

তাই আজকে এখানে তার সমব্যথী কোন বন্ধু নেই।

আর কোন খাদ্যও নেই ক্ষত নিসৃত পূঁজ-রক্ত ছাড়া।

যা পাপীরা ছাড়া আর কেউ খাবে না। (সূরা হাক্কাহ ১৮-৩৭)

ইরশাদ হয়েছে–

† হ মানুষ ! তুমি কঠোর পরিশ্রম করতে করতে তোমার রবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, পরে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে।

তারপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হয়েছে ,

তার কাছ থেকে হালকা হিসেব নেয়া হবে

এবং সে হাসিমুখে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে যাবে।

আর যার আমলনামা তার পিছন দিক দেয়া হবে।

† স মৃত্যুকে ডাকবে

এবং জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়বে।

† স নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে ডুবে ছিল।

† স মনে করেছিল , তাকে কখনো ফিরতে হবে না।

না ফিরে সে পারতো কেমন করে ? তার রব তার কার্যকলাপ দেখছিলেন। ইনশিকাক(৬-১৫)

অপরাধীদেরকে ঘিরে আনা হবে

কিয়ামতের দিন শরীর প্রকম্পিত হওয়ার মতো অবস্থা দেখে মানুষ ভয়ে এমনই দিশেহারা হয়ে পড়বে যে, তারা কিছুতেই স্মরণ করতে পারবে না পৃথিবীতে জীবিত থাকা কালে তারা কত দিন জীবিত ছিল। পরকালের সূচনা এবং তার দীর্ঘতা দেখে পৃথিবীর শত বছরের হায়াতকে তারা মনে করবে বোধ হয় এই ঘন্টাখানেক পৃথিবীতে ছিলাম। ইসলামী বিধান যারা মানেনি তারা সেদিন পৃথিবীতে কত হায়াত পেয়েছিল তা ভুলে যাবে। এ ভুলে যাওয়া কোন স্বাভাবিকভাবে ভুলে যাওয়া নয় বরং ভয়ে আতঙ্কে ভুলে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন-

অপরাধীদেরকে এমনভাবে ঘিরে আনবো যে তাদের চক্ষু আতংকে বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। তারা পরস্পর ফিসফিস করে বলাবলি করবে, আমরা পৃথিবীতে বড় জোর দশদিন মাত্র সময় কাটিয়েছি। (সূরা ত্ব-হা-১০২)

মহান আল্লাহ সেদিন মানুষকে প্রশ্ন করবেন-

† তামরা পৃথিবীতে কতদিন ছিলে? উত্তরে তারা বলবে একদিন বা তার চেয়ে কম সময় আমরা পৃথিবীতে ছিলাম। (সূরা মুমিনুন-১১২-১১৩)

আল্লাহর কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে-

যখন সে সময়টি এসে পড়বে, তখন অপরাধীগণ শপথ করে বলবে যে পৃথিবীতে আমরা এক ঘন্টার বেশি ছিলাম না। (সূরা রূম-৫৫)

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾

৭) তারপর যে অতি অল্প পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখে নেবে

﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

৮) এবং যে অতি অল্প পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে তা দেখে নেবে।

ذَرَّةٍ অর্থ বিন্দু, সরিষাদানা, ছোট্ট পিপীলিকা। এর দ্বারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছোট্ট বস্তুর উপমা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পাপ বা পূণ্য যত ছোটই হৌক না কেন ক্বিয়ামতে বিচারের দিন তা দেখা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ এক অণু পরিমান যুলুম করবেন না। যদি কেউ অণু পরিমান সৎকর্ম করে, তবে তিনি তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেন এবং আল্লাহ তার পক্ষ হ'তে মহা পুরস্কার দান করে থাকেন' (নিসা ৪/৪০)।

† সদিন সব আমল ওযন করা হবে। যার ওযন ভারী হবে, সে জান্নাতী হবে। আর যার ওযন হালকা হবে, সে জাহান্নামী হবে' (ক্বারে'আহ ১০১/৬-৯)।

ঐ ওযন কিভাবে করা হবে, সেটি গায়েবী বিষয়। যা কেবল আল্লাহ জানেন।

প্রত্যেকটি সামান্যতম ও নগণ্যতম সৎকাজেরও একটি ওজন ও মূল্য রয়েছে এবং অনুরূপ অবস্থা অসৎকাজেরও। অসৎকাজ যত ছোটই হোক না কেন অবশ্যি তার হিসেব হবে এবং তা কোনক্রমেই উপেক্ষা করার মতো নয়। তাই কোন ছোট সৎকাজকে ছোট মনে করে ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ এই ধরনের অনেক সৎকাজ মিলে আল্লাহর কাছে একটি অনেক বড় সৎকাজ গণ্য হতে পারে। অনুরূপভাবে কোন ছোট ও নগণ্য অসৎকাজও না করা উচিত; কারণ এই ধরনের অনেকগুলো ছোট গোনাহ একত্র হয়ে একটি বিরাট গোনাহের স্তুপ জমে উঠতে পারে। [দেখুন: কুরতুবী, সা'দী]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো-তা এক টুকরা খেজুর দান করার বা একটি ভালো কথা বলার বিনিময়েই হোক না কেন" [বুখারী: ৬৫৪০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেনঃ "কোন সৎকাজকেও সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, যদিও তা কোন পানি পানেচ্ছু ব্যক্তির পাত্রে এক মগ পানি ঢেলে দেয়াই হয় অথবা তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাই হয়।" [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৬৩]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে মুসলিম মেয়েরা! কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে কোন জিনিস পাঠানোকে সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, তা ছাগলের পায়ের একটি খুর হলেও।" [বুখারী: ৬০১৭, মুসলিম: ১০৩০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন, "হে আয়েশা! যেসব গোনাহকে ছোট মনে করা হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকো। কারণ আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৭০, ৫/১৩৩, ইবনে মাজাহ: ৪২৪৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ "সাবধান, ছোট গোনাহসমূহ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ সেগুলো সব মানুষের ওপর একত্র হয়ে তাকে ধ্বংস করে দেবে।" [মুসনাদে আহমাদ: ১/৪০২] [ইবন কাসীর]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছের শেষ দিকে অত্র আয়াতটি (যিলযাল ৭-৮) সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ 'এটি অনন্য ও সারগর্ভ আয়াত'। বুখারী হা/৪৯৬২; মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩ 'যাকাত' অধ্যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) অত্র আয়াতটিকে أحكم آية فى القرآن 'কুরআনের সবচেয়ে বড় বিধান দানকারী আয়াত' বলে অভিহিত করেছেন এবং সকল বিদ্বান এ বিষয়ে একমত' (কুরতুবী)।

জাহান্নাম থেকে বাঁচুন :

(১) হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ 'তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো একটা খেজুরের টুকরা দিয়ে হ'লেও কিংবা একটু মিষ্ট কথা দিয়ে হ'লেও'। বুখারী হা/৮৪১৭' যাকাত' অধ্যায়;

(২) আবু যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ 'সামান্য নেকীর কাজকেও তুমি ছোট মনে করো না। এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে হ'লেও'।মুসলিম হা/২৬২৬, তিরমিযী হা/১৮৩৩,

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ 'হে মুমিন নারীগণ! তোমরা প্রতিবেশীকে বকরীর পায়ের দুই ক্ষুরের মধ্যেকার সামান্য গোশত দিয়ে সাহায্য করাকেও তুচ্ছ মনে করো না'। বুখারী হা/২৫৬৬; মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৯২।

উম্মে বুজাইদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ 'পোড়ানো ক্ষুর হ'লেও সায়েলকে দাও'।আহমাদ হা/১৬৬৯৯; নাসাঈ হা/২৫৬৫;

(৪) আদী বিন হাতেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يَّسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ একটা খেজুরের টুকরা দিয়েও নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখে, তবে সে যেন তা ক ‡ র'। মুসলিম হা/১০১৬ 'যাকাত' অধ্যায়, ২০ অনুচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً 'হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ হ'তেও বেঁচে থাকো। কেননা উক্ত বিষয়েও আল্লাহর পক্ষ হ'তে কৈফিয়ত তলব করা হবে'। নাসাঈ, ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩,

(৫) হযরত জাবের ও হুযায়ফা (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ 'প্রত্যেক নেকীর কাজই ছাদাক্বা'।বুখারী হা/৬০২১, মুসলিম হা/১০০৫,

কাফিরের সৎকর্ম :

প্রশ্ন হ'ল, ক্বিয়ামতের দিন কাফিররা তাদের সৎকর্মের পুরস্কার পাবে কি?

এর জবাব এই যে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে বা তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে, তারা আখেরাতে কিভাবে পুরস্কার পেতে পারে? আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُوْرٍ-

'যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের সেখানে মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবেনা যে তারা মরবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও হালকা করা হবেনা। এভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি' (ফাত্বির ৩৫/৩৬)। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ- قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ-

‘জাহান্নামের অধিবাসীরা তাদের প্রহরীদের বলবে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বল, তিনি যেন একদিনের জন্য আমাদের শাস্তি হালকা করেন’। জবাবে ‘তারা বলবে, তোমাদের নিকটে কি নিদর্শনাবলীসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি? জাহান্নামীরা বলবে, নিশ্চয়ই এসেছিল। প্রহরীরা বলবে, তাহ’লে তোমরাই প্রার্থনা কর। আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়ে থাকে’ (গাফের/মুমিন ৪০/৪৯-৫০)।

বস্তুতঃ কাফিরদের সৎকর্মের পুরস্কার আল্লাহ দুনিয়াতেই দিবেন তাদের নাম-যশ বৃদ্ধি, সুখ-সমৃদ্ধি, সন্তানাদি ও রূযী বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু আখেরাতে তারা কিছুই পাবে না। যেমন তিনি বলেন

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ,

‘ ‡ য ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, তার জন্য আমরা তার ফসল বর্ধিত করে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সেখান থেকে কিছু দেই। তবে তার জন্য আখেরাতে কিছুই থাকবে না’ (শূরা ৪২/২০)।

আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا

‘আর আমরা তাদের কৃতকর্মগুলোর দিকে অগ্রসর হব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব’ (ফুরক্বান ২৫/২৩)।

কেননা কুফরী তাদের সকল সৎকর্মকে বিনষ্ট করে দিবে এবং তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি ক্বিয়ামতের দিন তাদের আমল ওযন করার জন্য দাড়িপাল্লাও খাড়া করা হবেনা। যেমন আল্লাহ বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ‘(ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারী হ’ল তারাই) যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অবিশ্বাস করে, তাদের সমস্ত আমল নিস্ফল হ ‡ য় যায়। অতএব ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাদের জন্য দাড়িপাল্লা খাড়া করব না’ (কাহফ ১৮/১০৫)। কেননা তা নেকী হ’তে খালি থাকবে।

তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। তবে তাদের পাপের তারতম্য অনুযায়ী শাস্তির তারতম্য হ’তে পারে। যেমন আবু ত্বালিবের শাস্তি সবচেয়ে কম হবে। তাকে আগুনের জুতা ও ফিতা পরানো হবে। তাতেই তার মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটবে। তবে এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ। যেমন তিনি বলেন, ‘আমি তাকে আগুনে ডুবন্ত পেয়েছিলাম। অতঃপর (সুফারিশের মাধ্যমে) আমি তাকে হালকা আগুনে উঠিয়ে আনি। অর্থাৎ টাখনু পর্যন্ত আগুনে পুড়বে’। তিনি বলেন, ‘যদি আমি না হ’তাম, তাহ’লে তিনি থাকতেন জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে’। বুখারী হা/৫১৭; মুসলিম হা/৩৬১, ৩৫৮; মিশকাত হা/৫৬৬৮ ‘জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ।শাস্তির এই তারতম্য আখেরাতে সকল কাফিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি-না, সেটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর এখতিয়ারে। তবে এটা নিশ্চিত যে, কাফেররা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ- خَالِدِينَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ-

‘নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের উপর আল্লাহর লা‘নত এবং ফেরেশতামন্ডলী ও সকল মানুষের লা‘নত’। ‘সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তাদের শাস্তি হালকা করা হবেনা এবং তাদের কোনরূপ অবকাশ দেওয়া হবেনা’ (বাক্বারাহ ২/১৬১-৬২)।

সংগৃহিতঃ

তাফসীরে যাকারিয়া, আহসানুল বয়ান ও তাফহীমুল কুর’আন থেকে নেয়া।

https://sistersforuminislam.com/articles/tafsir/%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AF%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2/

বই: তাফহিমুল কুরআনের ভূমিকাঃ

বই নোট : তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা
লেখক : সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.)
নোটপ্রস্তুতকারী : তাজুল ইসলাম তাইমী’

তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা মূলত কুরআনের ভূমিকা নয় বরং এইটা হচ্ছে তাফসির- তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা, যেটাকে লেখক রাহিমাহুল্লাহ ১৪ট পয়েন্টে আলোচনা করেছেন ।

(ঘ ঃব চ রহঃ)

১। তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা..... চধমবঃ ০২
কুরআন পাঠকের সংকট..... চধমবঃ ০২
২। সংকট উত্তরণের উপায়.....ঢ়ধমবঃ ০৭
৩। কুরআনের মুল আলোচ্য.....ঢ়ধমবঃ ০৮
৪। ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্ব.....ঢ়ধমবঃ ০৯
৫। ইসলামী দাওয়াতের দ্বিতীয় অধ্যায়.....চধমবঃ ০৯
৬। ইসলামী দাওয়াতের তৃতীয় অধ্যায়.....চধমবঃ ০৯
৭। কুরআনের বণর্নাভংগী.....চধমবঃ ১০
৮। এহেন বিন্যাসের কারণ.....চধমবঃ ১১
৯। কুরআন কিভাবে সংকলিত হলো.....চধমবঃ ১২
১০। কুরআন অধ্যায়নের পদ্ধতি.....চধমবঃ ১৩
১১। কুরআনের প্রাণসত্তা অনুধাবন.....চধমব : ১৪
১২। কুরআনী দাওয়াতের বিশ্বজনীনতা.....চধমব :১৬
১৩। পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান.....চধমব :১৭
১৪। বৈধ মতপার্থক্য..... চধমব : ১৮

১ম পয়েন্ট । তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা

প্রথমেই পরিষ্কার বার্তা :

এটি কুরআনের ভূমিকা নয়–তাফসিরগ্রন্থ তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা ।

লেখার মূল লক্ষ্য দু'টি:

১. কুরআন বুঝার প্রাথমিক খোরাক :

কুরআন বুঝতে হলে কিছু প্রাথমিক সত্য আগে জানা দরকার ।

তা না হলে পাঠের মাঝপথে মনে আসবে সংশয়, আর থেমে যাবে হৃদয় দিয়ে অনুধাবনের পথ ।

বহু মানুষ বছরের পর বছর কেবল বাইরের কথা পে যায়, ভেতরের আলোয় পৌঁছায় না ।

২. জিজ্ঞাসু মনের প্রথম আলাপন:

যে প্রশ্নগুলো কুরআন প ার শুরুতেই মনে জাগে

লেখক তাদের আগে থেকেই সামনে এনে জবাব দিয়েছেন ।

এসব প্রশ্ন তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ ।

কুরআন পাঠকের সংকট :

"যে দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তুতি নিয়ে সাধারণ বই প া হয়, সেই মানসিকতা নিয়ে কুরআনের দরজায় এলে–কুরআন পাঠ নয়, বরং আত্মিক বিভ্রান্তিই বেশি হয় "

"এক নজরে কুরআন পাঠকের সংকটগুলো":

পাঠক কুরআনকে সাধারণ বইয়ের মতো অধ্যায়ভিত্তিক ও ধারাবাহিক মনে করে প তে যান ।

কিন্তু কুরআনের রচনাশৈলী, ভাষা ও উপস্থাপন একেবারে ভিন্ন হওয়ায় তারা বিভ্রান্ত হন ।

কুরআনের মূল উদ্দেশ্য, কেন্দ্রীয় বার্তা ও প্রসঙ্গ না জানায় তারা তা ধরতে পারেন না ।

ফলে তারা খণ্ড খণ্ড তত্ত্ব পেলেও কুরআনের সামগ্রিক দিক ও প্রাণসত্তা থেকে বঞ্চিত হন ।

এই বিভ্রান্তি থেকেই অনেকের মনে সন্দেহ, বিকৃত ব্যাখ্যা ও ভুল সিদ্ধান্ত জন্ম নেয় ।

মূল সংকট কুরআনের নয়, বরং পাঠকের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তুতির অভাবে ।

বিস্তারিত :

১.সাধারণ বই-পাঠের মানসিকতা বনান বাস্তবতা :

পাঠক কুরআনকেও সাধারণ পাঠ্যবইয়ের মতো অধ্যায়-অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পাবে বলে ধরে নেয় ।

ভাবেন, ধারাবাহিকভাবে জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলো সাজানো থাকবে–যেমন আইন, নীতি, ইতিহাস ইত্যাদি।

বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন:

কুরআনে বিষয়বস্তু একাধারে আকীদা,শরীয়াহ,ইতিহাস,উপদেশ,ভয়,সুসংবাদ,যুক্তি সব একত্র ।

এক প্রসঙ্গের মাঝে অন্য প্রসঙ্গ ঢুকে পে ; বর্ণনা ও শব্দবিন্যাসেও আসে বৈচিত্র্য ।

২. পাঠকের হতাশা ও বিভ্রান্তি:

সুবিন্যস্ত সূচিপত্র না পেয়ে পাঠক ভাবেন–এটি অগোছালো, খণ্ডিত বক্তব্যের সমষ্টি ।

সন্দেহবাদীরা এখানেই কুরআনের বিরুদ্ধে আপত্তির ভিত্তি তৈরি করে ।

৪. ব্যাতিক্রম রচনাশৈলী :

কুরআনের ভাষা, বিশ্লেষণপদ্ধতি, শব্দের গভীরতা, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি সাধারণ পাঠ্যশাস্ত্র থেকে আলাদা ।

দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতির কারণে পাঠক আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ ধরতে ব্যর্থ হয় ।

৫. ফলাফল:

কেউ কেবল কিছু বিচ্ছিন্ন নসিহত ও উপদেশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে ।

কেউবা ভুল পটভূমির কারণে অর্থবিকৃতি ও চিন্তার বিচ্যুতিতে পে ।

৬. মূল সংকট:

কুরআন বোঝার আগে প্রয়োজন যথাযথ মানসিক প্রস্তুতি, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা ও বর্ণনা পদ্ধতির বোধ ।

এগুলো ছা া কুরআনের হৃদয় ছুঁয়ে দেখা সম্ভব নয় ।

সংকট উত্তরণের উপায় :

তাজুলের সংযোজন :

এই সংকট উত্তরণের উপায় বুঝতে হলে আগে সংকট আদ্যোপান্ত জানতে হবে। তাই ৪টি প্রশ্ন আগে বুঝতে হবে ।

১. সংকট কী?

উত্তর : কুরআন পাঠকের সংকট হচ্ছেকুরআন বুঝতে গিয়ে সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া ।

২.সংকট কেন এবং কোথা থেকে তৈরি হয়েছে?

উত্তর : এই সংকট তৈরি হয় কুরআন সর্ম্পকে মৌলিক ধারণার অভাবে ।

৩.এই সংকট কিসের উপর ভিত্তি করে হয়ে?

কুরআনের পরিচয় ও মুহাম্মদ সাঃ এর দাওয়াত সর্ম্পকে ভূল দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে এই সংকট সৃষ্টি হয় ।

৪.সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কেমন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন?

কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কুরবানী দিয়ে কুরআন যা নিজ সর্ম্পকে জানিয়েছে এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ দাওয়াতে যে দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে তা গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে ।

❑ মূলনোট : সংকট উত্তরণের ৬টি উপায় লেখক আলোচনা করেছেন ।

❖ কুরআন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা :

কুরআন কোনো প্রচলিত গ্রন্থ নয়; এটি এক অভিনব, স্বতন্ত্র ও সর্বযুগোপযোগী কিতাব

প্রচলিত বইয়ের কাঠামো ও মানদণ্ডে কুরআনকে বিচার করলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় ।

কুরআনের ভাষা, বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের ।

কুরআন অনুধাবনের জন্য পূর্বধারণা বাদ দিয়ে এর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

❖ কুরআন অনুধানের পূর্বশর্ত :

কুরআনের প্রকৃত পরিচয় ও তার উপস্থাপক রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতকে গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে ।

বিশ্বাস না থাকলেও, কুরআনের বক্তব্য বোঝার জন্য এর মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিতে হয় ।

সংকট উত্তরণের জন্য পাঠককে সর্বপ্রথম মূল কুরআনের সাথে পরিচিত হতে হবে, এর প্রতি তার বিশ্বাস থাকা না থাকার প্রশ্ন এখানে নেই ।তবে এ কিতাবকে বুঝতে হলে প্রারনি্ভক সূত্র হিসেবে এ কিতাব নিজে এবং এর উপস্থাপক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মূল বিষয় বিবৃত করেছেন তা গ্রহণ করতে হবে । এ মূল বিষয় নিম্নরূপ:

১ম সূত্র : আল্লাহর পরিচয়, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আল্লাহ্ বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও বিধানদাতা ।

মানুষ্ জ্ঞান, ইচ্ছা ও স্বাধীনতা দিয়ে আল্লাহর খলীফা হিসেবে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে ।

২য় সূত্র : আল্লাহর ঘোষণা ; মানুষের দায়িত্ব,কর্মনীতি ও পরিনতি।

মানুষের স্বাধীনতা সীমিত :

মানুষকে কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হলেও সে আল্লাহর মালিকানার বাইরে নয় ।‡স স্বেচ্ছাচারীও নয়, বরং আল্লাহর বিধানের অধীন ।

পৃথিবী এক পরীক্ষা ক্ষেত্র:

এ জীবন পরীক্ষার জন্য, মৃত্যুর পর সবাইকে আল্লাহর আদালতে ফিরে যেতে হবে–হিসাব দিতে হবে।

কর্মনীতি ও পরিনতি :

সঠিক কর্মনীতি ও ফলাফল :

আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ (উপাস্য), মালিক ও শাসক হিসেবে মানা ।

আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী চলা ।

দুনিয়াকে পরীক্ষাগার মনে করে আখিরাতে সফলতার প্রস্তুতি নেওয়া ।

ফলাফল:

দুনিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা ও সঠিক পথের নিশ্চিততা ।

আখিরাতে চিরস্থায়ী পুরস্কার–জান্নাত ।

বাতিল কর্মনীতি ও পরিণতি :

আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের হুকুম মানা ।

নিজের মন বা সমাজকে জীবনবিধান বানানো ।

আখিরাত ভুলে কেবল দুনিয়াকেই সব কিছু মনে করা ।

পরিণতি:

দুনিয়ায় অস্থিরতা, অবক্ষয় ও অশান্তি ।

আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তি–জাহান্নাম ।

৩য় সূত্র : অবাধ্যতার ইতিহাস

আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) হেদায়াতপ্রাপ্ত অবস্থায় দুনিয়ায় আসেন ।

পরবর্তীতে শয়তানের প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির অনুসরণে মানুষ সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নানা মত ও ধর্মে বিভক্ত হয় ।

আল্লাহর শরীয়ত বিকৃত হয়ে পে কল্পনা, সংস্কার ও স্বার্থনির্ভর মতবাদের আ ালে ।

৪র্থ সূত্র : আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত দেওয়ার পদ্ধতি

জোর করে নয়:

আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ পরীক্ষা নিতে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাই জোরপূর্বক সঠিক পথে বাধ্য করা তাঁর নীতির পরিপন্থী ।

সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিও নয়:

বিদ্রোহ করলেই যদি আল্লাহ মানুষকে ধ্বংস করতেন, তবে পরীক্ষা ও সুযোগের নিয়ম ভে যেত ।

পথনির্দেশের পদ্ধতি:

আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকেই কিছু ঈমানদার, ন্যায়পরায়ণ মানুষকে নির্বাচন করেন–যারা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। তিনি তাঁদের মাধ্যমে সত্য-জ্ঞান, হিদায়াত ও জীবনবিধান পাঠান।

দাওয়াত ও দায়িত্ব:

যেন মানুষ নিজেই চিন্তা করে ভুল পথ থেকে ফিরে আসে, এবং আল্লাহর দেওয়া সহজ ও সঠিক পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয় ।

৫ম সূত্র : নবীগনের মিশন ও ভূমিকা

তাঁরা সবাই একই মিশনের ধারক: মানুষের কাছে আল্লাহর বিধান পৌঁছে দেওয়া ।

তাঁদের লক্ষ্য ছিল একটি ঈমানদার উম্মত গঠন ও আল্লাহর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ।

যারা আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে, তাদের প্রতিরোধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ।

সময়ের সাথে অনেক উম্মত দিকভ্রান্ত হয়ে পে ; কেউ পথ হারায়, কেউ শরিয়ত বিকৃত করে ।

৬ষ্ঠ সূত্র : মুহাম্মাদ (সা.) ও চূ ান্ত হেদায়াত

মুহাম্মাদ (সা.) হলেন সর্বশেষ রাসূল, যাঁর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ও চূ ান্ত হেদায়াত নাজিল হয়েছে ।

তাঁর দাওয়াত ছিল কুরআন-ভিত্তিক; যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সঠিক জীবনপথ ।

কুরআন এখন চিরস্থায়ী দিকনির্দেশনা–সকল মানুষের জন্য, সব যুগে ।

২য় পয়েন্ট । আল কুরআনের আলোচ্য বিষয়

কুরআনের মূল বিষয়বস্তু:

মানুষের কল্যাণ কিসে – এই প্রশ্নের যথার্থ ও জাজ্বল্যমান সত্যভিত্তিক উত্তর ।

কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়:

মানুষ যে মতবাদ ও কর্মনীতি গ্রহণ করেছে তা ভুল; সত্য হলো আল্লাহর দেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি ।

চূ ান্ত লক্ষ্য:

মানুষকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি গ্রহণে আহ্বান ।

আল্লাহর হেদায়াত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা ।

মানব সমাজের সমস্যা:

অনুমাননির্ভরতা, প্রাকৃতিকতা ও শয়তানী প্রবৃত্তির কারণে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে ।

সত্য বিকৃতির কাজ মানুষ নিজেরাই করে এসেছে ।

তিনটি মূল বিষয়:

বিষয়বস্তু: মানব কল্যাণের সত্য অনুসন্ধান ।

আলোচ্য বিষয়: সত্য-মিথ্যার বিভ্রান্তি দূরীকরণ।

লক্ষ্য ও বক্তব্য: সত্য পথে আহ্বান ।

কুরআনের আলোচনা বিষয়সমূহ:

আকাশ-পৃথিবীর গঠন

মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া

পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস

জাতির আকীদা, নৈতিকতা, কর্মের সমালোচনা

অতিপ্রাকৃত বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা উদ্দেশ্য:

কোনো নির্দিষ্ট বিদ্যার শিক্ষা নয়

সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মাত্রায় আলোচনা

আলোচনার বৈশিষ্ট্য:

সব আলোচনা কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ও দাওয়াতের দিকে আবর্তিত
অপ্রয়োজনীয় বিশদ ব্যাখ্যা পরিহার
গভীর ঐক্য ও সংগতি বজায় রেখে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন

৩য় পয়েন্ট । কুরআন নাযিলের পদ্ধতি

১। ধাপে ধাপে নাযিল: কুরআন একসাথে নাযিল হয়নি, বরং ২৩ বছরে ধাপে ধাপে পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নাযিল হয় ।

২। প্রচলিত গ্রন্থের মতো নয়: এতে ধারাবাহিক রচনা ও বিষয়বিন্যাস নেই; এটি এক অভিনব গ্রন্থ ।

৩। প্রথম দিকের বিষয়বস্তু:

নবীকে প্রস্তুত করা: দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি শেখানো ।

সত্য পরিচিতি ও ভুল ধারণা খণ্ডন ।

সঠিক জীবনের দাওয়াত: নৈতিকতা ও কল্যাণের পথ দেখানো ।

দাওয়াতের শুরু: মক্কা ও নিজ জাতি থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে প্রসারিত করা হয়।

৪র্থ পয়েন্ট । ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্ব

(মক্কী দাওয়াতের প্রথম ৪৫ বছর):

দাওয়াতের শুরুতে সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল ও সাহিত্যসমৃদ্ধ আয়াত নাযিল হয় যা সহজেই মানুষের মনে গেঁথে যেত ।

ভাষা ছিল মিষ্টি, প্রভাবশালী ও আরবদের রুচি অনুযায়ী ।

স্থানীয় ইতিহাস, নিদর্শন ও বাস্তবতা দিয়ে সত্যের যুক্তি উপস্থাপন করা হতো ।

প্রতিক্রিয়া তিন রকম:

১.কিছু মানুষ ইসলাম কবুল করে উম্মাহ গঠন শুরু করেন ।

২.অনেকেই বিরোধিতায় নেমে পে ।

৩. দাওয়াত কুরাইশের সীমানা ছা িয়ে বিস্তৃত হতে থাকে ।

৫ম পয়েন্ট । দাওয়াতের দ্বিতীয় অধ্যা (প্রায় ৯ বছর)

দ্বিতীয় অধ্যায় (প্রায় ৯ বছর):

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে তীব্র সংঘাত শুরু হয় ।

বিরোধীরা অপপ্রচার, নির্যাতন, বয়কট, হিজরতের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে ।

এরপরও ইসলামী দাওয়াত ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে থাকে; প্রায় সব বংশে কেউ না কেউ ইসলাম গ্রহণ করে ।

আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তাকওয়া, ধৈর্য, দাওয়াতের পদ্ধতি ও ঈমানদারদের প্রশিক্ষণমূলক আয়াত নাযিল হতে থাকে ।

শিরক ও জাহেলিয়াতকে যুক্তির মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়,তাদের সন্দেহ দূর করা হয়।

৬ষ্ঠ পয়েন্ট । দাওয়াতের তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায় (মদীনী পর্ব ১০ বছর):

হিজরতের মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য মদিনায় একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয় ।

ইসলাম রাষ্ট্রীয় রূপ পায়; যুদ্ধ, মুনাফিক ও আহলে কিতাবদের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয় ।

কুরআনের বাণী এখন রাজকীয় ফরমান, রাষ্ট্রনীতি, সামাজিক বিধান ও শত্রুদের মোকাবেলার নির্দেশনায় পূর্ণ ।

মুসলমানদের আত্মগঠনে, সমাজ গঠনে ও জিহাদের প্রেরণায় নাযিল হয় আয়াতসমূহ ।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও বৈশ্বিক দাওয়াতের ভিত্তি গে তোলা হয় ।

৭ম পয়েন্ট । কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি

দাওয়াতি সূচনা:

কুরআনের প্রথম নাজিল শুরু হয় একটি দাওয়াতি আহ্বান নিয়ে ।

২৩ বছরের বাস্তবতা:

দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়ে ও পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের বিভিন্ন অংশ নাযিল হয় ।

রচনাশৈলী আলাদা:

কুরআনের বর্ণনা ডক্টরেট থিসিস বা গবেষণাপত্রের মতো নয় ।

বক্তৃতাভঙ্গি:

কুরআনের সূরা ও আয়াতগুলো বক্তৃতা ও ভাষণের মতো, যা মানুষের হৃদয়, বিবেক ও আবেগকে লক্ষ্য করে ।

আহ্বানকারীর ভাষা:

এটি কোনো অধ্যাপকের নয়, বরং একজন আহ্বানকারীর আবেগপূর্ণ ভাষণ ।

বহুমুখী কাজ:

রাসূল ﷺ-কে চিন্তা বদল, আবেগ জাগানো, বিরোধিতা ভা া, সাথীদের প্রশিক্ষণ ও অনুপ্রেরণা দেওয়া, শত্রুদের মোকাবিলা করা–সব একসাথে করতে হতো ।

ভাষার বৈচিত্র্য:

কুরআনের ভাষা এই বাস্তব দাওয়াতের উপযোগীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে; কোনো নির্দিষ্ট একক ভঙ্গি নয় ।

পুনরাবৃত্তির কারণ:

এক পর্যায়ে থাকা অবস্থায় একই বিষয়ের বারবার আলোচনা দরকার হয়; কিন্তু তা ভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয় ।

ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ব্যবহার:

পুনরাবৃত্তিকে বিরক্তিকর না করে নতুন র , শব্দ ও শৈলীতে উপস্থাপন করা হয়েছে ।

মূলনীতি কখনো আ ালে যায় না:

তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলো পুরো কুরআনে বারবার এসেছে ।

কারণ:

এই মৌলিক ধারণাগুলো দুর্বল হলে ইসলামী আন্দোলনের প্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে যেত।

৮ম পয়েন্ট । এহেন বিন্যাসের কারণ

নাযিলের ক্রম রাখা হয়নি কেন?

কুরআন নাযিলের যে ধারায় এসেছে, নবী ﷺ তা বিন্যাসে অক্ষুণ্ন রাখেননি; কারণ দাওয়াত পরিপূর্ণ হওয়ার পর তার উপযোগিতা পরিবর্তিত হয়েছে ।

দাওয়াতের পর্যায়ভিত্তিক নাযিল:

কুরআন ইসলামী দাওয়াতের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে নাযিল হয়েছে ।

পরিপূর্ণ দাওয়াতের পর নতুন প্রয়োজন:

ইসলাম প্রচারের শুরুতে অপরিচিতদের জন্য শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় ছিল;

পরে, ঈমানদারদের দায়িত্ব, শাসন, সমাজ ও ইতিহাসের শিক্ষা প্রয়োজন হয় ।

নতুন বিন্যাসের প্রয়োজন:

পরিণত উম্মাহর জন্য প্রয়োজন হয় একটি সম্পূর্ণ, সংগঠিত ও লক্ষ্যভিত্তিক কিতাব ।

কুরআনের প্রকৃতি:

একই বিষয়ের আলোচনা মক্কী ও মাদানী সূরায় ছ িয়ে থাকলেও এতে ইসলামের সামগ্রিক চিত্র পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয় ।

বিভিন্ন পর্যায়ের মিশ্র বর্ণনা:

মক্কী যুগের আলোচনা মাদানী সূরায়, আর মাদানী নির্দেশনা মক্কী সূরার মধ্যে আসতে পারে–এই বৈচিত্র্যেই ইসলামের পূর্ণতা ফুটে ওঠে ।

নাযিলের ক্রমে বিন্যাস করলে সমস্যা:

তখন কুরআনের সাথে প্রতিটি আয়াতের নাযিল-পরিস্থিতির ইতিহাস জুে দিতে হতো, যা আল্লাহর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হতো ।

➢ আল্লাহর উদ্দেশ্য:

কুরআন যেন সব শ্রেণির মানুষ–শিশু, নারী, বৃদ্ধ, সাধারণ, পণ্ডিত–সহজে বুঝতে ও পাঠ করতে পারে ।

নির্ভেজাল কিতাব:

আল্লাহর বাণীকে অন্য কোন ইতিহাস বা ব্যাখ্যার মিশ্রণ ছা া একত্রিত ও সংরক্ষণই ছিল লক্ষ্য ।

আসল ভুল ধারণা:

কুরআনের বিন্যাস নিয়ে আপত্তি তোলেন যারা, তারা কুরআনের উদ্দেশ্য না জেনে এটিকে ইতিহাস বা সমাজ বিজ্ঞানের কিতাব ভাবেন ।

আয়াত বিন্যাসে নবী ﷺ-র ভূমিকা:

নবী ﷺ নির্দেশ দিতেন কোন আয়াত বা সূরা কোথায় বসাতে হবে ।

কোনো অংশ যদি সম্পূর্ণ সূরা না হয়, তবুও তিনি নির্দেশ দিতেন সেটি কোন সূরার কোন জায়গায় বসাতে হবে ।

নামাযে, তেলাওয়াতে তিনি এই বিন্যাসই অনুসরণ করতেন ।

সাহাবাদের অনুসরণ:

সাহাবায়ে কেরাম এই বিন্যাস অনুযায়ী কুরআন মুখস্থ করতেন ।

বিন্যাস ছিল ঐশী ও চূ ান্ত:

কুরআন যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, তেমনি এর বিন্যাসও নবী ﷺ-এর মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশেই সম্পূর্ণ হয়েছিল ।

হস্তক্ষেপের সুযোগ ছিল না:

এই বিন্যাসে কোন মানুষের নিজ ইচ্ছায় পরিবর্তনের সুযোগ বা অধিকার ছিল না ।

৯ম পয়েন্ট । কুরআন কিভাবে সংকলিত হলো

১. নবুয়তের যুগে সংরক্ষণ

নামাজ ফরজ হওয়ায় কুরআন মুখস্থ করা আবশ্যক ছিল ।

সাহাবিরা সাথে সাথে কুরআন মুখস্থ করতেন ।

কাতিবরা খেজুরপাতা, হা , পাথরে লিখে রাখতেন ।

২. আবু বকর (রা)-এর সময়ে সংকলন

ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফেজ সাহাবী শহীদ হন ।

হযরত উমর (রা)-এর পরামর্শে হযরত আবু বকর (রা) কুরআন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন ।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) লিখিত ও মৌখিক দুই মাধ্যম মিলিয়ে নির্ভুল কপি প্রস্তুত করেন ।

সংকলিত কপি উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত হয় ।

৩. উসমান (রা)-এর সময়ে প্রামাণ্য কপি প্রচলন

ইসলাম বিস্তারের ফলে বিভিন্ন উচ্চারণে পাঠে ফিতনার আশঙ্কা দেখা দেয় ।

হযরত উসমান (রা) একমাত্র কুরাইশী উচ্চারণে লিখিত নুসখা প্রণয়ন ও প্রচার করেন ।

অন্য সব পাঠপ্রণালী বন্ধ করে দেন ।

এই নুসখাগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয় ।

৪. আজকের কুরআন

বর্তমান কুরআন হযরত উসমান (রা) প্রণীত অনুলিপিরই প্রতিলিপি ।

বিশ্বব্যাপী হাজারো কপি থাকা সত্ত্বেও এক হরফও পরিবর্তিত হয়নি ।

এটি ইতিহাসে সবচেয়ে নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত ঐশী গ্রন্থ ।

১০ম পয়েন্ট । কুরআন অধ্যায়নের পদ্ধতি

মন-মস্তিষ্ক মুক্ত রাখা:

কুরআন অধ্যায়নের শুরুতে পূর্বনির্ধারিত চিন্তাধারা, মতবাদ বা ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে মুক্ত থাকতে হবে ।আন্তরিক ও নির্ভেজাল উদ্দেশ্যে প তে হবে ।

প্রথম পাঠে সামগ্রিক ধারণা অর্জন:

প্রথমবার কুরআন প ার সময় এর সামগ্রিক বিষয়, মৌলিক চিন্তা ও জীবনব্যবস্থার ভিত্তি বুঝতে চেষ্টা করতে হবে । প ার সময় প্রশ্ন বা সংশয় নোট করতে হবে, পরে উত্তর খুঁজতে হবে ।

বারবার পাঠ ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি:

একবার প া যথেষ্ট নয়; বারবার প তে হবে, প্রতিবার নতুন ভঙ্গিতে প তে হবে । †নাটবই নিয়ে বসে বিস্তারিত লেখা উচিত ।

সংশয় ও প্রশ্ন সংরক্ষণ:

প্রথম অধ্যায়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর না পেলে তা লিখে রেখে দ্বিতীয় বা পরবর্তী অধ্যায়ে উত্তর খুঁজতে হবে, ধৈর্য ধরে অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে হবে ।

বিষয়ভিত্তিক গভীর অধ্যয়ন:

কুরআনের বিভিন্ন বিষয় যেমন আদর্শ মানুষ, কল্যাণ ও ক্ষতির বিষয়াদি আলাদা আলাদা করে নোট করতে হবে এবং মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে ।

বিভিন্ন বিষয় ভাগ করে লেখা:

যেমন 'পছন্দনীয় মানুষ' ও 'অপছন্দনীয় মানুষ', 'কল্যাণের উপাদান' ও 'ক্ষতির কারণ' এর মতো ভাগ করে নোটবইতে লিখে নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে ।

কুরআনের সামগ্রিক জীবনচিত্র অনুধাবন:

বিভিন্ন বিষয় অনুধাবনের মাধ্যমে কুরআন থেকে জীবনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্র স্পষ্ট করতে হবে ।

সমস্যা নির্ধারণ করে অনুসন্ধান:

জীবনের বিশেষ কোনো সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালাতে চাইলে সেই সমস্যা সংক্রান্ত প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান অধ্যয়ন করতে হবে, তারপর কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করতে হবে ।

গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে উত্তর পাওয়া:

আগেও প া আয়াতগুলোতেও গবেষণা করলে নতুন নতুন অর্থ বা তত্ত্ব সামনে আসবে ।

১১ তম পয়েন্ট । কুরআনের প্রাণসত্তা অনুধাবন

. কুরআন শুধু তাত্ত্বিক বই নয়:

এটি কোনো মতবাদ বা চিন্তাধারার গ্রন্থ নয়,বরং জীবনের কাজ করার নির্দেশনা ও বাস্তব প্রয়োগের কিতাব ।

আসল উপলব্ধি কাজের মধ্য দিয়ে:

কুরআনের প্রাণসত্তা বুঝতে হলে শুধু প া নয়, এর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা ও কাজ করতে হবে ।

ধর্মগ্রন্থ বা মাদ্রাসার শিক্ষার বাইরে:

মাদ্রাসার পাঠ বা খানকাহয় বসে শুধু তত্ত্ব অনুধাবনেই সীমাবদ্ধ থাকা যথেষ্ট নয় ।

দাওয়াত ও আন্দোলনের কিতাব:

কুরআন একটি সক্রিয় আন্দোলনের বই, যা মানুষের নীরবতা ভেে বাইরের জগতের সঙ্গে ল াই করার আহ্বান দেয় ।

বাতিলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ:

কুরআন অনুসারীদেরকে সমাজের অবিচার, অবিশ্বাস, কুফর ও ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে দাঁ াতে শিখায় ।

সত্যনিষ্ঠ ও সক্রিয় জীবনের আহ্বান:

কুরআন অনুসারীরা গৃহের বাইরে এসে সমাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয়,শুধু নিঃসংগ জীবন নয় ।

খিলাফতে ইলাহীয়ার দীর্ঘ সংগ্রাম:

কুরআন ভিত্তিক ইসলামী আন্দোলন ২৩ বছর ধরে নানা কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

সংঘাত ও দ্বন্দ্বের অংশ হতে হবে:

কুরআনের পূর্ণ উপলব্ধি হবে শুধু যখন নিজেকে ঐ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের অংশ হিসেবে দেখবেন এবং কাজ করবেন ।

'কুরআনী সাধনা':

কুরআনের আয়াত ও সূরা বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতির স্মৃতি হয়ে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সামনে আসবে,এক ধরনের ধারাবাহিক সাধনা ।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক বাস্তবায়ন অপরিহার্য:

ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের নির্দেশ মেনে চলা ছা া অথবা জাতির সামাজিক ব্যবস্থা কুরআনের পথে না গেলে এর প্রাণসত্তা উপলব্ধি সম্ভব নয় ।

১২ তম পয়েন্ট । কুরআনী দাওয়াতের বিশ্বজনীনতা

কুরআনের মূল দাবি:

কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে পথ দেখাতে নাযিল হয়েছে ।

নাযিলের সময়ের আরববাহিনী লক্ষ্য:

অধিকাংশ আয়াত আরববাসীর ঐতিহাসিক,সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে ।

স্থানীয় ও সাময়িক বিষয়বস্তু থাকা স্বাভাবিক:

বিশেষ সময় ও স্থানের মানুষের অবস্থান বুঝিয়ে, তাদের বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়া হয়েছে ।

সমগ্র মানবতার জন্য প্রযোজ্যতা:

কেবল আরবদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; আয়াত ও নির্দেশনার মূল যুক্তি ও নীতি সব যুগ ও জাতির জন্য প্রযোজ্য ।

কুরআনের প্রমাণ পদ্ধতি ও যুক্তি সার্বজনীন:

শিরকের বিরুদ্ধে কুরআনের যুক্তি বিশ্বজনীন,যেকোন যুগের মুশরিকের জন্য প্রযোজ্য ।

সমগ্র মানবজাতির জীবনে প্রভাব:

কুরআনের শিক্ষা ও দাওয়াত স্থান ও সময়ের সীমানা ছা িয়ে চিরন্তন ও সার্বজনীন ।

বস্তু নিরপেক্ষতা ও সময়ের সাথে খাপ খাওয়া:

কোন চিন্তা বা দর্শন পুরোপুরি বস্তু নিরপেক্ষ নয়; পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে হয়।

আন্তর্জাতিক দাওয়াতের বাস্তবতা:

দাওয়াত শুরুতে স্থানীয় মানুষের কাছে পেশ করা এবং সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছ িয়ে প ে ।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ব্যবস্থার পার্থক্য:

জাতীয় ব্যবস্থা: নির্দিষ্ট জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষ অধিকারের দাবি ।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা: সকল মানুষের মর্যাদা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করে ।

সাময়িক ব্যবস্থা: সময়ের সাথে পরিবর্তিত ও অস্থায়ী ।

চিরন্তন ব্যবস্থা: সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী খাপ খায় ।

কুরআন একটি চিরন্তন, সার্বজনীন ব্যবস্থা:

এটি শুধুমাত্র আরবের জন্য বা সাময়িক কোনো জাতির জন্য নয়, বরং সব যুগ ও জাতির জন্য আদর্শ জীবন ব্যবস্থা ।

১৩ তম পয়েন্ট । পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

কুরআন জীবন বিধান গ্রন্থ হলেও:

সরাসরি সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি,অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের সম্পূর্ণ বিস্তারিত নিয়ম-কানুন কুরআনে পাওয়া যায় না ।

নামায ও যাকাতের বিধানও বিস্তারিত নয়:

এমনকি নামায ও যাকাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরযও কুরআনে বিস্তারিতভাবে প্রতিটি নিয়ম তুলে ধরা হয়নি ।

অব্যক্ত কারণ:

আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল শুধু কিতাব নাযিল করা নয়, বরং পয়গম্বরকে প্রেরণ করা যিনি জীবন ব্যবস্থার বিস্তারিত বাস্তব রূপ স্থাপন করবেন ।

গৃহনির্মাণের রূপকে উদাহরণ হিসেবে বোঝানো হয়েছে:

নকশা (কুরআন) দেওয়ার পর একজন ইঞ্জিনিয়ার (পয়গম্বর) সেই নকশা অনুযায়ী পুরো ভবন নির্মাণ করেন। তাই কেবল নকশা দেখে অসংগতি আনা যুক্তিহীন ।

কুরআন মূলনীতি ও মৌলিক বিষয় উপস্থাপন করে:

খুটিনাটি বিবরণ না দিয়ে মূল নীতি, ভাবনা ও নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে ।

বৈজ্ঞানিক যুক্তি, প্রমাণ ও আবেদনের মাধ্যমে শক্তিশালী করণ:

কুরআন চিন্তাগত ও নৈতিক ভিত্তি শুধু দেয় না, পাশাপাশি যুক্তি ও আবেগ দিয়ে তাদের দৃঢ় করে ।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কাঠামো নির্মাণ:

কুরআন জীবনের বিভাগগুলোর মূল চৌহদ্দি ও সীমারেখা নির্দেশ করে ।

বাস্তব গঠন ও নির্মাণ পয়গম্বরের দায়িত্ব:

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবন ব্যবস্থার আদর্শ কাঠামো তৈরি করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন ।

১৪ তম পয়েন্ট । বৈধ মতপার্থক্য

কুরআন কঠোরভাবে নিন্দা করে এমন মানুষদের যারা:

আল্লাহর কিতাব নাযিল হওয়ার পরও নিজেদের মধ্যে দলে বিভক্ত হয়, দলাদলি করে, ও নিজেদের দীনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে ফেলে ।

কিন্তু একই সময়ে দেখা যায়:

দীন ও আইন বিষয়ে বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে আলেম, তাবেইন, সাহাবা এবং ইমামদের মধ্যেও ব্যাপক মতপার্থক্য ছিল ।

সব জায়গায় একমত হওয়ার আয়াত নেই:

এমন কোনও আয়াত নেই যা প্রতিটি বিষয়ে একমত থাকার নির্দেশ দেয় ।

তাহলে প্রশ্ন:

কুরআনের কঠোর নিন্দা কি ঐ আলেমদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ?

না হলে কুরআন কোন ধরনের মতবিরোধের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে ?

মতপার্থক্যের দুই ধরণ এবং কুরআনের রায় :

১. প্রথম ধরনের মতপার্থক্য:

আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যে সবাই ঐক্যবদ্ধ ।

কুরআন ও সুন্নাহ জীবন বিধানের উৎস স্বীকার ।

ছোটখাটো বিষয়ে আলেমদের মধ্যে স্বতন্ত্র মত থাকতে পারে ।

কেউ কাউকে দীন থেকে বহিষ্কৃত বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করবে না ।

যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে মতামত দেওয়া ও গ্রহণ করা হয় ।

সমাজের উন্নতি ও বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হিসেবে এই মতপার্থক্যকে দেখা হয় ।

২. দ্বিতীয় ধরনের মতপার্থক্য:

মৌলিক দীনীয় বিষয় বা ইমান-বিশ্বাসে বিভাজন সৃষ্টি ।

নিজের মতকে 'সত্য মুসলিম' ও অন্যদের 'বহিরাগত' ঘোষণার প্রচার ।

দলগঠন করে অন্যদের বিরুদ্ধে কুৎসা, বিদ্বেষ ও দীন থেকে বহিষ্কার করার প্রচেষ্টা ।

এতে সমাজে বিভাজন, বিদ্বেষ, ও ধ্বংসাত্মক দলাদলি তৈরি হয় ।

কুরআন এই ধরনের মতবিরোধ, দলাদলি ও ফেরকাবন্দির কঠোর নিন্দা করে ।

কুরআন কী চাইছে? :

বুদ্ধিমত্তার মুক্ত অবস্থান:

ইসলামী সমাজে জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মানুষের মতপার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়

মৌলিক বিশ্বাসে একতা বজায় রাখা:

ইসলামী নীতি ও মূল বিশ্বাসের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য থাকতে হবে।

দ্বিতীয় ধরনের মতবিরোধ থেকে বিরত থাকা:

যা কেবল বিভাজন, বিদ্বেষ ও উম্মাহর ক্ষতি করে ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এমন বৈধ মতবিরোধকে প্রশংসিত করেছেন।

পাঠকের জন্য পরামর্শ

কুরআনের গভীর অধ্যয়ন ও তাফসীর (ব্যাখ্যা) মনোযোগ দিয়ে প া প্রয়োজন।

যেসব প্রশ্ন মনে হয়, সংশ্লিষ্ট অংশে তার জবাব খোঁজার চেষ্টা করা।

মতবিরোধের বিষয়ে সচেতন থাকা ও মৌলিক ইসলামী ঐক্য রক্ষা করা।

দ্বন্দ্ব, দলাদলি, ও বিভাজনের পথ এ িয়ে চলা।

সমাপ্ত

মা'আসসালাম

তাজুল ইসলাম তাইমী’

ছাব্বিশ ু পাঁচ ু পঁচিশ । চট্রগ্রাম

দাওয়াত সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত,

দাওয়াত সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত,

মাসয়ালা: বিভিন্ন নামাজ সংক্রান্ত- পৃষ্ঠা- ০৮

অনুশীলনী -১০ (মে- ৩য় সপ্তাহঃ)

দারসুল কুরআন

সুরা আল মুমিনুন-১-১১ (মুমিনের গুনাবলী)

১. নিশ্চিত ভাবেই সফলকাম হয়েছে মুমিনরা। ২. যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী ও নম্র। ৩. যারা বাজে বা বেহুদা কথা কাজ থেকে দুরে থাকে। ৪. যারা তাজকিয়া বা পরিশুদ্ধির ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়। ৫. এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। ৬. তবে তাদের স্ত্রীদের ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। ৭. তবে যদি কেউ তাদের ছাড়া অন্য কাউকে (যৌন ক্ষুধা মেটাবার জন্য) কামনা করে তবে তারা হবে সীমালংঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানতসমূহ এবং ওয়াদাচুক্তির (অঙ্গীকার) রক্ষনাবেক্ষন করে। ৮. এবং যারা তাদের নামাযসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষন করে। ৯. তারাই (এসব গুনের অধিকারী) উত্তরাধিকার লাভ করবে ১০. তারা উত্তরাদিকার হিসাবে ফিরদাউস পাবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ . الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

নামকরনঃ

সুরার নামকরন দুই ভাবে হয়ে থাকে-
বহুল আলোচিত শব্দ (শব্দ ভিত্তিক). যেমন- নাস, ফালাক
বিষয়ভিত্তিকঃ যেমন- সুরা ফাতেহা, ইখলাস
এ সুরাটি ১ম আয়াতের আল মুমিনুন শব্দ থেকে নামকরন করা হয়েছে

নাযিল হবার সময়কাল ও মূল বিষয়বস্তুঃ
সুরাটি মক্কী, হিজরতের পূর্বে নাজিল হয়েছে। তবে ঠিক কোন সময়ে নাজিল হয়েছে তা সঠিক ভাবে বলা য়ায় না। বর্ণনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তু হতে প্রতিয়মান হয় যে, এ সুরা রাসুল করীম (সঃ) এর মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে নাজিল হয়েছিল।
এ সুরার মুল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রসুলের আনুগত্য করার আহ্বান। সুরার প্রথমে এ আলোচনা করা হয়েছে যে, নবীর অনুসারী মুমিনদের কতিপয় গুনাবলী রয়েছে, এই বিশেষ গুণাবলী অর্জনকারীরাই সফলকাম। ইহকালে ও পরকালে তারাই সাফল্য লাভকরবে। পরে এ সুরায় মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের কথা আলোচনা করা হয়েছে এবং স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি তোমাদেরকে পরকালে তার সামনে হাজির করতেও সক্ষম। তিনি তোমাদের হিসাব-কিতাব নিবেন। এ সুরায় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তেমনিভাবে বিভিন্ন উম্মতের কথা উল্লেখ করে তাদের পরিনতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যেন দুনিয়াবাসী নবী করীম (সঃ) এর আনুগত্য করে, আল্লার বিধানকে মেনে নেয়, তারই ইবাদত করে। আল্লাহর ও তার রসুলের আনুগত্য না করলে কেউ মুক্তি পাবে না এসব বিষয়গুলিই এ সুরায় আলোচনা করা হয়েছে।

সুরা আল মুমিনুনের ফজিলতঃ
হযরত উমর (রাঃ) বলেন রসুল (সঃ) এর প্রতি যখন অহি নাজিল হত তখন মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ শুনা যেত। একদিন তাঁর কাছে এমনি আওয়াজ শুনে আমরা অহি শুনার জন্য থেমে গেলাম। অহির বিশেষ এ অবস্থার শেষ হলে নবী করীম (সঃ) কেবলামুখী হয়ে বসে পড়লেন এবং দোয়া, করতে লাগলেন
اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَ لَا تَنْقُصْنَا وَ أَكْرِمْنَا وَ لَا تُهِنَّا وَ أَعْطِنَا وَ لَا تَحْرِمْنَا وَ آثِرْنَا وَ لَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَ ارْضِنَا وَ ارْضَ عَنَّا
"হে আল্লাহ! আমাদেরকে বেশী দাও কম দিওনা। আমাদের সম্মান বৃদ্ধি কর- লাঞ্ছিত করো না। আমাদেরকে দান কর-বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে অন্যের উপর অধিকার দাও অন্যদেরকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দিয়ো না, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্ট কর।"(তিরমিজি) এরপর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এক্ষণে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি এ আয়াতগুলো পুরোপুরি পালন করে, তবে সে সোজা জান্নাতে যাবে। এরপর তিনি সুরা মুমিনুনের প্রথম দশটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। (আহমাদ)

ইমাম নাসায়ী তফসীর অধ্যায়ে ইয়াযিদ ইবনে কাবনুস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) কে প্রশ্ন করা হয় যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বললেন তার চরিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে অতঃপর তিনি এই দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে বললেনঃ এগুলোই ছিল রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর চরিত্র ও অভ্যাস। (ইবনে কাসীর)

শানে নুযূল/পটভূমিঃ
অত্র সুরা বিশেষ করে তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলো নাজিলের মক্কার কাফেররা যেমন ছিল ইসলামের চরম বিরোধী তেমনি পার্থিব উপকরণ সব ছিল তাদের হাতের মুঠোয় (বাণিজ্য)। অপরদিকে মুসলমানদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। (আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানগত)
এই অবস্থায় কাফেররা নিজেদের অধিক সফল এবং মুসলমানদের ব্যর্থ মনে করত। তখন মুমিনদের প্রকৃত সফলতার ঘোষণা দিয়ে এ আয়াতগুলি নাজিল করেন।
প্রকৃত সফলতার অর্থ ঃ তাফসীর কারকগণ ব্যাখ্যা করেছেন কোন একটি সুন্দর দালানে এক ব্যক্তি ৫দিন থাকতে পারবে এবং যদি কুড়েঘরে থাকে তবে সারাজীবন থাকতে পারবে- এক্ষেত্রে একজন বুদ্ধিমান কোনটি বেছে নেবে।
অথচ আখেরাতে চিরজীবনের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ
অর্থঃ নিশ্চিত ভাবে সফলকাম হয়েছে মুমিনরা।
এখানে মুমিন বলতে তারা যারা রাসূল (সা:) এর উপর ঈমান এনে তার আনীত বিধান মেনে নিয়েছে এবং তার দেখানো জীবনপদ্ধতি অনুসরন করেছে।
"নিশ্চিতভাবেই সফলতা লাভ।"
দিয়ে বাক্য শুরু করার তাৎপর্য বুঝতে হলে নাজিলের পরিবেশকে সম্মুখে রাখা দরকার।

কাফিরদের ইসলাম বিরোধীতা।
সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি।

মুসলমানদের সামাজিক ও আর্থিক পশ্চাতপদতা।
আল্লাহ যখন এই মুসলমানদেরই সফল বললেন তখন বোঝা যায় আল্লাহর নিকট সফলতার মানদন্ড ঈমান অর্থ নয়। প্রকৃত সাফল্য আখেরাত। (পূর্ব দ্রষ্টব্য)
আল কোরআনে সাফল্যঃ ব্যবস্থা-পত্র
অর্থঃ যে নিজেকে পাপ থেকে পবিত্র রেখেছে সেই সফল।
সফলতা লাভের জায়গা আখেরাত-
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦)
অর্থাৎ (হে মানুষ) তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিচ্ছ। অথচ দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতের জীবন অতি উত্তম এবং স্থায়ী। (সুরা আ'লা: ১৬,১৭)
আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়লা সেসব মুমিনকে সাফল্য দান করার ওয়াদা করেছেন। যারা আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুনে গুনান্বিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

মুমিনদের সাতটি গুনঃ
সর্বপ্রথম গুন হলো ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় এটাকে এই সাতটি গুনের মধ্যে শামিল না করে পর পর সাতটি গুন বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম গুনঃ
অর্থ্যাৎ 'যারা তাদের নামাযে বিনয়ী ও নম্র।"
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
নামাযে খুশু বলতে বিনয় ও নম্র হওয়া বুঝায়। খশুর আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরীয়তের পরিভাষায় এর মানে অন্তরে স্থিরতা থাকা। অর্থ্যাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কল্পনা অন্তরে ইচ্ছাকৃত ভাবে না করা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা।
দিলের খুশু হয় তখন যখন কারো ভয়ে বা দাপটে দিল ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আর দেহের খুশু এভাবে প্রকাশ পায় যে, কারো সামনে গেলে তার মাথা নিচু হয়ে যায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে পড়ে চোখের দৃষ্টি নত হয়ে আসে, গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে যায়।
হাদীসে হযরত আবু যার (রা:) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা:) বলেন- নামাযের সময় আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না নামাযী অন্যদিকে ভ্রুক্ষেপ করে। যখন সে অন্যকোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করে তখন আল্লাহ তায়ালা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। (নাসায়ী) (আবু দাউদ)
শরীয়তে বর্ণিত নামাযের নিয়ম নীতি নামাযে খুশু পয়দা করতে সাহায্য করে।
যেসব কাজ নামাযে খুশু সৃষ্টিতে বাধা দেয়ঃ
১. নামাযের মধ্যে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে খেলা করা বা নাড়াচাড়া করা।
হাদীস- একবার নবী (সা:) এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে মুখের দাড়ী নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন-
لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هٰذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُه
"যদি এ লোকটির দিলে খুশু থাকত তাহলে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরও খুশু থাকত। (বায়হাকী)
২. নামাযে এদিক ওদিক তাকালে নামাযে একগ্রতা বা খুশু নষ্ট হয়ে যায়। এ সম্পর্কে নবী (সা:) বলেন- এটা নামাযীর (মনোযোগের) উপর শয়তানের থাবা।
৩. নামাযে ছাদ বা আকাশের দিকে তাকালে নামাযের খুশু নষ্ট হয়ে যায়। নবী করিম (সা:) বলেন-
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ
'লোকেরা যেন নামাযে তাদের চোখকে আকাশমুখী না করে। (কেননা তাদের চোখ) তাদের দিকে ফিরে নাও আসতে পারে।'(বুখারী)
৪. নামাযে হেলা-ফেলা করা ও নানাদিকে ঝুকে পড়া।
৫. সিজদায় যাবার সময় বসার জায়গা বা সিজদার জায়গা বার বার পরিস্কার করলে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। (তবে ক্ষতিকারক হলে একবার সরানো যাবে)
মহানবী (সা:) বলেন-
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى
'কোন ব্যক্তি যেন নামাযের অবস্থায় (সিজদার জায়গা হতে) কংকর না সরায়। কেননা আল্লাহর রহমত নামাযী ব্যক্তির উপর প্রসারিত হয়।' (আহমেদ, নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ)
৬. একটানা গর্দান খাড়া করে দাড়ানো এবং খুব কর্কশ স্বরে কোরআন পড়া কিংবা গীতের স্বরে কুরআন পাঠ।
৭. জোরে জোরে হাই এবং ঢেকুর তোলা। ইচ্ছা করে গলা খেকরা বা কাশি দিলে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়।
রাসূল (সা:) বলেন- নামাযে হাই ওঠে শয়তানের প্রভাব থেকে যদি কারো হাই ওঠে তার উচিত সে যেন সাধ্যমতো হাই প্রতিরোধ করে। (মুসলিম, তিরমিযী)
৮. তাড়াহুড়ো করে নামায আদায় করা। নামাযে রুকু সিজদা কিয়াম সঠিক ভাবে আদায় না করা।

নবী (সা:) বলেন-
مَاتَرَوْنَفِيالسَّارِبِوَالسَّارِقِوَالزَّانِيْوَذٰلِكَقَبْلَاَنْيَنْزِلَفِيْهِمْقَالُوْااَللّٰهوَرَسُوْلُهٗأَعْلَمُقَالَهُنَّفَوَاحِشُوَفِيْهِنَّعُقُوْبَةٌوَأَسْوَأُالسَّرَقَةِالَّذِيْيَسْرِقُصَلَاتَهقَالُوْاوَكَيْفَيَسْرِقُ صَلَاتَهيَارَسُوْلَاللّٰهِقَالَلَايُتِمَّرُكُوْعَهَاوَلَاسُجُوْدَهَا
'মদখোর, ব্যভিচারী ও চুরি করা কবীরা গুনাহ এবং তার সাজাও খুব তবে সবচেয়ে জঘন্য চুরি হলো সেই যে ব্যক্তি নামাযে চুরি করে। সাহাবীরা বললেন নামাযে কিভাবে চুরি হয়। রাসূল (সা:) বললেন নামাযে রুকু ও সিজদা ঠিকমতো না করা।' (মালেক, আহমেদ, দারেমী)
৯. নামাযীর সামনে পর্দায় কোন ছবি থাকলে নামাযে খুশু বা একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়।

নামাযে খুশু সৃষ্টির জন্য যা করতে হবেঃ
১. আল্লাহ তায়ালাকে সবসময় হাজির নাজির জানা।
হাদীসে জীবরীলে ইহসান সম্পর্কে মহানবী (সা:) কে রাসূল (সা:) প্রশ্ন করলে তার প্রতিউত্তরে তিনি বলেন,
أَنْتَعْبُدَاللّٰهَكَأَنَّكَتَرَاهُفَإِنْلَمْتَكُنْتَرَاهُ،فَإِنَّهُيَرَاكَ
"তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে (নামাযে) যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তোমার পক্ষে এটা সম্ভব না হয়। তবে তুমি অবশ্যই মনে করে নেবে যে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।"
২. নামাযে পঠিত দোয়া, কালাম অন্তর থেকে পড়া।
৩. নামাযে খুশু সৃষ্টি করার জন্য নামাযীর দৃষ্টি সিজদার দিকে থাকবে।
৪. নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য নামাযে যা পড়া হয় তার অর্থ জানা।

দ্বিতীয় গুনঃ
'যারা বেহুদা কাজ ও কথা থেকে দুরে থাকে।'
وَالَّذِينَهُمْعَنِاللَّغْوِمُعْرِضُونَ
اللَّغْوُ বলা হয় এমন প্রতিটি কাজ এবং কথাকে যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন ও নিস্ফল। যেসব কথা এবং কাজের কোনই ফল নেই।
اللَّغْوُ "এর অর্থ উচ্চস্তরের গুনাহ যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই বরং ক্ষতি বিদ্যমান।
রাসূল (সা:) বলেন-
مِنْحُسْنِإِسْلَامِالْمَرْءِتَرْكُهمَالَايَعْنِيْهِ
"মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে তখন ইসলাম সৌন্দর্যমন্ডিত হয়।(তিরমিজি)।" আল্লাহ বলেন-
وَإِذَامَرُّوابِاللَّغْوِمَرُّواكِرَامًا
অর্থ্যাৎ- "যখন এমন কোন জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়।" (ফুরকান-৭২)

- মুমিনের মাঝে সবসময় দায়িত্বানুভুতি জাগ্রত থাকে।
- তার কাছে দুনিয়াটা পরীক্ষাগার। পরীক্ষার হলে নির্দিষ্ট সময়ে সবকিছু করতে হয়।
- ফুটবল, ক্রিকেট খেলা দেখায় পার্থিব বা আখেরাতের কোন কল্যাণ নেই।

তৃতীয় গুনঃ
"যারা যাকাত বা পরিশুদ্ধির ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়।
وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِفَاعِلُونَ
যাকাত দেয়া বা যাকাতের পথে কর্মতৎপর সক্রিয় হওয়ার মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বিকট পার্থক্য বিদ্যমান।
মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে কুরআনের
বিশেষ ধরনের অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটা বলার পেছনে তাৎপর্য আরবী ভাষায় যাকাত শব্দের দুটি অর্থ বিদ্যমান
১। বিত্রতা, পরিশুদ্ধতা, পরিশুদ্ধি।
২।বিকাশ সাধন কোন জিনিসের সাধনে যেসব জিনিস প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায় সেসব দুর করা এবং তার মৌলবস্তুকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করা। এই দুটি ধারনা মিলিয়ে যাকাতের পরিপূর্ণ ধারনা সৃষ্টি হয়। তারপর এই শব্দটি, ইসলামী পরিভাষায় ব্যবহৃত হলে এর দু'টি অর্থ প্রকাশ পায়-
১) এমন সম্পদ যা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়।
২) পরিশুদ্ধ করার মূল কাজটি-
যদি বলা হয় তবে এর অর্থ হবে তারা সম্পদ পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পদের একটি অংশ নেয়।
কিন্তু যদি বলা হয় তবে তার অর্থ হবে তারা পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা তাযকিয়ার কাজ করছে। এ অবস্থায় ব্যাপারটি শুধুমাত্র আর্থিক যাকাত আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং এর অর্থ ব্যাপক হবে। যেমনঃ

- আত্মার পরিশুদ্ধি
- চরিত্রের পরিশুদ্ধি
- জীবনের পরিশুদ্ধি

- তার পারিবারিক পরিশুদ্ধি
- নিজের, সমাজ এবং রাষ্ট্রের পরিশুদ্ধি।
- অর্থের পরিশুদ্ধি।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি দিকের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত এর ব্যপ্তি ছড়িয়ে পড়বে। এছাড়া এর অর্থ কেবল নিজেরই জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। না বরং নিজের চারপাশের জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়বে।
কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ বলেন,
قَدْأَفْلَحَمَنْتَزَكَّى (১৪) وَذَكَرَاسْمَرَبِّهِفَصَلَّى (১৫)
অর্থ্যাৎ ঃ "কল্যাণ ও সফলতা লাভ করল সে, যে পবিত্রতার কাজ করলো এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়লো।" (সুরা আ'লা:১৪,১৫)
আল্লাহ বলেন-
قَدْأَفْلَحَ مَنْزَكَّاهَا (৯) وَقَدْخَابَ مَنْدَسَّاهَا (১০)
"সফলকাম হলো সে, যে নিজের নফসকে পবিত্র বা তাযকিয়া করলো। আর ব্যর্থ হলো সে যে নিজেকে কলুষিত করল।" (সুরা আশ শামস:৯,১০)
এ আয়াতে গোটা সমাজ জীবনের কথা বলা হয়েছে।

চতুর্থ গুণঃ
'যারা লজ্জাস্থানের হেফাজত করেন।'
وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
তবে তাদের স্ত্রীদের এবং মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না করলে তারা তিরস্কৃত হবে না। তবে কেউ যদি এদের ছাড়া অন্য কাউকে কামনা তবে এক্ষেত্রে তারা হবে সীমালংঘনকারী।
লজ্জাস্থান হেফাজত করার দুটি অর্থ হতে পারে।
১) নিজের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা।
২) যৌন শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাগামহীন হয় না।
এটি প্রাসঙ্গিক বাক্য। "লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।" বাক্য থেকে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করার জন্য।
লজ্জাস্থানের সাধারণ হুকুম থেকে দু'ধরনের লোককে বাদ দেয়া হয়েছে।
১. স্ত্রী অর্থাৎ যেসব নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে।
২. দাসী অথাৎ এমন বাদী যার উপর মানুষের মালিকানা অধিকার আছে। সুতরাং মালিকানাধীন দাসীদের যৌনসম্পর্ক বৈধ এবং বৈধতার ভিত্তি বিয়ে নয়। কারণ এখানে স্ত্রী ও দাসী আলাদা ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
এ বাক্যটি উপরোক্ত দুটি পন্থা ছাড়া কামনা চরিতার্থ করার যাবতীয় পথ অবৈধ করেছে। হারাম উপায়গুলি-
১. যিনা যেমন হারাম তেমনি হারাম নারীকে বিয়ে করাও যিনার মধ্যে গণ্য।
২. স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েজ-নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস হারাম।
৩. পুরুষ, বালক বা জীবজন্তুর সাথে কামনা চরিতার্থ করা হারাম।
৪. অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মতে হস্তমৈথুন এর অন্তর্ভুক্ত।
৫. এছাড়া যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোন অশ্লীল-বই পড়া, ছবি দেখা।
উপরোক্ত সবকিছুই সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য হবে।

৫ম ও ৬ষ্ঠ গুনঃ
'যারা তাদের আমানতসমূহ এবং ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।'
وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْوَعَهْدِهِمْرَاعُونَ

আমানত প্রত্যাপর্ন করাঃ
আমানত শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আভিধানিক অর্থে এমন একটি বিষয় শামিল যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির উপর আস্থা রাখা যায় ও ভরসা করা যায়। বিধায় আমানত শব্দটি বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত।
দু'ধরনের আমানত সংক্রান্ত কথা-
১. হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক্
২. হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক।
১) হক্কুল্লাহঃ
-শরীয়ত আরোপিত সকল ফরজ ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরুহ বিষয় থেকে দুরে থাকা।

-মানুষ আল্লাহর খলিফা। খিলাফতের দায়িত্ব পালনের আমানত রক্ষা করা।

২) হক্কুল ইবাদঃ

১. কোন ব্যক্তি বা সংগঠন কর্তৃক আরোপিত ধনসম্পদের আমানত।
২. গোপন কথার আমানত
৩. মজুর, শ্রমিক ও চাকরীজীবীদের জন্য যে কার্য সময় নির্ধারন করে দেয়া হয় তা পালন
৪. দায় দায়িত্বের আমানত। সংগঠন, ব্যক্তি, রাষ্ট্র, পরিবার পরিচালক হিসেবে।
৫. গণতান্ত্রিক দেশে ভোটারদের ভোট আমানত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:
إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُكُمْأَ نْتُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِإِلَىأَهْلِهَا
আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদরে হাতে ফরেত দবোর নর্দিশে দচ্ছিনে। (সূরা নিসা:৫৮)
রাসুল (সা:) বলেন:
إِيْمَانَلِمَنْلَاأَمَانَةَلَهلَا
"তার ঈমান নেই যার আমানতদারী নেই।" (আহমাদ)
তাছাড়া মোনাফেকের যে চারটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ১) 'কোন আমানত তার কাছে সোপর্দ করা হলে সে তার খেয়ানত করে।' (বুখারী)
وَإِذَااؤْتُمِنَخَانَ.

অঙ্গীকার পূর্ণ করাঃ
অঙ্গীকার বলতে প্রথমত, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বুঝায় যা কোন ব্যাপারে উভয়পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরুপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরজ।
দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয় অর্থ্যাৎ এক তরফাভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেয়ার বা কোন কাজ করে দেয়ার অঙ্গীকার করা।
হাদীসে আছে, "ওয়াদাও এক প্রকার কসম"

সপ্তম গুনঃ
"যারা তাদের নামায সমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে।"
وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
এখানে পাঁচওয়াক্ত নামায মুস্তাহাব বা আউয়াল ওয়াক্তে যথাযথভাবে পাবন্দী সহকারে আদায় করা বুঝায়।
এখানে নামায সমূহের সংরক্ষণ বলতে নামাযের বাইরের এবং ভেতরের যাবতীয় নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালন করা। অর্থ্যাৎ আরকান-আহকাম পালন।
১। শরীর, পোশাক, পরিচ্ছদ পাক পবিত্র।
২। সময়মত নামায।
৩। অযু ঠিকভাবে করে নামায আদায়।
৪। জামায়াতের সাথে নামায।
৫। শুদ্ধ, ধীরস্থিরভাবে দোয়া কালাম পাঠ করা।
৬। নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নামাযের হেফাজত করা।
৭। এহসানের সাথে নামায আদায়।
কোরআনে এসেছে:
إِنَّالصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِالْفَحْشَاءِوَ الْمُنْكَرِ
"নামায নিশ্চয়ই মানুষকে অশ্লীল, অপকর্ম থেকে বিরত রাখে।"(সূরা আনকাবুত:৪৫)
الَّذِينَ يَرِثُونَالْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
অর্থঃ তারাই (এসবগুনের অধিকারীগণই) উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা উত্তরাধিকার হিসেবে ফেরদাউস পাবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে।এখানে উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে এজন্য যে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ যেমন উত্তরাধিকারদের নিশ্চিত প্রাপ্য। এবং গুণের অধিকারীদেরও জান্নাতে প্রবেশ সুনিশ্চিত।
সফলকাম ব্যক্তিদের গুনাবলী পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে পূর্ণাঙ্গ সফল জান্নাতী ব্যক্তি।

الْفِرْدَوْس শব্দটি এমন একটি বাগানের জন্য বলা হয়ে থাকে যার চারিদিকে পাচিল দেয়া থাকে। বাগানটি বিস্তৃত হয়। মানুষের আবাস গৃহের সাথে সংযুক্ত হয় এবং সব ধরনের ফল বিশেষ করে আঙ্গুর পাওয়া যায়। কোন কোন ভাষায় এর অর্থের মধ্যে এ কথাও বোঝায় যে এখানে বাছাই করা গৃহপালিত পশু পাখি পাওয়া যায়।
কুরআনে বিভিন্ন সমষ্টিকে ফিরদাউস বলা হয়েছে।
"তাদের আপ্যায়নের জন্য ফিরদৌসের বাগানগুলি আছে।"
এ থেকে মনের মধ্যে এ ধারনা জন্মে যে ফিরদৌস একটা বড় জায়গা, যেখানে অসংখ্য বাগ বাগিচা উদ্যান রয়েছে।

শিক্ষাঃ
১। সফলতা নিছক ঈমানের ঘোষনা অথবা নিছক সৎ চরিত্র ও সৎকাজের ফল নয়। বরং উভয়ের সম্মি লনের ফল।
২। নিছক পার্থিব ও বৈষয়িক প্রাচুর্য ও সম্পদশালীতা এবং সীমিত সাফল্যের নাম সফলতা নয়। আখেরাতের স্থায়ী সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য।
৩। খুশু খুযুর সাথে নামায আদায়।
৪। বাজে কথাও কাজে সময় নষ্ট না করা
৫। সর্ববস্থায় নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে সচেষ্ট হওয়া।
৬। অবৈধ পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার চিন্তাও না করা।
৭। আমানতের হেফাজত করা এবং অঙ্গীকার বা ওয়াদা যথাযথভাবে পালন করা।
৮। নামাযে পাবন্দী করা এবং প্রত্যেক নামায মোস্তাহব ওয়াক্তে আদায় করা।

Source: https://islamiclantern.blogspot.com/2015/01/blog-post_30.html

বই নোটঃ 📖#রুকনিয়াতের আসল চেতনা

লেখক:অধ্যাপক গোলাম আযম;
প্রকাশক: আবু তাহের মুহাম্ম দ মাছুম। বাংলাদেশ জামায়াতের ইসলামী।
#লেখক পরিচিতিঃ
ইসলামী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ছিলেন ১৯৬৯-২০০০ সাল পর্যন্ত।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- বি এ,এম এ(রাষ্ট্রবিজ্ঞান) এবং কারমাইকেল কলেজে অধ্যপনা করেন। "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" আন্দোলনের একজন অগ্রগামী সৈনিক ছিলেন। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত জি এস ছিলেন, এবং তমুদ্দিন মজলিশ এর পক্ষ থেকে রাষ্ট্র ভাষা বাংলা করার দাবীতে স্মারকলিপি পেশ করেন। দ্বীন প্রচারের জন্য অসংখ্য বই লিখেছেন। তিনি ২৩ অক্টোবর ২০১৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

#প্রকাশকের কথাঃ
ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন আম্বিয়ায়ে কেরামদের পরিচালিত আন্দোলনকে অনুসরণ করেই চলেছে।
মানবিক দুর্বলতার কারণে ব্যক্তির নিষ্ক্রিয়তা থেকে উত্তরণের দিকনির্দেশনা মূলক বই এটি।
কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মে লন ১৯৯৭ সালের ২৫-২৭ ডিসেম্বর জামেয়া ইসলামিয়া (তামিরুল মিল্লাত) টঙ্গীতে- অধ্যাপক গোলাম আযম তৎকালীন আমীর জা.ই.বা প্রদত্ত ভাষন।

#ইসলামী আন্দোলনের মর্মকথাঃ
মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামষ্টিক জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে বিধান রচনা করেছেন, রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে তাই পাঠিয়েছেন। এই বিধানসমূহ রাসূল (সাঃ) ও তার প্রতি যারা ঈমান আনে তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে চালু করার দায়িত্ব দিয়েছেন। যাকে খিলাফতের দায়িত্ব বলা হয়।আল্লাহর পক্ষ তার বিধানকে কায়েম করার চেষ্টাই হলো খলিফার কাজ। যুগে যুগে নবী রাসূলগণ এ কাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ/ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা হলো নবী-রাসূলগণ।

#আল্লাহর বিধান অন্য সমাজ ব্যবস্থার অধীন হতে পারেনাঃ
আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বাধ্য করেননি তার বিধান মেনে চলতে। ফলে সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজের মনগড়া বিধান চালু করে। কারণ বিধান শূন্য কোন সমাজ চলতে পারে না।যখনই নবীগণ দেশবাসীকে আল্লাহর বিধান কবুলের দাওয়াত দেন,তখন এই সুবিধাবাদী মহল বিরোধিতা করেছে।হক ও বাতিলের এই সংঘর্ষের নামই ইসলামী আন্দোলন।আইন চালু করতে গিয়ে স্বার্থবাদীদের কে পরাস্ত করতে পারলেই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব।

#জামায়াতেইসলামীরআন্দোলনঃ

- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নবী রাসূলগনের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহের গতি অনুসরণ করেই চলছে।
- ইসলামী সমাজকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাসূল সাঃ একদল লোক তৈরি করেন। যারা তাদের জীবনে ইসলামী বিধি বিধান মেনে চলতে প্রস্তুত।
- সেই ভাবে জামায়াত ও বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে লোক তৈরির চেষ্টা করছে।
- যারা জামায়াতের দাওয়াত কবুল করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে এক পর্যায়ে রুকুনিয়াতের শপথ নেন।শপথের সময় আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যে সব ওয়াদা করেন তা সঠিকভাবে পালন করলে মান বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক।

#রুকনদের মান কমে যাওয়ার কারণঃ

রুকনিয়াতের মান কমার আসল কারণ ২ টি।

১. দুনিয়াবি দাবীর প্রাধান্যঃবিভিন্ন দূর্বলতার কারণে এটি ঘটে। কিন্তু দ্বীনই মুমিনের জীবনের আসল লক্ষ্য। তাই বেঁচে থাকব দ্বীনের দাবী পূরনের জন্য। আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন এবং সুখ সুবিধা বৃদ্ধি যখন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়,আর দ্বীনের দাবী পিছনে পড়ে থাকে ঠিক তখন রুকনিয়াতের মান কমাই স্বাভাবিক।

২. দারিদ্রতা জান মালের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষাঃ সূরা বাকারাঃ ১৫৫

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِیْنَ ﴿۱۵۵﴾ - আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।

দুনিয়ার জীবনের বিপদা-আপদ, দুঃখ-কষ্ট মুসিবতের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। তবে সকলের পরীক্ষা এক হয় না। যার দুর্বলতা যেদিকে তার পরীক্ষাও সেদিকেই হয়। সচেতন রুকন তা টের পেয়ে সাবধান হয়ে যান। আর আল্লাহর দরবারে ধরণা দেন,যাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন। আর অসচেতন রুকনগন মুসীবতকে দ্বীনের কাজ না করার অজুহাত মনে করে। ফলে রুকনিয়াতের নিম্নতম মানও রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে ইস্তফা দেন বা বাতিল করা হয়।

#পরীক্ষা নেওয়ার কারণঃ

আল্লাহর পক্ষ থেকে কেন পরীক্ষা করা হয়ঃ

সূরা আন নূরঃ৫৫

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَ لَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِیْنَهُمُ الَّذِی ارْتَضٰی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ یَعْبُدُوْنَنِیْ لَا یُشْرِكُوْنَ بِیْ شَیْـًٔا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۵﴾

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক।

-খিলাফতের দায়িত্ব প্রদানের পূর্বে যোগ্যতা যাচাই করার জন্য আল্লাহ এ পরীক্ষা নেন।
-মদীনায় ইসলামী সরকার গঠন করলেও রাসূল সাঃ সাহাবীগন কেও বহু কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাছাই করেছেন।

#পরীক্ষার মাধ্যমে রুকনিয়াতের মান বাড়েঃ

পরীক্ষায় যারা টিকে তাঁরাই আন্দোলনের যোগ্য বিবেচিত হয়। যারা ছাটাই হয় তাঁরা অযোগ্য। রুকনিয়াত মূলতবী করে ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ দেয়া হয়। সংশোধন না হলে ইস্তফা দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয় অথবা বাতিল করা হয়।
ত্রুটি মুক্ত থাকার গুরুত্ব উপলব্ধির তাগিদ এভাবে দেয়া হয়। আমানতদারীর দাবী পূরণে অক্ষম হলেও ছাটাই করা হয়।

#রুকনিয়াতের আসল চেতনাঃ

রুকনিয়াতের আসল চেতনার অভাবেই রুকনিয়াতের মান কমে যায়।
আসল চেতনা ৫ টিঃ

- দ্বীনি যিন্দেগী তরক্কীর পথে রুকনিয়াতের স্থান কোথায়।
- মান কমার মূল কারণ সম্পর্কে সতর্কতা।
- আল্লাহর বাছাই ও ছাটাই নীতি সম্পর্কে সাবধানতা।
- জনগণের নিকট সত্যের সাক্ষ্য বহনের দায়িত্ব।

- আল্লাহর ব্যাংকে জমা বৃদ্ধির ধান্দা।

#দ্বীনি যিন্দেগী তরক্কীর পথে রুকনিয়াতের স্থান কোথায়ঃ

ফরজ,ওয়াজিব মানা ও হারাম থেকে বেঁচে থাকা মুমিনের সর্বনিম্ন স্তর এটি। যা রুকন হওয়ার শর্ত।সুতরাং রুকনের মানকে বড়জোড় কামিল মুমিনের নিম্নতম মান বলা যায়। অনেকের নিকট রুকন হওয়া অনেক কঠিন বিষয় হলেও প্রকৃত পক্ষে তা কামিল মুমিনের সর্বনিম্ন স্তর মাত্র।

- দ্বীনি জিন্দেগীর তরক্কী ও উন্নতিকে একটি সিঁড়ির সাথে তুলনা করলে এ সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ হলো সাহাবায়ে কেরামদের মান। এ দীর্ঘ সিঁড়ির প্রথম ধাপে পৌঁছে দেয় জামায়াত রুকন হওয়ায় মাধ্যমেদ্বীনি জিন্দেগীকে উন্নত করার সাধনা রুকনেরই দায়িত্ব।

- আত্মগঠনের জন্য ইলম বৃদ্ধি করা,ইবাদতের অভ্যাস করা, ওয়াদা করা, সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর দরবারে ধরনা দেয়া, নিজের মনের তাগিদে যারা করে তাদের দ্বীনি জিন্দেগীর উন্নতি হওয়াই স্বাভাবিক।
- ব্যক্তি গঠনের উদ্দেশ্যে মানুষের নিকট দাওয়াত পৌঁছানো ও যারা কবুল করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দান করলে আল্লাহর সন্তুষ্ট আশা করা যায়।
- আল্লাহ তাদের আনসারুল্লাহ মর্যাদা দেন। নিষ্ঠার সাথে দু-দফা কাজ করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

#মান কমার মূল কারণ সম্পর্কে-সতর্কতাঃ

আত্ম সমালোচনার সময় খেয়ালে আনতে হবে যে , আমার যাবতীয় কর্মকান্ডে দুনিয়ার জীবনের চেয়ে দ্বীনকে প্রাধান্য দিচ্ছি কিনা। পরীক্ষার সম্মুখীন হলে দায়িত্বশীল, দ্বীনি ভাইদের জানিয়ে দোয়া চাইতে হবে। পরীক্ষায় সবর করতে হবে, আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। ইখলাসের সাথে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করতে হবে।

#আল্লাহর বাছাই ও ছাটাই নীতি সম্পর্কে সাবধানতাঃ

- মৃত্যু পর্যন্ত হেদায়েতের পথে টিকে থাকার জন্য চেষ্টা ও দোয়া করতে হবে। যখন কাউকে দ্বীনের পথে চলার তাওফিক দেন তখন তাকে বুঝতে হবে যে আল্লাহ তাঁকে বাছাই করেছেন।
- পরীক্ষায় ফেল করে ধৈর্য ও সাহসের অভাবে দ্বীনের পথে চলার হিম্মত হারায়। তখন বুঝতে হবে সে ছাঁটাই হয়ে গেছে।

সূরা হজ্জঃ শেষ আয়াত-

وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰ
ذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٧٨

আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও। অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

সূরা নিসাঃআয়াত ৫৯

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ
خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।

যারা ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা বিপদকে অগ্রাহ্য করে ইসলামী আন্দোলনের পথে মজবুত হয় টিকে থাকে তারা আল্লাহর বাছাইয়ে গন্য।যারা দুর্বলতার শিকার তারা ছাঁটাইয়ের অন্তর্ভুক্ত। বাছাইয়ের চেতনা জাগ্রত থাকলে এই গৌরব থেকে বঞ্চিত হবে না নিশ্চয়। তাই ছাটাই থেকে হেফাজতের দোয়া করতে হবে।

#জনগণের নিকট সত্যের সাক্ষ্য বহনের দায়িত্বঃ

কুরআনের বিভিন্ন সূরাতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল আল্লাহর বান্দাদের যে সব গুনের বিবরণ দেয়া হয়েছে এর দ্বারা এক দিকে সর্বসাধারনকে চিন্তার আহবান করা হয়েছে। যারা রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে এমন গুণাবলীর অধিকারী হয়েছে তাঁদের প্রশংসা করতে বাধ্য তোমরা।
মানবিক গুণাবলীর অধিকারীদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক। রুকনদের মান এ পর্যায়ে পৌঁছালে জনগণের আশা,আস্থার সঞ্চার হবে যে, জামায়াতে ইসলামীর হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিলে তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত।

#আল্লাহর ব্যাংকে জমা বৃদ্ধির ধান্দাঃ

- আল্লাহর ব্যাংকে যা জমা হবে সে টুকু শুধু তারই। এ জন্য রুকনদের ধান্দা হবে জমার পরিমাণ বাড়ানো। ইয়ানত ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর পথে দিতে হবে যাতে কুরবানির অনুভূতি জাগ্রত হয়।
- আল্লাহর জন্য খরচ করলে আল্লাহ বরকত দেবেন। বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এই অনুভূতি জাগ্রত রাখা।

 # চেতনার সুফলঃ

উপরের এই ৫ টি চেতনা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আগানো সহজ হবে। এ তরক্কীর শেষ নেই। রোকন এর দায়িত্ব নিজ চেষ্টায় অবিরাম উন্নত করার সাধনা করা। অনেক লোককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। উদাহরণ : ইঞ্জিন ও বগি।
চেতনা জাগ্রত থাকলে উভয় দায়িত্বই যোগ্যতার সাথে পালন করা সম্ভব।

#কর্মীদের জন্য আদর্শ হতে হবেঃ

রুকনদের মান উন্নত হলে তারা হবে কর্মীদের আদর্শ। অন্যথায় কর্মীদের অগ্রগতির পথে বাধা বলে গন্য হবে।রকন সংগঠনের সম্পদে পরিনত হলেই আন্দোলনের অগ্রগতি সম্ভব। রুকনিয়াতেরমান সম্পর্কে সচেতন থাকলেই সংগঠনের জন্য সময়,শ্রম ও অর্থব্যয় যথার্থ ভাবে সফল হবে।

 # চেতনার অভাবঃ

জামায়াতে ইসলামীতে রোকন হওয়ার জন্য দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। ফলে কেউ আবেগের বশবর্তি হয়ে নয় বরং স্বজ্ঞানে চেষ্টার মাধ্যমে রোকন হতে হয়।এ অব্যাহতি চাওয়ার অর্থ হল এর দায়িত্ববোধ, মর্যাদা, চেতনাবোধ থেকে বঞ্চিত।আবার আল্লাহর পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে তারা ছাঁটাই হন। ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনের জন্য এই সংগঠনে যোগদান করে কিন্তু যদি কেউ এই কাজের জন্য আরও উন্নত সংগঠনে যোগদানের জন্য পদত্যাগ করলে তা দোষের না হলেও ব্যক্তিগত দুর্বলতা থেকে সংগঠন ত্যাগ করা হাদিসের মত অনুযায়ী তিনি ইসলামের রশি গলা থেকে ছুড়ে ফেলেন।

#আল্লাহর দরবারে ধরনাঃ

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী আমরা দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের শরিক আছি। তাই আমাদের শুকরিয়া আদায় করতে হবে, আর দোয়া করতে হবে এই পথে অবিচল থাকার জন্য।

সংগঠন সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত

আলে-ইমরান-১০৩,

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেল। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

আলে-ইমরান-১০৪- আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহবান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।

আস সফ- ৪

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

বস্তুত আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা শিশাঢালা প্রাচীর।

তাহারাত সংক্রান্ত হাদীসঃ

باب وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلاَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ".

৪৩০। মুহাম্মাদ ইবনু রাফি (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুত্রে কয়েকটি হাদীস বর্ননা করেছেন। (তন্মধ্যে একটিতে তিনি বলেন) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারোর উযূ (ওজু/অজু/অযু) ভেঙ্গে গেলে তার সালাত (নামায/নামাজ) কবুল হয় না উযূ করার পূর্ব পর্যন্ত। (সহীহ মুসলিম- ইফাবা)

১. ত্বহারাত সংক্রান্ত মাসআলা

ক- ত্বহারাতের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয়:

ত্বহারাতের শাব্দিক অর্থ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা।

আর পরিভাষায় শরীরে বিদ্যমান যেসব অপবিত্রতার কারণে সালাত ও এ জাতীয় ইবাদাত পালন করা নিষিদ্ধ, তা দূর করাকে ত্বহারাত বলে।

পানি

খ- পানির প্রকারভেদ:

পানি তিন প্রকার।

প্রথম প্রকার পবিত্র পানি: আর তা হলো পানি তার সৃষ্টিগত স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকা। আর তা হলো যে পানি দ্বারা অপবিত্রতা ও শরীরের পবিত্র অঙ্গের আপতিত নাজাসাত দূর করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَاً لسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ [الانفال: ١١]

"এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন।" [সূরা আনফাল, আয়াত: ১১]

দ্বিতীয় প্রকার পবিত্র পানি: যে পানি নাজাসাত ছাড়াই রঙ বা স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এ ধরণের পানি নিজে পবিত্র; তবে এর যে কোনো একটি গুণাবলী পরিবর্তন হওয়ার কারণে এর দ্বারা অপবিত্রতা দূর করা যাবে না।

তৃতীয় প্রকার অপবিত্র পানি: যে পানি অল্প বা বেশি নাজাসাতের কারণে এর যে কোনো একটি গুণ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

অপবিত্র পানি পবিত্র হয়ে যাবে, তার পরিবর্তনের কারণ নিজে নিজে দূর হলে বা উক্ত পানি শুকিয়ে ফেললে অথবা এর সাথে এতটুকু পরিমাণ পানি মিশানো; যাতে পরিবর্তনের কারণ দূরীভূত হয়ে যায়।

যখন কোনো মুসলিম পানির অপবিত্রতা বা পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে তখন সে তার নিশ্চিত ধারণার ওপর ভিত্তি করে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর তা হলো, পবিত্র বস্তুসমূহের আসল হচ্ছে পবিত্র থাকা।

যখন কোনো পানি, যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় আর যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় না এমন কোনো পানির সাথে সন্দেহে নিপতিত করবে তখন তা বাদ দিয়ে তায়াম্মুম করবে।

যখন কোনো পবিত্র কাপড়, অপবিত্র বা হারাম কাপড়ে সাথে সন্দেহে নিপতিত করবে তখন ইয়াকীনের ওপর ভিত্তি করবে এবং সে কাপড় দ্বারা কেবল একটি সালাত আদায় করবে।

পবিত্রতার প্রকারভেদ

শরী'আতে পবিত্রতা দু'প্রকার। অপ্রকাশ্য বা আত্মিক এবং প্রকাশ্য বা বাহ্যিক পবিত্রতা। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছোট বড় নাপাকী ও নাজাসাত থেকে পবিত্র করাকে বাহ্যিক পবিত্রতা বলে। আর পাপ-পঙ্কিলতা থেকে অন্তর পবিত্র করাকে অপ্রকাশ্য বা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বলে।

প্রকাশ্য পবিত্রতাই ফিকহের বিষয়; যা সালাতে বাহ্যিকভাবে উদ্দেশ্য। এটি আবার দু'প্রকার: হাদাস (অদৃশ্যমান নাপাকী) থেকে পবিত্রতা ও খাবাস (দৃশ্যমান নাপাকী) থেকে পবিত্রতা। হাদাস থেকে পবিত্রতা তিনভাবে অর্জিত হয়: ১. বড় পবিত্রতা, তা গোসলের মাধ্যমে। ২. ছোট পবিত্রতা, তা অযুর মাধ্যমে। ৩. আর এ দু'টি ব্যবহার করতে অক্ষম তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করবে। অনুরূপভাবে খাবাস থেকে পবিত্রতাও তিনভাব অর্জিত হয়: গোসল, মাসেহ ও পানি ছিটানো।

পানির পাত্র সংক্রান্ত বিধি-বিধান

পানির পাত্রের পরিচয়:

ক. শাব্দিক পরিচিতি:

পানির পাত্রকে আরবীতে (الآنية) 'আনিয়া' বলা হয়। যে শব্দটি (إناء) 'ইনা' শব্দের বহুবচন। যার অর্থ আহার কিংবা পান-পাত্র। শব্দটির বহুবচনের বহুবচন হলো (أوان)। আরবী ভাষায় এর কাছাকাছি শব্দ হচ্ছে, (ظرف) 'যারফ' ও (ماعون) মা'উন।

ফকীহগণ শাব্দিক অর্থেই এটাকে ব্যবহার করেছেন।

খ- পাত্রের প্রকারভেদ:

সত্তাগত দিক থেকে পাত্র কয়েক প্রকার। যথাঃ

১- সোনা ও রূপার পাত্র।
২- রৌপ্যের প্রলেপযুক্ত পাত্র।
৩- কাঁচের পাত্র।
৪- মূল্যবান ধাতুর পাত্র।
৫- চামড়ার পাত্র।
৬- হাড়ের পাত্র।
৭- উপরে বর্ণিত পাত্র ব্যতীত অন্যান্য পাত্র। যেমন, চীনামাটির পাত্র, কাঠের পাত্র, পিতলের পাত্র ও সাধারণ পাত্র।

গ- পাত্রের শর'ঈ হুকুম:

সোনা, রূপা ও রৌপ্যের প্রলেপযুক্ত পাত্র ব্যতীত অন্যান্য সব পাত্র ব্যবহার করা বৈধ; চাই তা মূল্যবান হোক বা অল্প মূল্যের হোক। কেননা হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَتَشْرَبُوا فِيآنِيَةِالذَّهَبِوَالفِضَّةِ،وَلاَتَأْكُلُوا فِيصِحَافِهَا ،فَإِنَّهَالَهُمْفِيالدُّنْيَاوَلَنَافِيالآخِرَةِ ـ

"তোমরা সোনা ও রুপা পাত্রে পান করবে না। আর এসব পাত্রে খানা খাবে না। এগুলো দুনিয়াতে তাদের (অমুসলিমের) জন্য আর আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে।"[১]

যে সব পাত্র ব্যবহার করা হারাম তা অন্যান্য উদ্দেশ্যে গ্রহণ করাও হারাম। যেমন, বাদ্যযন্ত্র গানের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা। নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান। কেননা হাদীসটি সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

তবে এটা জানা আবশ্যক যে, সন্দেহের কারণে কোনো পাত্র অপবিত্র হবে না; যতক্ষণ নিশ্চিতভাবে অপবিত্র হওয়া জানা না যাবে। কেননা মূল হলো পবিত্র হওয়া।

ঘ- অমুসলিমের পাত্র:

অমুসলিমদের পাত্র বলতে বুঝানো হচ্ছেঃ

১- আহলে কিতাবীদের পাত্র।
২- মুশরিকদের পাত্র।

এসব পাত্রের শর'ঈ হুকুম হলো এগুলো অপবিত্র হওয়া নিশ্চিত না হলে তা ব্যবহার করা জায়েয। কেননা মূল হলো পবিত্র হওয়া।

অমুসলিমের জামা কাপড় পবিত্র, যতক্ষণ তা অপবিত্র হওয়া নিশ্চিত না হয়।

যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া বৈধ সেসব মারা গেলে সেসবের মৃত চামড়া দাবাগাত (প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার উপযোগী) করলে তা পবিত্র বলে গণ্য হবে।

আর যেসব প্রাণীর জীবিত অবস্থায় কোনো অংশ বিচ্ছেদ করা হয়েছে তা মৃত-প্রাণীর মতোই অপবিত্র। তবে জীবিত অবস্থায় পশম, পালক, চুল ও লোম নেওয়া হলে তা পবিত্র।

খাবার ও পানীয় পাত্র ঢেকে রাখা সুন্নত। জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَأَوْكِسِقَاءَكَوَاذْكُرِاسْمَاللَّهِ،وَخَمِّرْإِنَاءَكَوَاذْكُرِاسْمَاللَّهِ،وَلَوْتَعْرُضُعَلَيْهِشَيْئًا.

"তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ বন্ধ রাখো এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখো এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। সামান্য কিছু দিয়ে হলেও তার উপর দিয়ে রেখে দাও।"[২]

[১] সহীহ বুখারী, আল-আত'ঈমা, হাদীস নং ৫১১০; সহীহ মুসলিম, লিবাস ওয়ায-যিনা, হাদীস নং ২০৬৭; তিরমিযী, আশরিবা, হাদীস নং ১৮৭৮; নাসাঈ, আয-যিনা, হাদীস নং ৫৩০১; আবু দাউদ, আল-আশরিবা, হাদীস নং ৩৭২৩; ইবন মাজাহ, আশরিবা, হাদীস নং ৩৪১৪; আহমদ, ৫/৩৯৭; আদ-দারেমী, আল-আশরিবা, হাদীস নং ২১৩০।

[২] সহীহ বুখারী, বাদউল খালক, হাদীস নং ৩১০৬; সহীহ মুসলিম, আল-আশরিবা, হাদীস নং ২০১২; তিরমিযী, আল-আত'ঈমা, হাদীস নং ১৮১২; আবু দাউদ, আল-আশরিবা, হাদীস নং ৩৭৩১; আহমদ, ৩/৩০৬; মালেক, আল-জামে', হাদীস নং ১৭২৭।

ইস্তিঞ্জা ও পেশাব পায়খানার আদবসমূহ

ইস্তিঞ্জা: ইস্তিঞ্জা হলো পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পানি দ্বারা দূর করা।

ইস্তিজমার: আর ইস্তিজমার হলো পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পাথর বা কাগজ বা অনুরূপ জিনিস দ্বারা দূর করা।

পেশাব পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং এ দো'আ পড়া,

بسمالله،أَعُوذُباللهِمِنَالْخُبُثِوَالْخَبَائِثِ

বিসমিল্লাহ, আমি মন্দকাজ ও শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি" ।[১]

আর বের হওয়ার সময় ডান পা আগে দিয়ে বের হওয়া এবং এ দো'আ পড়া,

غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُلِلَّهِالَّذِيأَذْهَبَعَنِّيالْأَذَىوَعَافَانِي

" হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বস্তি দান করেছেন" ।[২]

- পেশাব-পায়খানার সময় বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসা মুস্তাহাব, তবে খালি জায়গায় পেশাব-পায়খানা করলে মানুষের দৃষ্টির বাহিরে নির্জন স্থানে বসা। পেশাব করার সময় নরম স্থান নির্বাচন করা, যাতে পেশাবের ছিটা থেকে পবিত্র থাকা যায়।
- অতি প্রয়োজন ছাড়া এমন কোনো কিছু সাথে নেওয়া মাকরূহ যাতে আল্লাহর নাম রয়েছে। তাছাড়া জমিনের কাছাকাছি না হওয়ার আগে কাপড় তোলা, কথা বলা, গর্তে পেশাব করা, ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা এবং ডান হাত দিয়ে ঢিলা ব্যবহার করা মাকরূহ।
- উন্মুক্ত স্থানে পেশাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ ফিরিয়ে বসা হারাম, আর ঘরের মধ্যে বসা জায়েয, তবে না বসা উত্তম।
- চলাচলের রাস্তা, বসা ও বিশ্রামের জায়গায়, ফলদার ছায়াদার গাছ ইত্যাদির নিচে পেশাব-পায়খানা করা হারাম।
- পবিত্র পাথর দিয়ে তিনবার শৌচকর্ম করা মুস্তাহাব। এতে ভালোভাবে পবিত্র না হলে সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা যাবে। তবে বেজোড় সংখ্যা তিন বা পাঁচ বা ততোধিক বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা দ্বারা কাজটি শেষ করা সুন্নাত।
- হাড়, গোবর, খাদ্য ও সম্ানিত জিনিস দ্বারা ঢিলা করা হারাম। পানি, টিস্যু ও পাতা ইত্যাদি দিয়ে ঢিলা করা জায়েয। তবে শুধু পানি ব্যবহার করার চেয়ে পাথর ও পানি একত্রে ব্যবহার করা উত্তম।
- কাপড়ে অপবিত্রতা লাগলে তা পানি দিয়ে ধৌত করা ফরয। আর যদি অপবিত্র স্থান অজ্ঞাত থাকে তবে পুরো কাপড় পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে। বসে পেশাব করা সুন্নাত, তবে পেশাবের ছিটা থেকে নিরাপদ থাকলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ নয়।

[১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭৫।

[২] হাদীসের প্রথম অংশটুকু আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ৩০। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আর দ্বিতীয় অংশটুকু ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ৩০১। আলবানী রহ. হাদীসটিকে দ'য়ীফ বলেছেন।

স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ

ক- পরিচিতি: সরল পথ, সৃষ্টিগত স্বভাব। যেসব গুণাবলী মানুষের জীবনে থাকা অত্যাবশ্যকীয় সেগুলোকে স্বভাবজাত সুন্নাত বলে।

খ- স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ:

১- মিসওয়াক করা: এটা সব সময় করা সুন্নাত। মুখের পবিত্রতা ও রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মিসওয়াক করা হয়। অযু, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, মসজিদে ও গৃহে প্রবেশ, ঘুম থেকে জাগ্রত হলে ও মুখের গন্ধ পরিবর্তন হলে মিসওয়াক করার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

২- নাভির নিচের লোম কামানো, বগলের লোম উপড়ানো, নখ কাটা ও আঙ্গুলের গিরা ধৌত করা।

৩- মোচ কাটা, দাড়ি লম্বা করা ও ছেড়ে দেওয়া।

৪- মাথার চুলের সম্ান করা, এতে তেল দেওয়া এবং আঁচড়ানো। চুলে গোছা রাখা অথাৎ মাথার এক অংশ কামানো আর বাকী অংশ না কামানো মাকরূহে তাহরীমী; কেননা এতে স্বাভাবিক সৃষ্টিগত সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

৫- মেহেদী বা অনুরূপ উদ্ভিদ দিয়ে চুলের সাদা অংশ পরিবর্তন করা।

৬- মিসক বা অন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৭- খৎনা করা। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের ঢেকে থাকা চামড়া কর্তন করা যাতে এতে ময়লা ও পেশাব জমে থাকতে না পারে।আর মহিলাদের ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গের উপরিভাগে পুংলিঙ্গ প্রবেশদ্বারের চামড়ার কিছু অংশ কেটে ফেলা, এটা বিচির মতো বা মোরগের চূড়ার (বৌল) মতো। খৎনা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ এটি জানেন। খৎনা মূলত পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য করা হয়। এতে অনেক ফযীলত রয়েছে। পুরুষের জন্য খৎনা করা সুন্নাত আর নারীর জন্য এটা করা সম্ানজনক।

অযু

ক- অযুর পরিচিতি:শরী'আতের নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী পবিত্র পানি চার অঙ্গে ব্যবহার করা।

খ- অযুর ফযীলত:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস অযুর ফযীলত প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন,

مَامِنْكُمْمِنْأَحَدٍيَتَوَضَّأُفَيُسْبِغُالْوَضُوءَثُمَّيَقُولُ:

أَشْهَدُأَنْلَاإِلَهَإِلَّااللهُوَحْدَهُلَاشَرِيكَلَهُوَأَشْهَدُأَنَّمُحَمَّدًاعَبْدُهُوَرَسُولُهُإِلَّافُتِحَتْلَهُأَبْوَابُالْجَنَّةِالثَّمَانِيَةُيَدْخُلُمِنْأَيِّهَاشَاءَ

“ তোমাদের যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে অযু করে এ দো‘আ পাঠ করবে, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্ াদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল’ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।”[১]

অযুতে অপচয় না করে উত্তমরূপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করলে কিয়ামতের দিন অযুকারীর হাত-পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকা আবশ্যক করবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّأُمَّتِييُدْعَوْنَيَوْمَالقِيَامَةِغُرًّامُحَجَّلِينَمِنْآثَارِ الوُضُوءِ،فَمَنِاسْتَطَاعَمِنْكُمْأَنْيُطِيلَغُرَّتَهُفَلْيَفْعَلْ

“কিয়ামতের দিন আমার উম্ তকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, অযুর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল থাকবে উজ্জ্বল। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে।”[২]

গ- অযুর শর্তাবলী:অযুর শর্তাবলী দশটি। সেগুলো হলো:

১- ইসলাম।
২- জ্ঞান বা বিবেক।
৩- ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।
৪- নিয়ত করা এবং পবিত্রতা অর্জন শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিয়ত অবশিষ্ট থাকা।
৫- যেসব কারণে অযু ফরয হয় সেসব কারণ দূর হওয়া।
৬- ইস্তিঞ্জা করা (পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পানি দ্বারা দূর করা) ও ইস্তিজমার করা (পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পাথর বা পাতা বা অনুরূপ জিনিস দ্বারা দুর করা)।
৭- পানি পবিত্র হওয়া।
৮- পানি বৈধ হওয়া।
৯- চামড়ায় পানি পৌঁছতে বাধা থাকলে তা দূর করা।
১০- যে ব্যক্তির সর্বদা অপবিত্র হওয়ার সমস্যা থাকে তার ক্ষেত্রে ফরয সালাতের ওয়াক্ত হওয়া।

ঘ- অযু ফরয হওয়ার কারণ:

হাদাস বা সাধারণ অপবিত্রতা পাওয়া গেলে অযু ফরয হয়।

ঙ- অযুর ফরযসমূহ:অযুর ফরয ছয়টি:

১- মুখমণ্ডল ধৌত করা আর মুখ ও নাক মুখমণ্ডলেরই অংশ।
২- কনুইসহ দুহাত ধৌত করা।
৩- মাথা মাসেহ করা আর দু’কানও মাথারই অংশ।
৪- দু’পা ধৌত করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,﴿يَٰٓأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْإِذَا قُمۡتُمۡإِلَىٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْوُجُوهَكُمۡوَأَيۡدِيَكُمۡإِلَىٱلۡمَرَافِقِوَٱمۡسَحُواْبِرُءُوسِكُمۡوَأَرۡجُلَكُمۡإِلَىٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ٦﴾ [المائدة: ٦]

“ হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬]

৫- ধৌত অঙ্গের মধ্যে পরস্পর ক্রমবিন্যাস বজায় রাখা। কেননা আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন এবং দু অঙ্গ ধোয়ার মধ্যে একটি মাসেহ করার বিষয় উল্লেখ করেছেন। (যা ক্রমবিন্যাস আবশ্যক হওয়া বুঝায়)।

৬- অযু করার সময় এক অঙ্গ ধৌত করার সাথে সাথেই বিলম্ব না করে অন্য অঙ্গ ধৌত করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে করেছেন।

চ- অযুর সুন্নতসমূহ:অযুর সুন্নতসমূহের অন্যতম হলো:

১- মিসওয়াক করা।
২- হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।
৩- কুলি ও নাকে পানি দেওয়া।
৪- ঘন দাড়ি ও হাত-পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা।
৫- ডান দিক থেকে শুরু করা।
৬- দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ধৌত করা।

৭- কান ধোয়ার জন্য নতুন পানি গ্রহণ করা।
৮- অযুর পরে দো'আ পড়া।
৯- অযুর পরে দু'রাকাত সালাত আদায় করা।

ছ- অযুর মাকরূহসমূহ:অযুর মাকরূহসমূহের অন্যতম হলো:

১- অপবিত্রতা ছিটে অযুকারীর দিকে আসতে পারে এমন অপবিত্র স্থানে অযু করা।
২- অযুতে তিনবারের অধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তিনবার ধৌত করেছেন। তিনি বলেছেন, مَنْزَادَعَلَىهَذَافَقَدْأَسَاءَوَظَلَمَ
"অতঃপর যে ব্যক্তি এর অধিক করে সে অবশ্যই জুলুম ও অন্যায় করে।"[৩]
৩- পানি ব্যবহারে অপচয় করা। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ পানি দিয়ে অযু করেছেন। আর মুদ হলো এক মুঠো। তাছাড়া যেকোনো কিছুতে অপচয় করা নিষেধ।
৪- অযুতে এক বা একাধিক সুন্নত ছেড়ে দেওয়া; কেননা সুন্নত ছেড়ে দিলে সাওয়াব কমে যায়। তাই সুন্নতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিৎ, ছেড়ে দেওয়া অনুচিত।

জ- অযু ভঙ্গের কারণসমূহ:

অযু ভঙ্গের কারণ সাতটি, সেগুলো হলো:
১- পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া।
২- শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ থেকে কোনো কিছু বের হওয়া।
৩- পাগল, বেহুশ বা মাতাল ইত্যাদি কারণে জ্ঞানশূণ্য হওয়া।
৪- পুরুষ বা নারী কর্তৃক তাদের লজ্জাস্থান পর্দা ব্যতীত সরাসরি স্পর্শ করা।
৫- পুরুষ নারীকে বা নারী পুরুষকে কামভাবের সাথে স্পর্শ করা।
৬- উটের গোশত খাওয়া।৭- যেসব কারণে গোসল ফরয হয় সেসব কারণে অযুও ফরয হয়, যেমন ইসলাম গ্রহণ ও বীর্য বের হওয়া, তবে মারা গেলে শুধু গোসল ফরয হয়, অযু ফরয হয় না।
[১] সহীহ মুসলিম, ত্বহারাত, হাদীস নং ২৩৪; তিরমিযী, ত্বহারাত, হাদীস নং ৫৫; নাসাঈ, ত্বহারাত, হাদীস নং ১৪৮; ইবন মাজাহ, তাহারাত ও এর সুন্নাতসমূহ, হাদীস নং ৪৭০; মুসনাদ আহমদ, ৪/১৫৩।
[২] সহীহ বুখারী, অযু, হাদীস নং ১৩৬; সহীহ মুসলিম, ত্বহারাত, হাদীস নং ২৪৬; ইবন মাজাহ, যুহুদ, হাদীস নং ৪৩০৬; মুসনাদ আহমদ, ২/৪০০; মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ৬০।
[৩] সুনান নাসাঈ, ত্বহারাত, হাদীস নং ১৪০; আবু দাউদ, ত্বহারাত, হাদীস নং ১৩৫।

গোসল

ক- গোসলের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচিতি:ঃ দম্ া যোগে (الغُسل) গুসল অর্থ পানি, ফাতহা যোগে (الغَسل) গাসল অর্থ গোসল করা আর কাসরা যোগে (الغِسل) গেসল অর্থ পরিস্কার করার উপাদান।শরী'আতের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মাথার অগ্রভাগ থেকে পায়ের নিচ পর্যন্ত সারা শরীরে পবিত্র পানি প্রবাহিত করা। এতে নারী ও পুরুষ সবাই সমান, তবে হায়েয ও নিফাসের গোসলের সময় রক্তের চিহ্ন পরোপুরিভাবে দূর করতে হবে যাতে রক্তের দুর্গন্ধ দূর হয়।

খ- গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহ:

গোসল ফরয হওয়ার কারণ ছয়টি:

১- নারী বা পুরুষের কামভাবের সাথে সজোরে বীর্য বের হওয়া।
২- পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যৌনাঙ্গের ভিতর প্রবেশ করলে।
৩- আল্লাহর রাস্তায় শহীদ ব্যতীত অন্যসব মুসলিম মারা গেলে গোসল ফরয।
৪- প্রকৃত কাফির বা মুরতাদ ইসলাম গ্রহণ করলে।
৫- হায়েয হলে।
৬- নিফাস হলে।

গ- ইসলামে মুস্তাহাব গোসলসমূহ:

১- জুমু'আর দিনের গোসল।
২- ইহরামের গোসল।
৩- মাইয়্যেতকে গোসলকারী ব্যক্তির গোসল।
৪- দুই 'ঈদের গোসল।

৫- কারো পাগল বা বেহুশ অবস্থা কেটে গেলে।
৬- মক্কায় প্রবেশের গোসল।
৭- সূর্যগ্রহণ ও বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতের জন্য গোসল।
৮- মুস্তাহাযা তথা প্রদররোগগ্রস্তা নারীর প্রতি ওয়াক্ত সালাতের জন্য গোসল।
৯- সব ধরণের ভালো সম্মেলনের জন্য গোসল।

ঘ- গোসলের শর্তাবলী:

গোসলের শর্তাবলী সাতটি:

১- যে কারণে গোসল ফরয হয় তা শেষ হওয়া।
২- নিয়ত করা।
৩- ইসলাম।
৪- আকল বা বুদ্ধি-বিবেক।
৫- ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।
৬- পবিত্র ও বৈধ পানি।
৭- চামড়ায় পানি পৌঁছতে বাধা থাকলে তা দূর করা।

ঙ- গোসলের ওয়াজিবসমূহ:

গোসলের ওয়াজিব হলো বিসমিল্লাহ বলা, ভুলে গেলে এ ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়, ইচ্ছাকৃত বাদ দিলে ওয়াজিব ছুটে যাবে।

চ- গোসলের ফরযসমূহ:

নিয়ত করা, সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা, মুখ ও নাকে পানি প্রবেশ করানো। পানি পৌঁছল কিনা এ ব্যাপারে প্রবল ধারণা হলেই যথেষ্ট হবে।

কেউ সুন্নাত বা ফরয গোসলের নিয়ত করলে এক নিয়ত অন্য নিয়াতের জন্য যথেষ্ট হবে।

জানাবাত ও হায়েযের গোসল একই নিয়াতে যথেষ্ট হবে।

ছ- গোসলের সুন্নাতসমুহ:

১- বিসমিল্লাহ বলা।
২- গোসলের শুরুতে শরীরে বিদ্যমান অপবিত্রতা বা ময়লা দূর করা।
৩- পাত্র হাত ঢুকানোর পূর্বে দুহাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়া।
৪- গোসলের শুরুতে অযু করা।
৫- ডান দিক থেকে শুরু করা।
৬- ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
৭- সারা শরীরে হাত মর্দন করা।
৮- গোসল শেষে দুপা অন্য স্থানে সরে ধৌত করা।

জ- গোসলের মাকরূহসমূহ:

গোসলে নিম্নোক্ত কাজ করা মাকরূহ:

১- পানির অপব্যয় করা।
২- অপবিত্র স্থানে গোসল করা।
৩- দেয়াল বা পর্দা ছাড়া খোলা জায়গায় গোসল করা।
৪- স্থির পানিতে গোসল করা।

ঝ- জুনুবী বা বড় অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যেসব কাজ করা হারাম:

১- সালাত আদায় করা।
২- বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা।
৩- গিলাফ ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করা ও বহন করা।
৪- মসজিদে বসা।
৫- কুরআন পড়া।

নাজাসাত তথা নাপাকীর বিধিবিধান ও তা দূর করার পদ্ধতি

ক- নাজাসাত (নাপাকী) এর শাব্দিক ও শর'ঈ অর্থ:নাজাসাতের শাব্দিক অর্থ ময়লা, যেমন বলা হয় نجسالشيءنجسا বস্তুটি ময়লা হয়েছে। আবার বলা হয়, تنجسالشيء :صارنجسا تلطخبالقذر অর্থাৎ ময়লা মাখিয়ে দেওয়া ।শরী'আতের পরিভাষায় 'নাজাসাত' হলো, নির্দিষ্ট পরিমাণ ময়লা যা সালাত ও এ জাতীয় ইবাদাত করতে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন, পেশাব, রক্ত ও মদ।

খ- নাজাসাতের ধরণ:

নাজাসাত দু'ধরণের:

১- সত্তাগত বা প্রকৃত নাজাসাত।

২- হুকমী তথা বিধানগত নাজাসাত।

সত্তাগত বা প্রকৃত নাজাসাত হলো কুকুর ও শূকর ইত্যাদি। এসব নাজাসাত ধৌত করা বা অন্য কোনো উপায়ে কখনো পবিত্র হয় না। আর হুকমী তথা বিধানগত নাজাসাত হলো ঐ নাপাকী যা পবিত্র স্থানে পতিত হয়েছে।

গ- নাজাসাতের প্রকারভেদ:

নাজাসাত তিন প্রকার। যথা:

১- এক ধরনের নাপাকী (নাজাসাত) রয়েছে যা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।

২- আরেক ধরনের নাপাকী (নাজাসাত) রয়েছে যা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন।

৩- আরেক ধরনের নাপাকী (নাজাসাত) রয়েছে যা অপবিত্র হওয়ার পরও ক্ষমার পর্যায়ে। অর্থাৎ কোনো ক্ষতি হয় না ।যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ:

১- যেসব নাজাসাত অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত, সেগুলো হলো:

ক- সব স্থলচর মৃতপ্রাণী। জলচর মৃতপ্রাণী পবিত্র এবং খাওয়া হালাল।

খ- প্রবাহিত রক্ত, যা স্থলচর প্রাণী জবেহ করার সময় প্রবাহিত হয়।

২- শূকরের মাংস।

৩- মানুষের পেশাব।

৪- মানুষের পায়খানা।

৫- মযী বা কামরস[১]।

৬৭- অদী[২]।

৭- যেসব প্রাণী খাওয়া হালাল নয় তার গোশত।

৮- জীবিত প্রাণীর কর্তিত অংশ। যেমন, জীবিত ছাগলের বাহু কেটে ফেললে।

৯- হায়েযের রক্ত।

১০- নিফাসের রক্ত।

১১- ইস্তেহাযা বা প্রদরগ্রস্ত নারীর রক্ত।

২- যেসব জিনিস অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন তা হলো:

১- যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেসব প্রাণীর প্রশাব।

২- যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেসব প্রাণীর গোবর।

৩- বীর্য।

৪- কুকুরের লালা।

৫- বমি।

৬- রক্তহীন মৃতপ্রাণী, যেমন মৌমাছি, তেলাপোকা, পাখাবিহীন ক্ষুদ্র কীট ইত্যাদি।

৩- যেসব নাজাসাত অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে মার্জনা করা হয়েছে, অর্থাৎ দোষমুক্ত। সেগুলো হলো:

১- রাস্তার মাটি।

২- সামান্য রক্ত।

৩- মানুষ বা গোশত খাওয়া যায় এমন হালাল প্রাণীর বমি ও পুঁজ।

নাজাসাত পবিত্র করার পদ্ধতি: গোসল, পানি ছিটিয়ে দেওয়া, ঘর্ষণ ও মুছে ফেলার মাধ্যমে নাজাসাত পবিত্র করা যায়।

অপবিত্র কাপড় পবিত্রকরণ: যদি নাজাসাত আকার ও আয়তন বিশিষ্ট দৃশ্যমান বস্তু হয় তবে প্রথমে তা ঘষে তুলে ফেলতে হবে অতঃপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। আর যদি নাজাসাত ভেজা হয় তবে তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

শিশুর পেশাব পবিত্রকরণ: যেসব শিশু আলাদা খাদ্য খায় না সেসব শিশুর পেশাব পানি ছিটিয়ে দিলে পবিত্র হয়ে যায়।

জমিনে লেগে থাকা নাজাসাত আকার আয়তন বিশিষ্ট দৃশ্যমান নাজাসাত দূর করার মাধ্যমে পবিত্র করা হবে। আর যদি জমিনের সাথে থাকা নাজাসাত তরল বস্তু হয় তবে তাতে পানি ঢেলে পবিত্র করতে হবে। আর জুতা মাটিতে ঘর্ষণ বা পবিত্র জায়গায় হাটলে পবিত্র হয়ে যায়। মসৃণ জিনিস যেমন, কাঁচ, চাকু, প্রস্তরফলক ইত্যাদি মুছে ফেললে পবিত্র হয়ে যায়। কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করতে হবে, তবে একটিবার মাটি দিয়ে ধৌত করতে হবে।

[১] মযী হলো, স্বচ্ছ, পাতলা, পিচ্ছিল পানি, যা যৌন উত্তেজনার শুরুতে বের হয় কিন্তু চরম পুলক অনুভব হয় না, তীব্র বেগে বের হয় না ও বের হওয়ার পর কোনো ক্লান্তি আসে না। অনেক সময় এ পানি বের হওয়ার বিষয়টি অনুভব করা যায় না। -অনুবাদক।

[২] পেশাবের আগে পরে নির্গত রস। -অনুবাদক।

তায়াম্মুম

১- তায়াম্মুমের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচিতি:

ক- তায়াম্মুমের শাব্দিক অর্থ: ইচ্ছা করা, কামনা করা, মনস্থ করা।

খ- তায়াম্মুমের পারিভাষিক অর্থ: পবিত্র মাটি দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মুখ ও দু হাত মাসাহ করা।

আল্লাহ এ উম্মতের জন্য যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করেছেন তায়াম্মুম সেসব বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। এটি পানির পরিবর্তে পবিত্র হওয়ার মাধ্যম।

২- কার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ:

ক- পানি পাওয়া না গেলে বা পানি দূরে থাকলে।

খ- কারো শরীরে ক্ষত থাকলে বা অসুস্থ হলে এবং সে পানি ব্যবহার করলে ক্ষত বা অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে।

গ- পানি অতি ঠাণ্ডা হলে এবং গরম করতে সক্ষম না হলে।

ঘ- যদি মজুদ পানি ব্যবহারের কারণে নিজে বা অন্য কেউ পিপাসায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা করে।

৩- তায়াম্মুম ফরয হওয়ার শর্তাবলী:

ক- বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

খ- মাটি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া।

গ- অপবিত্রতা নষ্টকারী কোনো কিছু ঘটা।

৪- তায়াম্মুম শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:

ক- ইসলাম।

খ- হায়েয বা নিফাসের রক্ত শেষ হওয়া।

গ- আকল বা বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া।

ঘ- পবিত্র মাটি পাওয়া।

৫- তায়াম্মুমের ফরযসমূহ:

ক- নিয়ত।

খ- পবিত্র মাটি।

গ- একবার মাটিতে হাত মারা।

ঘ- মুখমণ্ডল ও হাতের তালু মাসাহ করা।

৬- তায়াম্মুমের সুন্নাতসমূহ:

ক- বিসমিল্লাহ বলা।

খ- কিবলামুখী হওয়া।

গ- সালাতের আদায়ের ইচ্ছা করার আগে করা

ঘ- দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মারা।

ঙ- ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

চ- এক অঙ্গের সাথে বিরতিহীন অন্য অঙ্গ মাসাহ করা।

ছ- আঙ্গুল খিলাল করা।

৭- তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ:

ক- পানি পাওয়া গেলে।

খ- উল্লিখিত অযু ও গোসল ভঙ্গের কারণসমূহ পাওয়া গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা তায়াম্মুম হলো অযু ও গোসলের স্থলাভিষিক্ত, আর মূল পাওয়া গেলে তার স্থলাভিষিক্তের কাজ শেষ হয়ে যায়।

৮- তায়াম্মুমের পদ্ধতি:প্রথমে তায়াম্মুমের নিয়ত করবে, অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে দুহাত মাটিতে মারবে, অতঃপর এর দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ধারাবাহিক ও বিরতিহীনভাবে মাসাহ করবে।

৯- ব্যান্ডেজ ও ক্ষতস্থানে তায়াম্মুম:কারো হাড় ভেঙ্গে গেলে বা শরীরে ক্ষত বা জখম হলে পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা করলে ও কষ্ট হলে তবে ব্যান্ডেজ ও ক্ষতস্থানে তায়াম্মুম করবে এবং বাকী অংশ ধুয়ে ফেলবে। কেউ পানি ও মাটি কোনটিই না পেলে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই সালাত আদায় করে নিবে। তাকে উক্ত সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

মোজা ও বন্ধ ফলকের উপর মাসাহ:

১- ইবন মুবারক বলেছেন, মোজার উপর মাসাহর ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। ইমাম আহমাদ বলেছেন, মোজার উপর মাসাহর ব্যাপারে আমার অন্তরে কোনো সংশয় নেই। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে চল্লিশটি হাদীস বর্ণিত আছে। পা ধোয়ার চেয়ে মোজার উপর মাসাহ করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ উত্তমটিই তালাশ করতেন।

২- সময়সীমা:মুকিমের জন্য একদিন ও একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন ও তিনরাত মাসাহ করা জায়েয। মোজা পরিধান করার পরে প্রথম বার অপবিত্র হওয়া থেকে সময়সীমা শুরু হয়।

৩- মোজার উপর মাসাহর শর্তাবলী: পরিধেয় মোজা বৈধ ও পবিত্র হওয়া। ফরয পরিমাণ অংশ ঢেকে থাকা এবং মোজা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা।

৪- মোজার উপর মাসাহর পদ্ধতি:পানিতে হাত ভিজিয়ে পায়ের উপরিভাগের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে নলা পর্যন্ত একবার মাসাহ করা। পায়ের নিচে ও পিছনে মাসাহ নয়।

৫- মোজার উপর মাসাহ ভঙ্গের কারণসমূহ:

নিচের চারটির যে কোনো একটি কারণে মোজার উপর মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়:

১- পায়ের থেকে মোজা খুলে ফেললে।

২- মোজা খুলে ফেলা অত্যাবশ্যকীয় হলে, যেমন গোসল ফরয হলে।

৩- পরিহিত মোজা বড় ছিদ্র বা ছিড়ে গেলে।

৪- মাসাহের মেয়াদ পূর্ণ হলে।সব ধরণের পট্টি বা ব্যান্ডেজ খুলে না ফেলা পর্যন্ত তার উপর মাসাহ করা জায়েয, এতে মেয়াদ যতই দীর্ঘ হোক বা জানাবত তথা বড় নাপাকী লাগুক।

সুত্রঃ https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=81&section=1120

অনুশীলনী -১১ (**জুন- ১ম সপ্তাহঃ**)

দরসে কুরআনঃ সুরা আলে-ইমরান , আয়াতঃ ১৯-২২

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٨

আল্লাহ্ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্নেই। আর ফেরেশতা ও সকল জ্ঞানবান লোকই সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সেই প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান সত্ত্বা ছাড়া আর কোন ইলাহ্নেই। ৩:১৯

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩

ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্রদ্বীনুজীবন বিধান। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা এ দ্বীন থেকে সরে গিয়ে যেসব বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেগুলো অবলম্বনের এছাড়া আর কোন কারণই ছিল না যে, প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করার জন্য এমনটি করেছে। আর যে কেউ আল্লাহর হেদায়াতের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে, তার কাছ থেকে হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরী হয় না।৩:২০

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ٢٠

এখন যদি এ লোকেরা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের বলে দাওঃ "আমি ও আমার অনুগতরা আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করেছি।" তারপর আহলি কিতাব ও অ-আহলি কিতাব উভয়কে জিজ্ঞেস করো, "তোমরাও কি তাঁর বন্দেগী কবুল করেছো?" ১৮ যদি করে থাকে তাহলে ন্যায় ও সত্যের পথ লাভ করেছে আর যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে তোমার ওপর কেবলমাত্র পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্বই অর্পিত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ নিজেই তার বান্দাদের অবস্থা দেখবেন।৩:২১

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢١

যারা আল্লাহর বিধান ও হিদায়াত মানতে অস্বীকার করে এবং তাঁর নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে আর এমন লোকদের প্রাণ সংহার করে, যারা মানুষের মধ্যে ন্যায়, ইনসাফ ও সততার নির্দেশ দেবার জন্য এগিয়ে আসে, তাদের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও। ৩:২২

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ٢٢

এরা এমন সব লোক যাদের কর্মকাণ্ড (আমল) দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই নষ্ট হয়ে গেছে ২০ এবং এদের কোন সাহায্যকারী নেই। ৩:২২

দরসে আলে ইমরান

মোট আয়াত সংখ্যা ২০০

নামকরণঃ এই সূরার এক জায়গায় "আলে ইমরানের" কথা বলা হয়েছে। একেই আলামত হিসেবে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল ও বিষয়বস্তুর অংশসমূহ ঃ

প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে চতুর্থ রুকূ'র প্রথম দু' আয়াত পর্যন্ত চলেছে এবং এটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়।

দ্বিতীয় ভাষণটি إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

(আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদের সারা দুনিয়াবাসীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে নিজের রিসালাতের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন।) আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকূ'র শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে। ৯ হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণটি সপ্তম রুকূ'র শুরু থেকে নিয়ে দ্বাদশ রুকূ'র শেষ অব্দি চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয়।

চতুর্থ ভাষণটি ত্রয়োদশ রুকূ' থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহোদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়।

সম্বোধন ও আলোচ্য বিষয়াবলী

এই বিভিন্ন ভাষণকে এক সাথে মিলিয়ে যে জিনিসটি একে একটি সুগ্রথিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে পরিণত করেছে সেটি হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য ও একমুখীনতা। সূরায় বিশেষ করে দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে।

একটি দল হচ্ছে, আহলী কিতাব (ইহুদী ও খৃস্টান) এবং দ্বিতীয় দলটিতে রয়েছে এমন সব লোক যারা মুহাম্ াদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল। সূরা বাকারায় ইসলামের বাণী প্রচারের যে ধারা শুরু করা হয়েছিল প্রথম দলটির কাছে সেই একই ধারায় প্রচার আরো জোরালো করা হয়েছে। তাদের আকীদাগত ভ্রষ্টতা ও চারিত্রিক দুষ্কৃতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এই রসূল এবং এই কুরআন এমন এক দ্বীনের দিকে নিয়ে আসছে প্রথম থেকে সকল নবীই যার দাওয়াত দিয়ে আসছেন এবং আল্লাহর প্রকৃতি অনুযায়ী যা একমাত্র সত্য দ্বীন। এই দ্বীনের সোজা পথ ছেড়ে তোমরা যে পথ ধরেছো তা যেসব কিতাবকে তোমরা আসমানী কিতাব বলে স্বীকার করো তাদের দৃষ্টিতেও সঠিক নয়। কাজেই যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পারো না তার সত্যতা স্বীকার করে নাও।

দ্বিতীয় দলটি এখন শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদা লাভ করার কারণে তাকে সত্যের পতাকাবাহী ও বিশ্বমানবতার সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব দান করা হয়েছে। এই প্রসংগে সূরা বাকারায় যে নির্দেশ শুরু হয়েছিল এখানে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্ তদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধপতনের ভয়াবহ চিত্র দেখিয়ে তাকে তাদের পদাংক অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে সে কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহলি কিতাব ও মুনাফিক মুসলমান আল্লাহর পথে নানা প্রকার বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করবে, তাও তাকে জানানো হয়েছে। ওহোদ যুদ্ধে তাঁর মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্যও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এভাবে এ সূরাটি শুধুমাত্র নিজের অংশগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি এবং নিজের অংশগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করেনি বরং সূরা বাকারার সাথেও এর নিকট সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। এটি একেবারেই তার পরিশিষ্ট মনে হচ্ছে। সূরা বাকারার লাগোয়া আসনই তার স্বাভাবিক আসন বলে অনুভূত হচ্ছে।

নাযিলের কার্যকারণ

সূরাটির ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছেঃ

একঃ এই সত্য দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সূরা বাকারায় পূর্বাহ্নেই যেসব পরীক্ষা, বিপদ আপদ ও সংকট সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল তা পূর্ণ মাত্রায় সংঘটিত হয়েছিল। বদর যুদ্ধে ঈমানদারগণ বিজয় লাভ করলেও এ যুদ্ধটি যেন ছিল ভীমরুলের চাকে ঢিল মারার মতো ব্যাপার। এ প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষটি আরবের এমন সব শক্তিগুলোকে অকস্াত নাড়া দিয়েছিল যারা এ নতুন আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো। সবদিকে ফুটে উঠছিল ঝড়ের আলামত। মুসলমানদের ওপর একটি নিরন্তর ভীতি ও অস্থিরতার অবস্থা বিরাজ করছিল। মনে হচ্ছিল, চারপাশের সারা দুনিয়ার আক্রমণের শিকার মদীনার এ ক্ষুদ্র জনবসতিটিকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলে দেয়া হবে। মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর এ পরিস্থিতির অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। মদিনা ছিল তো একটি ছোট্ট মফস্বল শহর। জনবসতি কয়েক শ' ঘরের বেশী ছিল না। সেখানে হঠাৎ বিপুল সংখ্যক মুহাজিরের আগমন। ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তো এমনিতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর আবার এই যুদ্ধাবস্থার কারণে বাড়তি বিপদ দেখা দিল।

দুইঃ হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আশপাশের ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তারা সেই চুক্তির প্রতি সামান্যতমও সম্ান প্রদর্শন করেনি। বদর যুদ্ধকালে এই আহলি কিতাবদের যাবতীয় সহানুভূতি তাওহীদ ও নবুয়াত এবং কিতাব

ও আখেরাত বিশ্বাসী মুসলমানদের পরিবর্তে মূর্তিপূজারী মুশরিকদের সাথে ছিল। বদর যুদ্ধের পর তারা কুরাইশ ও আরবদের অন্যান্য গোত্রগুলোকে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। বিশেষ করে বনী নাযির সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ তো এ ব্যাপারে নিজের বিরোধমূলক প্রচেষ্টাকে অন্ধ শত্রুতা বরং নীচতার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। মদিনাবাসীদের সাথে এই ইহুদীদের শত শত বছর থেকে যে বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক চলে আসছিল তার কোন পরোয়াই তারা করেনি। শেষ যখন তাদের দুষ্কর্ম ও চুক্তি ভংগ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের কয়েক মাস পরে এই ইহুদী গোত্রগুলোর সবচেয়ে বেশী দুষ্কর্মপরায়ণ 'বনী কাইনুকা' গোত্রের ওপর আক্রমণ চালান এবং তাদেরকে মদীনার শহরতলী থেকে বের করে দেন। কিন্তু এতে অন্য ইহুদী গোত্রগুলোর হিংসার আগুন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তারা মদিনার মুনাফিক মুসলমান ও হিযাজের মুশরিক গোত্রগুলোর সাথে চক্রান্ত করে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চার দিকে অসংখ্য বিপদ সৃষ্টি করে। এমনকি কখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ নাশের জন্য তাঁর ওপর আক্রমণ চালানো হয় এই আশংকা সর্বক্ষণ দেখা দিতে থাকে। এ সময় সাহাবায়ে কেরাম সবসময় সশস্ত্র থাকতেন। নৈশ আক্রমণের ভয়ে রাতে পাহারা দেয়া হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কখনো সামান্য সময়ের জন্যও চোখের আড়াল হতেন সাহাবায়ে কেরাম উদ্বেগ আকুল হয়ে তাঁকে খুঁজতে বের হতেন।

তিনঃ বদরে পরাজয়ের পর কুরাইশদের মনে এমনিতেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল, ইহুদীরা তার ওপর কেরোসিন ছিটিয়ে দিল। ফলে এক বছর পরই মক্কা থেকে তিন হাজার সুসজ্জিত সৈন্যের একটি দল মদীনা আক্রমণ করলো। এ যুদ্ধটি হলো ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে। তাই ওহোদের যুদ্ধ নামেই এটি পরিচিত। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মদীনা থেকে এক হাজার লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু পথে তিন'শ মুনাফিক হঠাৎ আলাদা হয়ে মদীনার দিকে ফিরে এলো। নবীর (সা.) সাথে যে সাত'শো লোক রয়ে গিয়েছিল তার মধ্যেও মুনাফিকদের একটি ছোট দল ছিল। যুদ্ধ চলা কালে তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টি করার সম্ভাব্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালালো। এই প্রথমবার জানা গেলো, মুসলমানদের স্বগৃহে এত বিপুল সংখ্যক আস্তীনের সাপ লুকানো রয়েছে এবং তারা এভাবে বাইরের শত্রুদের সাথে মিলে নিজেদের ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

চারঃ ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় যদিও মুনাফিকদের কৌশলের একটি বড় অংশ ছিল তবুও মুসলমানদের নিজেদের দুর্বলতার অংশও কম ছিল না। একটি বিশেষ চিন্তাধারা ও নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে দলটি এই সবেমাত্র গঠিত হয়েছিল, যার নৈতিক প্রশিক্ষণ এখনো পূর্ণ হতে পারেনি এবং নিজের বিশ্বাস ও নীতি সমর্থনে যার লড়াই করার এই মাত্র দ্বিতীয় সুযোগ ছিল তার কাজে কিছু দুর্বলতা প্রকাশ হওয়াটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই যুদ্ধের পর এই যাবতীয় ঘটনাবলীর ওপর বিস্তারিত মন্তব্য করা এবং তাতেই ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে যেসব দুর্বলতা পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে তার সংশোধনের জন্য নির্দেশ দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ প্রসংগে একথাটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখার উপযোগীতা রাখে যে, অন্য জেনারেলরা নিজেদের যুদ্ধের পরে তার ওপর যে মন্তব্য করেন এ যুদ্ধের ওপরে কুরআনের মন্তব্য তা থেকে কত বিভিন্ন!

৩:১৮ এই আয়াতে মহানবী (সাঃ) ও মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের অবিশ্বাস ও মুশরিকদের অংশীবাদিতা যেন তোমাদেরকে নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি সন্দিহান না করে। কারণ, প্রকৃত জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী মানুষেরা আল্লাহর একত্বের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এছাড়াও তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, বিশ্ব জগতের ব্যবস্থাপনা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং এ ক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়না। আর এ বিষয়টি নিজেই আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। অর্থাৎ আল্লাহ এ বিশ্ব জগতের যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, যেমন- আকাশ,ভূমি,পাহাড়,নদী,সাগর,উদ্ভিদ,পশু-পাখী ইত্যাদি-সবই একই ব্যবস্থার অধীনে পরিচালনা করছেন। আর এসবই কার্যত আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং ফেরেশতারাও আল্লাহর কর্মীবাহিনী হিসেবে জগত পরিচালনায় নিয়োজিত থেকে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আল্লাহ্ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন ঃ অর্থাৎ যে আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের সমস্ত তত্ত্ব, সত্য ও রহস্যের প্রত্যক্ষজ্ঞান রাখেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আবরণহীন অবস্থায় দেখছেন এবং যার দৃষ্টিথেকে পৃথিবী ও আকাশের কোন একটি বস্তুও গোপন নেই-এটি তাঁর সাক্ষ্য এবং তাঁর চাইতে আর বেশী নির্ভরযোগ্য চাক্ষুষ সাক্ষ্য আর কে দিতে পারে? কারণ সমগ্র সৃষ্টিজগতে তিনি ছাড়া আর কোন সত্ত্বা খোদায়ী গুণে গুণান্বিত নয়। আর কোন সত্ত্বা খোদায়ী কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং আর কারোর খোদায়ী করার যোগ্যতাও নেই।

ফেরেশতাদের সাক্ষ্যঃ আল্লাহ্র পর সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য হচ্ছে ফেরেশতাদের। কারণ তারা হচ্ছে বিশ্বরাজ্যের ব্যবস্থাপনা কার্যনির্বাহী ও কর্মচারী। তারা সরাসরি নিজেদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই বিশ্বরাজ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম চলে না এবং পৃথিবী ও আকাশের পরিচালনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি ছাড়া আর কোন সত্ত্বা এমন নেই যার কাছ থেকে তারা নির্দেশ গ্রহণ করতে পারে। ফেরেশতাদের পরে এই সৃষ্টি জগতে আর যারাই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে কম বেশী কিছুটা জ্ঞান রাখে, সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তকার তাদের সবার সর্বসম্ত সাক্ষ্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ একাই এই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক, পরিচালক ও প্রভু।

এই আয়াতের শিক্ষণীয় দিকগুলো হলো,
প্রথমত : বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা ও বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে সমন্বয় আল্লাহর একত্বের সুস্পষ্ট এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

দ্বিতীয়ত: জ্ঞান তখনই উপকারী বা কল্যাণকর হয়,যখন তা মানুষকে আল্লাহমুখী করে। আর ঈমান তখনই গুরুত্ব পায় যখন তা হয় জ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক।

৩:১৯ঃ১. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য একটি মাত্র জীবন ব্যবস্থা ও একটি মাত্র জীবনবিধান সঠিক ও নির্ভুল বলে গৃহীত। সেটি হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে নিজের মালিক ও মাবুদ বলে স্বীকার করে নেবে এবং তাঁর ইবাদাত, বন্দেগী ও দাসত্বের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে। আর তাঁর বন্দেগী করার পদ্ধতি নিজে আবিষ্কার করবে না। বরং তিনি নিজের নবী-রসূলগণের মাধ্যমে যে হিদায়ত ও বিধান পাঠিয়েছেন কোনো প্রকার কমবেশী না করে তার অনুসরণ করবে। এই চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির নাম "ইসলাম" আর বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার ও প্রভুর নিজের সৃষ্টিকুল ও প্রজা সাধারণের জন্য ইসলাম ছাড়া অন্যকোন কর্মপদ্ধতির বৈধতার স্বীকৃতি না দেয়াও পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত। মানুষ তার নির্বুদ্ধিতার কারণে নাস্তিক্যবাদ থেকে নিয়ে শিরক ও মূর্তিপূজা পর্যন্ত যে কোন মতবাদ ও যে কোন পদ্ধতির অনুসরণ করা নিজের জন্য বৈধ মনে করতে পারে কিন্তু বিশ্ব-জাহানের প্রভুর দৃষ্টিতে এগুলো নিছক বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. আল্লাহর পক্ষথেকে দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলে যে কোন যুগে যে নবীই এসেছেন, তাঁর দ্বীনই ছিল ইসলাম। দুনিয়ার যে কোন জাতির ওপর যে কিতাবই নাযিল হয়েছে, তা ইসলামেরই শিক্ষা দান করেছে। এই আসল দ্বীনকে বিকৃত করে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে যেসব ধর্ম মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, তাদের জন্ম ও উদ্ভবের কারণ ও ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, লোকেরা নিজেদের বৈধ সীমা অতিক্রম নিজেদের খেয়াল খুশী মতো আসল দ্বীনের আকীদা-বিশ্বাস, মূলনীতি ও বিস্তারিত বিধান পরিবর্তন করে ফেলেছে। হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আঃ)'র যুগে,কিংবা অন্যান্য নবীদের যুগে মানুষের দায়িত্ব ছিল আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে তাদের বিশ্বাস করা, তাদের আনুগত্য করা এবং তাঁদের কাছে অবতীর্ণ বইয়ের প্রতিও ঈমান আনা। কিন্তু পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হবার পর ইসলামের নবীর প্রতি বিশ্বাস আনা ও এই ধর্মের বিধান মেনে চলা সবার দায়িত্ব হয়ে পড়ে। অথচ ধর্মীয় ও বর্ণ-বিদ্বেষের কারণে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী হয়নি এবং এই ধর্মকে সত্য বলে স্বীকারও করেনি।

৩. এই আয়াতে আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যদি তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করতে চায়, তাহলে তারা যেন ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেয়। কারণ,যে আল্লাহ তাদের কাছে ঈসা ও মুসা নবীকে পাঠিয়েছেন, তিনিই এখন মোহাম্ দ (সা.) কে নবী মনোনীত করে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামকে সত্য ধর্ম হিসেবে জানার পরও যদি তারা ঈমান না আনে তাহলে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহর শাস্তির জন্য তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ যে তাদের ধারণার চেয়েও দ্রুত সময়ে মানুষের কর্মতৎপরতার হিসাব নেবেন সেটাও তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এই আয়াতের শিক্ষণীয় দিকগুলো হলো,
প্রথমত : অধিকাংশ মতবিরোধের উৎস হল হিংসা ও বিদ্বেষ। অজ্ঞতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে না জানার কারণে খুব কমই মতভেদ দেখা দেয়।
দ্বিতীয়ত : আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। তাই অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের অনুসারী হবার দাবিদাররা যদি সত্যই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত হতে চায় তাহলে তাদেরকে এখন থেকে শুধু ইসলাম ধর্মই মেনে চলতে হবে।

৩:২০ অন্য কথায় এ বক্তব্যটিকে এভাবে বলা যায়, যেমন - "আমি ও আমার অনুসারীরা তো সেই নির্ভেজাল ইসলামের স্বীকৃতি দিয়েছি, যেটি আল্লাহর আসল দ্বীন ও জীবন বিধান। এখন তোমরা বলো, তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা দ্বীনের মধ্যেযে পরিবর্তন সাধন করেছো তা বাদ দিয়ে এই আসল ও প্রকৃত দ্বীনের দিকে কি তোমরা ফিরে আসবে?
এরপর ইসলামের নবীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন,কাফের ও মুশরিকদের ঈমানদার করার জন্য অনর্থক তাদের সঙ্গে ঝগড়া ও দ্বন্দ্বে যাবার মত কষ্ট করার দরকার নেই। কারণ,আপনার দায়িত্ব হল শুধু আল্লাহর বাণী জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া যাতে মানুষ সত্যকে বুঝতে পারে। তাই যার ইচ্ছা হবে সে নিজেই সত্যকে গ্রহণ করবে এবং যারা জেনে শুনেও যে কোন কারণে সত্য ধর্ম গ্রহণ করবে না তাদের সঙ্গে আলোচনা নিরর্থক। তাদের বিষয় আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। আল্লাহ তার সৃষ্টির অবস্থা ভালভাবে দেখেন।

এই আয়াতের শিক্ষণীয় দিকগুলো হলো,
প্রথমত :উদ্ধত বা গোঁড়াপন্থী লোকদের সাথে দ্বন্দ্ব-বিবাদ করা নয়,বরং যুক্তি তুলে ধরাই আমাদের দায়িত্ব।
দ্বিতীয়ত :ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন এবং জোর করে কারো ধর্মীয় বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ। অবশ্য যারাই যে পথই বেছে নিক না কেন ঐ পথের ভালো বা মন্দ পরিণতি তাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

৩:২১-২২
পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের হিংসা ও বিদ্বেষের স্বরূপ তুলে ধরার পর এই দুই আয়াতে সত্য গোপন ও অবিশ্বাসের করুণ ও নোংরা পরিণতির কথা বলা হয়েছে। আসলে মানুষ তাদের চিন্তা ও বিশ্বাস অনুসারে কাজ করে। যারা চিন্তাগত ক্ষেত্রে সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়,তারা সত্যের পক্ষে কাজ তো করেই না,বরং যারা সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজে কাজ করছে তাদের সাথে বিরোধিতা করে

এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্যন্ত করে। এদের হাত নিরাপরাধ লোকদের রক্তে রঞ্জিত এবং এরা ন্যায় বিচারকামী মানুষের নেতাদেরকে হয় হত্যা করে কিংবা তাদের হত্যা করার অনুমতি দেয় অথবা তারা নিহত হলে খুশি হয়। এটা স্পষ্ট যে সত্যের বিরুদ্ধে চিন্তায় ও কাজে তাদের এই বিরোধীতার ফলে তারা যদি জীবনে কোন ভালো কাজ করেও থাকে তবুও তা হবে নিস্ফল। এদের অবস্থা হচ্ছে এমন লোকের মতো যে কিছুকাল কোন ব্যক্তির সেবকের কাজ করার পর ঐ ব্যক্তির সন্তানকেই হত্যা করে। নিঃসন্দেহে এমন নোংরা কাজ তার অতীতের সমস্ত ভালো কাজকে অর্থহীন ও নিস্ফল করে দেয়।

এই আয়াতের শিক্ষণীয় দিক গুলো হলো,

প্রথমত : সত্যকে গোপন রাখার জন্য কোন কোন মানুষ নবীকে পর্যন্ত হত্যা করেছে। তাই আমাদেরকেও বিকৃত চিন্তাধারার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। কারণ বিপজ্জনক কাজের মূল উৎস হলো বিকৃত বিশ্বাস ।

দ্বিতীয়ত : ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যের পক্ষে আহবান জানানো এবং জাগরণ জরুরী। যদিও এর ফলে শহীদ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। যেমন ইমাম হোসাইন বিন আলী (আঃ) ও তার সন্তানেরা সত্যের আহবানের কারণে শহীদ হবেন এটা নিশ্চিতভাবে জেনেও সত্যের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন ।

তৃতীয়ত : কোন কোন পাপ বজ্রপাতের মতোই মানুষের পূণ্যের বাগানের সমস্ত গাছকে এক মুহূর্তের মধ্যেই ভস্মীভূত করে দেয়। তখন দুঃখ করার মতো অবকাশও থাকে না। #

সুত্রঃ তাফহীমুল কুরআন ও
https://parstoday.ir/bn/radio/programs-i62198-%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%BE_%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%87_%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A4_%E0%A7%A7%E0%A7%AE_%E0%A7%A8%E0%A7%A8_(%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC_%E0%A7%AA)

বই নোটঃ ৬ ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি

লেখকঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রা:), অনুবাদ-মাওলানা আব্দুর রহীম।

ইসলামী আন্দোলনঃ

মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ হতে গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব উৎখাত করে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও রাসূল (সা:) এর নেতৃত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সর্বাত্বক চেষ্টা ওপ্রচেষ্টা তাকে ইসলামী আন্দোলন বলে।

নৈতিকতাঃ নীতি মানার যেটি অনুভূতি সেটি নৈতিকতা। মানবীয় চরিত্রের যে গুন যা তাকে সঠিক পথে চলতে উৎসাহিত করে।

ভিত্তিঃ যার উপর ভিত্তি করে কোন কিছু সংস্থাপিত হয়।

মানব সমাজে অশান্তির মূল কারণ:-

১. বর্তমান সমাজের নেতৃত্ব সৎ নয়
২. এ মূল সমস্যা জনগন উপলব্ধি করতে পরেনা
৩. অনৈক্য ও ভাঙ্গন
৪. সত্য ও সত্যপ্রিয় মানুষ অনেক, কিন্তু আসল সত্য প্রিয় মানুষের সংখ্যা কম
৫. সত্যপ্রিয় লোক থাকলেও ক্ষমতায় নেই।

নেতৃত্বর গুরুত্বঃ

১. নেতা হচ্ছে যে কোন কার্যের প্রকৃত ভূমিকা পালনকারী।
২. নেতাই ভাঙ্গা ও গড়ার মৌলিক পরিকল্পনাকারী।
৩. নেতা তার অধীনস্ড় কর্মীদের অনুসরনীয় ব্যক্তি।
৪. নেতা অসৎ হলে পাপ পঙ্কিলতা দূর হয়ে সৎ পথে চলা হয়।
৫. নেতা সৎ হলে খোদাকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার দরুন পাপ নি:শেষ না হলে সমাজ সহজে বিকশিত হতে পারে না।

নেতার ব্যাপারে খোদার নির্দেশ/ ইসলামের মূল লক্ষ্যঃ

১. সব মানুষ আল্লাহর গোলামী করবে।
২. খোদারপ্রদত্ত বিধানই কর্মীদের চলার পথ।
৩. দুনিয়া হতে সকল অশক্তি ও বিপদ দূর করতে হবে।
৩. উপরোক্ত কাজের নিয়ামক নেতার, কর্মী বা জনশক্তির নয়।
৪. ত্র কাজটি পারে ত্রকমাত্র ইসলামী নেতৃত্ব।
৫. ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সামগ্রিক প্রতিষ্ঠার বাতিল নেতৃত্ব উৎখাত করে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৬. সুতরাং ইসলামের মূল লক্ষ্য নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন।

মানবিক বা নৈতিক দিকঃ ২টি

* ১. মৌলিক মানবীয় গুনাবলী/চরিত্রঃ

ক) ইচ্ছা শক্তি ও সিদ্বান্ত গ্রহন শক্তি
খ) প্রবল বাসনা
গ) উচ্চাশা ও নির্ভীক সাহস
ঘ) সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা
ঙ) তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধনা
চ) বীরত্ব ও বীর্যবত্তা
ছ) সহনশীলতা ও পরিশ্রমপ্রিয়তা
জ) উদ্দেশ্যের আকর্ষন ও সে জন্য সব কিছুর উৎসর্গ করারপ্রবনতা
ঝ) সর্তকতা
ঞ) দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টি, বোধশক্তি ও বিচার ক্ষমতা
ট) ইচ্ছাবাসনা
ঠ) স্বপ্ন সাধনা ও উত্তেজনার সংযমশক্তি ত্রবং অন্যান্য মানুষকে আকৃষ্ট করা।

২. ইসলামী চরিত্রঃ

এটি মৌলিক মানবীয় চরিত্রের বিশুদ্ধরূপ। তরবারী সাধারন অবস্থায়, মৌলিক মানবীয় চরিত্র + তরবারী মুজাহিদের হাতে + ইসলামী নৈতিক চরিত্র।

নেতৃত্ব বন্টনে খোদার নীতির সারকথাঃ

১. মৌলিক মানবীয় গুনাবলী যার যত বেশী সে নেতৃত্ব পাবে।
২. ইসলামী নৈতিকতার উপস্থিতি মৌলিক মানবীয় গুনাবলী কম হলেও নেতৃত্ব পাবে।
৩. উপরোক্ত দুইটির সমন্বয় হলে নেতৃত্ব অবশ্যম্ভাবী তবে নেতৃত্ব ফেরেশতা দিয়ে যাবে না। ময়দানে দ্বন্দ সংঘাত পেরিয়ে তা অর্জন করতে হবে
৪. মৌলিক মানবীয় চরিত্র +১০০% জড়শক্তি=সাফল্য।
৫. ইসলামী নৈতিক চরিত্র+২৫% জড়শক্তি = সাফল্য।

ইসলামী নৈতিকতার পর্যায়ঃ ৪ টি

১. ঈমানঃ মৌলিক তিনটি (মু,মিন)

ক. আল্লাহর উপর ঈমানঃ অস্তিত্ব, নাম ও গুনাবলী, ক্ষমতা, হুকুম আহকাম।
খ. রাসূলের উপর ঈমানঃ তার নব্যুয়াত ও রিসালাত স্বীকার, তার সমগ্র আদর্শপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা, সবকিছুর উর্ধেব স্থান দেওয়াও ভালো।
গ) আখরাতের উপর ঈমানঃ পুনরুস্থান ও হাশরে বিশ্বাস, সে কেন্দ্রিক জীবন গঠন।

২. ইসলাম (মুসলমান)

ঈমানের বাস্তবরূপ, বৃক্ষ থেকে বীজ নির্ধারণ, আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য ও রাসূল (সা:) এর পূর্ণ অনুসরনই ইসলাম।

৩. তাকওয়া (মুত্তাকী): এর অর্থ ভয় করে বেঁচে থাকা। মনের সে অনুভূতি যা আল্লাহর প্রবল ভীতির সাথে সাথে দায়িত্বানুভূতি, জবাবদিহির যাবতীয় কাজে হালাল-হারাম বাছাই ও অনুভূতি জাগ্রত করবে।

তাকওয়া ৩প্রকার :যথা-

ক) তাকওয়ায়ে খাসঃ যাবতীয় শিরক থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহর হুকুম পালন করা।
খ) তাকওয়ায়ে আমঃ যাবতীয় শিরক থেকে নিজেকে রক্ষা করা।
গ) তাকওয়ায়ে আখাচ্ছল খাসঃ শিরক থেকে বেঁচে থাকা নয় কুফরীর সাথে সমপর্ক স্থাপন।

৪. ইহসান (মুহসীন);

ইসলামী জীবনপ্রাসাদের সর্বোচ্চ পর্যায় আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামেরপ্রতি ত্রমন ভালাবাসা যা নিজেকে তাদের জন্য উৎসর্গ করতে শিখায় তাকওয়া-সরকারী কর্মচারীর যথার্থ দায়িত্ব পালন।

ইহসান: শুধু দায়িত্ব পালন নয়, দেশের জন্য কষ্ট, ত্যাগ, কুরবানী স্বীকার, ইসলামের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মুহসিনপ্রয়োজন মারফাতের পথ-ত্র চার পর্যায় অতিক্রম করে তারপর অন্যথায় দুর্ঘটনা ঘটবে।

ইসলামী আন্দালনের নৈতিক ভিত্তির ১০ টি পর্যায়ঃ

নেতৃত্বের গুরুত্ব, ২. সৎ নেতৃত্বপ্রতিষ্ঠা দ্বীন ইসলামের মূল লক্ষ্য, ৩. নেতৃত্বর ব্যাপারে খোদার নিয়ম, ৪. মানুষের মানবীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ, ৫. ইসলামী নেতিকতা, ৬. নেতৃত্বের ব্যাপারে খোদায়ী নীতির সারকথা, ৭. মৌলিক মানবীয় চরিত্র ৮. ইসলামী নৈতিকতা শক্তির তৎপরতা, ৯. ইসলামী নৈতিকতার ৪ টি পর্যায়, ১০. ভুল ধারনার অপনোদন

তাকওয়াসংক্রান্তআয়াত মুখস্ত

আল-বাকারাহঃ১৭৭

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

১৭৭ - তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি এবং আল্লাহর ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও যাচঞাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিস্কৃতি দিতে দান করবে এবং নামায কায়িম করবে ও যাকাত দিতে থাকবে, ওয়া'দা করার পর স্বীয় ওয়া'দা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকী। (তাইসিরুল)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। (আয়াতুল কুরসী) আল-বায়ান

আলে ইমরান: ১০২

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না। আল-বায়ান

তাক্বওয়া সংক্রান্ত হাদিসঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু' (বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৯)।

তাহারাত সংক্রান্ত মাসআলা (ক্লাস ১১ নোট)

অনুশীলনী -১২ (জুন- ৩য় সপ্তাহঃ)

দারসুল কুরআন

সূরা বাকারা (১৫৩-১৫৬ নং আয়াত)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٣

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ١٥٤

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥

ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦

১৫৩. 'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, সবর ওসালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ইআল্লাহ সবর অবলম্বনকারীদের সঙ্গে আছেন।

১৫৪. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়,তাদেরকে তোমরা 'মৃত' বলো না। তারা তোআসলে জীবিত। কিন্তু তোমরা তা অনুধাবনকরতে পার না।

১৫৫. এবং আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভীতিপ্রদপরিস্থিতি, ক্ষুধা-অনাহার এবং অর্থ-সম্পদ, জানও আয়-উপার্জনের লোকসান ঘটিয়ে পরীক্ষাকরবো। এমতাবস্থায় যারা সবর অবলম্বন করবে,তাদেরকে সুসংবাদ দাও।

নামকরণঃআল বাকারা নামে সুরাটির নামকরন করাহয়েছে অর্থাৎ এটি ঐ সুরা যাতেবনীঈসরাইলের গাভি কুরবানীর ঘটনা বর্ণনাকরা হয়েছে। **নাযিলের সময়কালঃ**মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তিরপর তের বছর মাক্কায় ইসলামের দাওয়াত পেশকরেন তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সত্য-সন্ধানী কিছু লোক তাঁর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়কিন্তু মুশরিক নেতাদের অত্যাচারের ভয়েমক্কার অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি।অন্য দিকে ইয়াসরিবের নেতৃত্বস্থানীয়ব্যক্তিবর্গের একটি বড়ো অংশ ইসলাম গ্রহণ করেইয়াসরিবে ইসলামী দাওয়াতের প্রসারঘটানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

এমনি অবস্থায় ৬২২ খ্রিস্টাব্দে আল্লাহ রাব্বুল'আলামীন নবী (সাঃ) ও সাহাবীদেরইয়াসরিবে হিজরাত করার নির্দেশ দেন।তিনি ইয়াসরিব পৌঁছে একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলেন আর সেই রাষ্ট্রের নাম হয় তখন থেকেআল মাদিনা।

মাদানী যুগের একেবারে শুরুর দিকে সূরাবাকারার অধিকাংশ আয়াত নাজিল হয়।মাদানী যুগের শেষ দিকে যে আয়াতগুলোনাজিল হয়েছিলো সুদ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত এইআয়াতগুলোকেও এই সূরায় শামিল করা হয়। আবার, যেই আয়াতগুলো দিয়ে এই সূরাটির সমাপ্তিটানা হয়েছে সেই আয়াতগুলো মাক্কী যুগের শেষভাগে মিরাজের সময় নাজিল হয়েছিলো।

বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে সেইআয়াতগুলো এই সূরায় সংযুক্ত করা হয়।হিজরাতের পূর্বে দাওয়াতি তৎপরতাপরিচালিত হয়েছে মুশরিকদের মধ্যে।হিজরাতের পর দাওয়াতি তৎপরতা পরিচালিতহয়েছে ইয়াহুদিদের মধ্যে।ইসলামী দাওয়াত মাদানী যুগে প্রবেশ করার পরমুনাফিকদের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করে। এদের কেউ কেউ ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো,কিন্তু এর প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বে নিয়োজিত হতে তারা প্রস্তুতছিলো না। এদের কেউ কেউ ইসলাম ওজাহিলিয়াতের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায়ছিলো। এদের কেউ কেউ আসলে ইসলামকেঅস্বীকারই করতো, কিন্তু ফিতনা সৃষ্টিরউদ্দেশ্যে মুসলিমদের দলে প্রবেশ করতো। এদের কেউ কেউ একদিকে মুসলিমদের সাথে ভালোসম্পর্ক বজায় রাখতো, অন্যদিকে ভালো সম্পর্করাখতো ইসলামের দুশমনদের সাথে। শেষাবধিযারাই বিজয়ী হোক না কেন, এতে যেনোতাদের স্বার্থ হানি না ঘটে সেই বিষয়েতারা ছিলো খুবই সজাগ।

ব্যাখ্যাঃ

১৫৩ নাম্বার আয়াতঃ"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, সবর ওসালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। অবশ্যইআল্লাহ সবর অবলম্বনকারীদের সঙ্গে আছেন।"সমাজ-সভ্যতার ইসলাহ করতে অগ্রসর হলে যেবড়ো রকমের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে সেই কথা জানিয়ে দেন। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সবর ও সালাতের মাধ্যমেসাহায্য চাওয়ার আহ্বান জানান।সবর অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। মুমিনদেরকে এই গুণ গুণান্বিত হওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল'আলামিন বারবার তাকিদ করেছেন। আলহাদিসেও এই বিষয়ে তাকিদ রয়েছে।

রোগ-ব্যাধির কষ্ট সহ্য করার নাম সবর।দুঃখ-বেদনায় ভেঙে না পড়ার নাম সবর। রূঢ় ও আচরণে উত্তেজিত না হওয়ার নাম সবর।মিথ্যা প্রচারণার মুখে অবিচলিত থাকার নামসবর।ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিতেও সঠিক পথে দৃঢ়পদথাকার নাম সবর।লক্ষ্য হাসিলের জন্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার নাম সবর।লক্ষ্য অর্জন বিলম্বিত হচ্ছে দেখে হতাশ নাহওয়ার নাম সবর।ইত্যাদি।

মুদ্দাস্সিরের ২ ও ৩ নাম্বার আয়াতে ঃ

قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ﴿۲﴾ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ﴿۳﴾

(উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন।-২; ৩. আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।)

মুয্যাম্মিলের ১০ নাম্বার আয়াতেঃ

وَ اصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿۱۰﴾

১০. আর লোকে যা বলে, তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।)

মা'আরিজের ৫ নাম্বার আয়াতেঃ ৫﴾ -فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا . কাজেই আপনি ধৈর্য ধারণ করুন পরম ধৈর্য।

ইউনুসের ১০৯ নম্বর আয়াতেঃ ١٠٩ وَ اتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَ اصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿

আর তুমি চল সে অনুযায়ী যেমন নির্দেশ আসে তোমার প্রতি এবং সবর কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেন আল্লাহ। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

তা-হা-এর ১৩০ নম্বর আয়াতেঃ

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَ مِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿۱۳۰﴾

১৩০. কাজেই তারা যা বলে, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে আপনার রব-এর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং রাতে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, এবং দিনের প্রান্তসমূহেও, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন।

আহকাফের ৩৫ নম্বর আয়াতেঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর আপনি তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক দণ্ডের বেশী দুনিয়াতে অবস্থান করেনি। এ এক ঘোষণা, সুতরাং পাপাচারী সম্প্রদায়কেই কেবল ধ্বংস করা হবে।

এ হচ্ছে সবর অবলম্বনের তাকিদ সংবলিতবহুসংখ্যক আয়াতের মাত্র কয়েকটি।আবু সায়িদ আল খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "সবরের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আরকিছু কাউকে দেয়া হয়নি।"(সহীহ বুখারী মুসলিম)

সূরা আয যুমারের ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুলআ'লামিন বলেন,

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾

১০. বলুন, হে আমার মুমিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর। যারা এ দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দেয়া হবে বিনা হিসেবে।

"সবর অবলম্বনকারীদেরকে অগণিত পুরস্কার পূর্ণভাবে দেয়া হবে।" এই
আয়াতের শেষাংশে- **إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ ।** কথাটিজুড়ে দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন সবর নামক গুণটির মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন।অন্য দিকে এই বাক্যাংশের মাধ্যমে তিনিমুমিনদের মনে নিশ্চিন্ততার আমেজ সৃষ্টিকরেছেন।

আরেকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সালাত।এটি এমন এক প্রক্রিয়া যার অনুশীলন মুমিনদেরমাঝে অনুপম নৈতিক শক্তি সৃষ্টি করে। সেই জন্যনবুওয়াত প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই জিবরিল (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাঠিয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন সালাতআদায়ের পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। বহু আয়াতেআল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন সালাতের তাকিদদিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতটিতেও আমরা একই রূপতাকিদ দেখতে পাই।

আল বাকারা- ১৫৪ নম্বর আয়াতঃ وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা 'মৃত' বলো না। তারা তো আসলেজীবিত। কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পার না।" আল্লাহর পথে নিহত হওয়াকে ইসলামীপরিভাষায় শাহাদাত বলা হয়। যিনি আল্লাহরপথে নিহত হন, তাঁকে বলা হয় শহীদ।শাহাদাতবরণ মৃত্যু বটে, কিন্তু অসাধারণ মৃত্যু,মহিমান্বিত মৃত্যু। সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল'আলামিন শহীদদেরকে 'মৃত' বলে আখ্যায়িত করতে নিষেধ করেছেন।

সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ - ১৭১ নম্বর আয়াতেআল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন শহীদদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ يُرۡزَقُونَ ١٦٩ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ وَيَسۡتَبۡشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمۡ يَلۡحَقُواْ بِهِم مِّنۡ خَلۡفِهِمۡ أَلَّا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ١٧٠ ۞ يَسۡتَبۡشِرُونَ بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلٖ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٧١

"যারা আল্লাহর পথেনিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করোনা। বরং তারা জীবিত। তাদের রবের কাছ থেকে তারা রিজিক পাচ্ছে। আল্লাহতাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা কিছুদিয়েছেন, তাতে তারা খুশি ও তৃপ্ত। আর তারাএই বিষয়েও নিশ্চিত, যেই সব মুমিন তাদের পেছনে এখনো দুনিয়ায় রয়ে গেছে, তাদেরজন্য কোন ভয় ও দুঃখের কারণ নেই। তারাআল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করে আনন্দিতএবং তারা জানতে পেরেছে, অবশ্যই আল্লাহমুমিনদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।"

শহীদেরমর্যাদা সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,"জান্নাতে প্রবেশ করার পর দুনিয়ার সমস্তসামগ্রী তার জন্য নির্ধারিত হলেও কোনব্যক্তি পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না।কিন্তু শহীদ এর ব্যতিক্রম। তাকে যেই মর্যাদা দেয়া হবে তা দেখে সে দশবার পৃথিবীতেএসে শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে।"শাহাদাত লাভের পর পরই যাঁরা আল্লাহ রাব্বুল'আলামিনের সান্নিধ্যে এমনভাবে সমাদৃত হন,তাঁদেরকে 'মৃত' বলা আসলেই শোভনীয় নয়।

আল বাকারা ১৫৫ নম্বর আয়াতঃ وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿۱۵۵﴾

"এবং আমি অবশ্যই ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি, ক্ষুধা-অনাহার এবং অর্থ-সম্পদ, জান ও আয়-উপার্জনের লোকসান ঘটিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো।এমতাবস্থায় যারা সবর অবলম্বন করবে, তাদেরকেসুসংবাদ দাও।

"এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন তাঁরএকটি শাশ্বত বিধানের কথা মুমিনদেরকে স্মরণকরিয়ে দিয়েছেন। আর সেটি হচ্ছে : যাঁরা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিনের প্রতি নিখাদ ঈমানআনার ঘোষণা দেবেন, তাঁদেরকে তিনি অবশ্যইপরীক্ষার সম্মুখীন করবেন। এ ছাড়াও-

সূরা আনকাবুতের ২ ও ৩ ঃ

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ٢ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٣

২. মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দেয়া হবে?তাদের পূর্বে যারা ছিল আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম; অতঃপর আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যেবাদী।

সূরা মুহাম্মাদের ৩১ ঃ

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ ۙ وَ نَبْلُوَا۠ اَخْبَارَكُمْ ﴿۳۱﴾

আমি তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি জেনে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ আর ধৈর্যশীলদেরকে, আর তোমাদের অবস্থা যাচাই করতে পারি।

সূরা আলে ইমরানের ১৪২ ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۴۲﴾

১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি?

সূরা আত্ তাওবা-র ১৬ ঃ-

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تُتۡرَكُوۡا وَ لَمَّا يَعۡلَمِ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ جٰهَدُوۡا مِنۡكُمۡ وَ لَمۡ يَتَّخِذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَ لَا رَسُوۡلِهٖ وَ لَا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَلِيۡجَةً ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۶﴾

- নিশ্চয় তিনিই আল্লাহ, আসমান ও যমীনের মালিকানা তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।

সূরা আল বাকারার ২১৪ ঃ

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاۡتِكُمۡ مَّثَلُ الَّذِيۡنَ خَلَوۡا مِنۡ قَبۡلِكُمۡ ؕ مَسَّتۡهُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلۡزِلُوۡا حَتّٰى يَقُوۡلَ الرَّسُوۡلُ وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ مَتٰى نَصۡرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصۡرَ اللّٰهِ قَرِيۡبٌ ﴿۲۱۴﴾

(২১৪) তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা এমনি এমনিই বেহেশত প্রবেশ করবে; যদিও পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অবস্থা এখনো তোমরা প্রাপ্ত হওনি? দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-বালাই তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। তারা এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে, রসূল ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?'জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।

সূরা আলে ইমরানের ১৪৬ ঃ

وَ كَاَيِّنۡ مِّنۡ نَّبِىٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوۡنَ كَثِيۡرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوۡا لِمَاۤ اَصَابَهُمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَ مَا ضَعُفُوۡا وَ مَا اسۡتَكَانُوۡا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيۡنَ ﴿۱۴۶﴾

(১৪৬) কত নবী যুদ্ধ করেছেন। তাদের সাথে ছিল বহু রববানী (আল্লাহভক্ত) লোকও। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বলও হয়নি এবং নত হয়নি। বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন।

এ হচ্ছে পরিক্ষা সম্পর্কিত বহুসংখ্যক আয়াতের মাত্র কয়েকটি।

" ঈমানের দাবি হচ্ছে, আল্লাহর জমিনেআল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিতহওয়া এবং এই সংগ্রাম চালাতে গিয়ে যতপ্রকারের বাধাই আসুক না কেন তার মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা। এই সংগ্রামচালাতে গিয়ে মুমিনদেরকে অনিবার্যভাবেভীতিপ্রদ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে,কখনো কখনো অবস্থা এমন সঙ্গিন হতে পারে যেঅনাহারে থাকতে হবে, কখনো কখনো বাগ-বাগিচা, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, ঘরদোরের ওপরহামলা হতে পারে, কখনো কখনো ইসলামবিদ্বেষীদের হাতে আপনজন ও সহকর্মীদের কেউ কেউ প্রাণ হারাতে পারেন এবং কখনো কখনো আয়-উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যেতেপারে। এমন সব কঠিন পরিস্থিতিতেও যাঁরা সবরঅবলম্বন করতে পারবেন, তাঁদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন মুহাম্মাদুররাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন।

শিক্ষাঃ

১. সমাজ ও সভ্যতার ইসলাহ বা পরিশুদ্ধি করতে গেলে মুমিনদেরকে অবশ্যই বাধা-বিপত্তিরসম্মুখীন হতে হবে। এমতাবস্থায় তাঁদেরকে সবর ওসালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাইতেথাকতে হবে।

২. আল্লাহর পথে যাঁরা শহীদ হন তাঁদেরকে 'মৃত'বলে আখ্যায়িত করা যাবে না।

৩. আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন ভীতিপ্রদপরিস্থিতি, ক্ষুধা-অনাহার এবং অর্থ-সম্পদ, জানও আয়-উপার্জনের লোকসান ঘটিয়েমুমিনদেরকে পরীক্ষা করবেন। এমতাবস্থায়যাঁরা দৃঢ়তা-অটলতা-অবিচলতা অবলম্বন করবেন,তাঁদের জন্যই রয়েছে আল্লাহর বিপুল অনুগ্রহ ওরাহমাত।

বই নোটঃ ইসলাম ও জাহেলিয়াত

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র:)

বই পরিচিতি ঃ ১৯৪১ সালে ২৩শে ফেব্রুয়ারীতে ইসলামী কলেজের মসলিসে ইসলামীয়াতেপ্রদত্ত ভাষণ-

ভূমিকাঃ আচরনের সাধারন নীতি: -

= কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, আচরন, ব্যবহারের পূর্বেই তার সম্পর্কে ধারনা নেয়া।

= ব্যক্তি বা বস্তুর অভ্যন্তরীন নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা সম্ভব না হলে বাহ্যিক নিদর্শন সমূহ থেকে ধারনা গ্রহন করতে হবে।

= নির্ধারিত ধারনার ভিত্তিতে ভালবাসা, ভয়, সম্মান, উপেক্ষা, রক্ষনাবেক্ষন, পরিত্যাগ ইত্যাদি হয়ে থাকে।

=প্রাপ্ত জ্ঞান বা ধারনা যত নির্ভুল হবে আচরন বা ব্যবহার তত নির্ভুল হবে।

জ্ঞানের সাধারন উৎস: যে কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভের উৎস- ৩ টি।

১. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষন,

২. আন্দাজ, অনুমান বা অমূলক ধারনা, ৩. নির্ভূল বিজ্ঞান

মানব জীবনের মৌলিক সমস্যা:

১. মানব মনের স্বাভাবিকপ্রশ্ন:

ক) নিজ সত্ত্বা সম্পর্কিতপ্রশ্ন। খ) মানব সমাজ সম্পর্কিত প্রশ্ন।
গ) বিশ্ব প্রকৃতি ও বস্তু জগৎ সম্পর্কিত প্রশ্ন।

২. মানব মান ও প্রশ্নের উত্তর:

= সকল মানুষের মনে এর উত্তর বিদ্যমান তবে সকলের কাছে এর দার্শনিক উত্তর নাও থাকতে পারে।
= চিন্তা সংগঠিত বা অসংগঠিত হতে পারে এবং এর ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদিত হয়।
= মানুষের সকল কর্ম তার একটি চিন্তা বা দর্শনেরপ্রতিফলন।

৩. উত্তরের গুরুত্ব:

= উত্তরের গুরুত্ব ব্যক্তি, দল বা জাতির জন্যে সমান।
= এর ভিত্তিতে সমাজ,রাষ্ট্র বা সভ্যতার জন্য বিধান কর্মসূচী রচিত হয়।
= এর ভিত্তিতে নৈতিক মূল্যায়ন নির্ধারন জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের বাস্তব রুপ হবে।
= চিন্তা ও দর্শন থেকে যেমন বাস্তব রুপায়ন হয় তেমনি বাস্তব আচরন থেকে চিন্তা বা দর্শন পাওয়া যায়।

৪. প্রশ্নপত্রের উত্তরের উৎস:

=যেহেতু প্রশ্নগুলো ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে নয় এ কারনে কোথাও উত্তর সুনির্দিষ্টভাবে লেখা নেই যে জম্ে র পরপর পড়ে নিজ যোগ্যতা বলে বুঝে নিবে।
= উত্তর এমন সহজ ও সুস্পষ্ট নয় যেপ্রত্যেকে তা সহজেই জেনে যাবে।
= এ সকল পন্থায়প্রাপ্ত উত্তরসমূহ কি কি?

৫. উত্তর নির্ধারনের উপায়:

= নিজের বাহ্যন্দ্রিয়ের উপর নিভর্র করা এবং তদলব্দ জ্ঞানের ভিত্তিতে উত্তর নির্ধারন।
= ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পর্যবেক্ষন এবং এর সাথে অনুমান ধারনা যোগ করে একটি নীতি ঠিক করা।
= আল্লাহ প্রেরিত নবীগনপ্রকৃত সত্য জানা দাবী করে উক্ত প্রশ্নাবলীর যে উত্তর দিয়েছের তা গ্রহন করা।

উত্তরের বিভিন্নতার প্রভাবঃ

উত্তর লাভের জন্য আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত পন্থা তিনটি।
প্রত্যেকটির উত্তর স্বতন্ত্র আচরন নীতি, নৈতিক আদর্শ স্বতন্ত্র, সাহিত্য সাংস্কৃতির ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র।

নির্ভেজাল ও শিরক মিশ্রিত জাহেলিয়াতের পার্থক্যঃ

= শিরকে পূজা মানত অর্ঘ্য ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আধিক্য নির্ভেজালে এসবের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু নৈতিক চরিত্র ও কমের্র ক্ষেত্রে কোন তফাৎ নেই।
= শিরকের শিক্ষা শিক্ষাদর্শন। সাহিত্য রাজনীতির জন্য পৃথক কোন মূলনীতি নেই। তাই নির্ভেজাল থেকে তা গ্রহন করে।
= মুশরিক কল্পনা বিলাসী। নির্ভেজাল বাস্তব কর্মী।
= শিরকের রাজ্যে রাজা ও ধর্মীয় নেতাগন খোদার আসনে। বংশ এবং শ্রেণী প্রধানের উপর এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত।
= নির্ভেজালের রাজত্বে পরিবার পূজা, বংশপূজা, জাতি পূজা, একনায়কতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ শ্রেণী সংগ্রামে পরিগ্রহ হয়।

বৈরাগ্যবাদঃ বাস্তব পর্যবেক্ষনের সাথে আন্দাজ অনুমানের সংমিশ্রনে মানব জীবনের মৌলিক প্রশ্নসমূহের যে সব উত্তর ঠিক হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল বৈরাগ্যবাদ।

বৈশিষ্ট্য:

১. পৃথিবী এবং মানুষের শারীরিক স্বত্ত্বা স্বয়ং মানুষের জন্য একটি শাস্তি কেন্দ্রবিশেষ আর মানুষের আত্মাকে দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীর ন্যায় পিঞ্জিরাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

২. ঈন্দ্রিয়ের সকলপ্রয়োজন ও বাসনা বন্দী খানার শৃংখলের ন্যায়।

৩. মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় প্রকৃতিগত বিভিন্ন প্রয়োজনকে কঠোরভাবে অবদমিত করা, স্বাদ আস্বাদন পরিহার করা এবং দেহ মনের কঠোর কৃচ্ছ সাধন।

৪. স্রষ্টার অস্তিত্ব ও অন্যান্য মৌলিক ব্যাপারে এর সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই কার্যত নিরব।

সর্বেশ্বরবাদ: অবাস্তব আন্দাজ অনুমান ভিত্তিক পর্যবেক্ষন ও অনুশীলনের ফলে তৃতীয় যে মতটির সৃষ্টি হচ্ছে তা হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ।
বৈশিষ্ট্য: ১. বিশ্বপ্রকৃতির আলাদা কোন সত্তা নেই। মূলত একটি সত্তাই সমস্ত বস্তুজগতের মাধ্যমে স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রকাশমান।
ইসলাম: মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নসমূহের যে জওয়াব আল্লাহ প্রেরিত নবীগন দিয়েছেন তা আন্তরিকতা সহকারে পূর্ণ রুপে গ্রহন করার নামই ইসলাম।

নির্ভুল পথ লাভের সাধারন নিয়ম:

১. পথ অনুসন্ধান:

= কোন অপরিচিত স্থানে পরিভ্রমন।
= কোন রুপ অভিজ্ঞতা না থাকলে অন্য কারো নিকট হতে জিজ্ঞাসা।
= পথ নির্দেশ লাভ ও সে স্থানে ভ্রমন।
২. বৈজ্ঞানিক পন্থা: এক্ষেত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞতার পূর্ন দাবীদার খোজা।
= দাবীদার বিশ্বাসযোগ্য ও নিভরযোগ্য কিনা তা যাচাই করা।
= দাবীদারের নেতৃত্বে পথ চলা।
= বাস্তব অভিজ্ঞতার দাবীপ্রমাণ।

মানুষ ও বিশ্ব সম্পর্কে নবীর মত:
১. বিশ্বজাহান সৃষ্টি ও পরিচালনা করেন মহান আল্লাহ।
২. মানব সৃষ্টি ও তার অবস্থান।
৩.মানুষের পারস্পরিক আচরন ও বস্তুসামগ্রী ব্যবহার নীতি।
৪. আল্লাহর বিধানপ্রদর্শনের দায়িত্ব রাসূল সা: এর উপর।
৫. মানুষের মর্যাদা ও দায়িত্ব।
৬. পরকালীন জীবন ও জবাবদিতা।

মানুষের তৎকালীন সাফল্য দুটি বিষয়ের উপর নিভ্রশীল:

১. মানুষ নিজের বুদ্ধি, বিবেক,প্রতিভার নির্ভুলপ্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালাকে প্রকৃত ও একমাত্র ব্যবস্থাপক ও আইন রচয়িতা এবং তার নিকট হতেপ্রাপ্ত শিক্ষা ও বিধানকে যথার্থ আল্লাহর বিধান হিসেবে জানতে পারলো কি না?

২. এ নিগূঢ় সত্য জেনে নেওয়ার পর পথ নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকা সত্বেও মানুষ নিজের আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে আল্লাহ তায়ালার বাস্তব প্রভূত্ব ও শরীয়তী বিধানের কাছে মাথা নত করলো কিনা?

ইসলামী মতবাদ:
১. বৈজ্ঞানিক, নির্ভুল ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।
২. ফিতরাতের বিধান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা উত্তরন।
৩. পার্থিব জীবনে এর ফলাফল:
ক) ব্যক্তিগত জীবনে দায়িত্বশীলতা ও উন্নত নৈতিকতা।
খ) বৈষম্যহীন ও নিরপরাধ সমাজ ব্যবস্থা।
গ) ইসলামের সার্বজনীনতা ও সরলতা।
ঘ) রাষ্ট্রব্যবস্থার বুনিয়াদ মানবপ্রভুত্বের উপর নয়, আল্লাহর প্রভুত্বের উপর।
ঙ) সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আত্মপূজার পরিবর্তে আনুগত্য।
চ) বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আহবান।
= নবীদের উপস্থাপিত পথে পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং নবীদের আনীত পথ তথা ইসলাম সঠিক পথ এবং এটাই একমাত্র অনুসরনীয়।

তাকওয়া সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত
(দেখুন ক্লাশ নোট-১১)

তাক্বওয়া সংক্রান্ত

হাদীসঃ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا।

সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন সৈন্যদলের আমীর নির্ধারণ করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করার তথা তাক্বওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ করতেন। আর সাধারণ মুসলিম যোদ্ধাদেরকে কল্যাণের উপদেশ দিতেন' (মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১২৬৮)।

ঈদ সম্পর্কিত মাসায়েলঃ

আল্লাহর জিকির ও তার বড়ত্বের ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় মুসলিমদের ঈদ। ঈদের দিনে মুসলিমদের প্রথম ও প্রধান আমল হলো ঈদের নামাজ।

ঈদের নামাজ কাদের ওপর ওয়াজিব

মাসায়ালা: যাদের ওপর জুমার নামাজ ফরজ, তাদের ওপর ঈদের নামাজ ওয়াজিব।অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, যেসব মুসলিমপুরুষ, জামাতে উপস্থিত হয়ে ঈদের নামাজ আদায়ের সক্ষমতা রাখে তাদের ঈদের নামাজ পড়তে হবে। (আলমুহিতুল বুরহানি ২/৪৭৬; বাদায়েউস সানায়ে ১/৬১৭; শরহুল মুনইয়া, পৃ. ৫৬৫)

নারীদের ওপর ঈদের নামাজ ওয়াজিব নয়। অনুরূপ এমন অসুস্থ পুরুষ, যে ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে ঈদের নামাজ আদায়ের সক্ষমতা রাখে না, তার ওপরও ঈদের নামাজ ওয়াজিব নয়।(কিতাবুল আছল ১/৩২৩; মাবসুত, সারাখসি ২/৪০; আলমুহিতুল বুরহানি ২/৪৮৫; বাদায়েউস সানায়ে ১/৬১৭)

মুসাফির তথা যে ৪৮ মাইল বা ৭৮ কিমি দূরত্বে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজ এলাকা ত্যাগ করেছে– এমন ব্যক্তির ওপর ঈদের নামাজ ওয়াজিব নয়। তবে সে যদি ঈদের নামাজ পড়ে তা হলে তা সহিহ হবে এবং এর সওয়াবও পাবে। (আততাজরিদ, কুদুরি ২/৯৮১; বাদায়েউস সানায়ে ১/৬১৭)

ঈদের নামাজের ওয়াক্তঃ ঈদের নামাজের ওয়াক্ত হচ্ছে– সূর্য উদিত হয়ে (নামাজের) নিষিদ্ধ সময় শেষ হওয়ার পর থেকে শুরু করে জাওয়াল তথা সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার আগ পর্যন্ত।–এই সময়ের মধ্যেই ঈদের নামাজ পড়তে হবে। জাওয়ালের পর আর ঈদের নামাজ সহিহ হবে না। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ১১৩৫)
ঈদুল আজহার নামাজ ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর দেরি না করে একটু তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। যাতে কুরবানির কাজ দ্রুত শুরু করা যায়। আর ঈদুল ফিতরের নামাজও ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আদায় করে নেবে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজজাক, বর্ণনা ৫৬৫১; আননুতাফ ফিল ফাতাওয়া, পৃ. ৬৭;)

ঈদের নামাজের স্থানঃ ঈদের নামাজ ঈদগাহে ও খোলা মাঠে পড়া সুন্নত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদিন সবাই ঈদের নামাজ ঈদগাহে পড়তেন।
হজরত আবু সাঈদ খুদরি (র) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন (ঈদের নামাজের জন্য) ঈদগাহে যেতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস ৯৬৫)
হযরত আলী (র) বলেন, দুই ঈদে (ঈদের নামাজের জন্য) খোলা মাঠে যাওয়া সুন্নত। (আলমুজামুল আওসাত, তবারানি, হাদিস ৪০৪০)

মাঠে ঈদের নামাজ পড়ার ব্যবস্থা থাকলে বিনা ওজরে মসজিদে ঈদের জামাত করবে না। তবে কোথাও বিনা জরুরতে এমনটি করা হলে ঈদের নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে শহরে ঈদগাহ কম, বিধায় অধিকাংশ মসজিদে ঈদের জামাত হয়। জায়গা সংকুলান না হওয়া বা বৃষ্টি ইত্যাদির কারণে মসজিদে ঈদের নামাজ পড়লে সুন্নতের খেলাফ হবে না।
ওজরের সময় মসজিদে পড়া হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হজরত আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–কোনো এক ঈদের দিন বৃষ্টি তাদের পেয়ে বসে। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ১১৫৩)

ঈদের নামাজে তায়াম্মুম
নামাজে শরিক হওয়ার আগমুহূর্তে কারও ওজু না থাকলে এবং ওজু করতে গেলে জামাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হলে তায়াম্মুম করে ঈদের নামাজ আদায় করা যাবে।
হজরত আব্দুর রহমান ইবনুল কাসিম (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– (ঈদের নামাজ) ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হলে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে নেবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা ৫৮৬৯)
হজরত ইবরাহিম নাখায়ি (রহ) বলেন– ঈদ ও জানাজার ক্ষেত্রে (ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায়) তায়াম্মুম করা যাবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা ৫৮৬৮) -কিতাবুল আছল ১/৩২০; আলমুহিতুল বুরহানি ২/৫০২

অনুশীলনী -১৩(**জুলাই- ১ম সপ্তাহঃ**)

দারসুল কুরআন

সুরা আল ইনফিতার

১) إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ	১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,
২) وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ	২) যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে,
৩) وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ	৩) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে,
৪) وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ	৪) এবং যখন কবরসমূহ উম্মোচিত হবে,
৫) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ	

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ (৬)
ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ (৭)
فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ (৮)
كَلَّا بَلۡ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ (৯)
وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ(১০)
كِرَامٗا كَٰتِبِينَ(১১)
يَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلُونَ(১২)
إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٖ(১৩)
وَإِنَّ ٱلۡفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٖ(১৪)
يَصۡلَوۡنَهَا يَوۡمَ ٱلدِّينِ(১৫)
وَمَا هُمۡ عَنۡهَا بِغَآئِبِينَ(১৬)
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ(১৭)
ثُمَّ مَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ(১৮)
يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٞ لِّنَفۡسٖ شَيۡـٔٗاۖ وَٱلۡأَمۡرُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ (১৯)

৫) তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।
৬) হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?
৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন।
৮) যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।
৯) কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না; বরং তোমরা দান-প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর।
১০) অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে।
১১) সম্ানিত আমল লেখকবৃন্দ।
১২) তারা জানে যা তোমরা কর।
১৩) সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে।
১৪) এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে;
১৫) তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে।
১৬) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না।
১৭) আপনি জানেন, বিচার দিবস কি?
১৮) অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি?
১৯) যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কৃত হবে আল্লাহর।

সূরা আল-ইনফিতার (سورة الانفطار) হলো পবিত্র কোরআনের ৮২তম সূরা, যার অর্থ "বিদীর্ণ হওয়া"। এই সূরায় কিয়ামত বা বিচার দিবসের বিভীষিকা এবং আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব ও মানুষের অবাধ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নামকরণ : প্রথম বাক্যের ইনফিতার শব্দটিকে নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ ফেটে যাওয়া। সাধারণত অধিকাংশ সূরার মত এখানে চিহ্নস্বরূপ এই নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল : মক্কী সূরা এবং প্রাথমিক অবস্থায় অবতীর্ণ। মক্কাবাসীদেরকে আখিরাত সম্পর্কে সচেতন করা প্রথম যুগের অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : সূরাটির বিষয়বস্তু আখিরাত। হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত একটি হাদিস, 'যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনটি নিজের চোখে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক পড়ে নেয়।'
এই সূরায় প্রথমে কিয়ামতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং সে সময়ে দুনিয়ায় কৃত ভালো ও মন্দ সকল কর্ম প্রত্যেকেই দেখবে। তারপর মানুষের সৃষ্টি এবং সকল সৃষ্টির মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞান-যোগ্যতা দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বদানের পরও তার রবকে ভুলে থাকার কারণ যে আখিরাতে অবিশ্বাস সেটি ব্যক্ত করা হয়েছে।
মানুষকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, সম্ানিত লেখকবৃন্দ তার গতিবিধি, চালচলন ও কর্মকান্ড সব লিপিবদ্ধ করছেন এবং নেককারদের শুভ পরিণতি ও বদকারদের কঠিন শাস্তির কথা এই সূরায় বলা হয়েছে। সেদিনে কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না।

কিয়ামতের বিভীষিকা:এই সূরার শুরুতে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে এবং সমুদ্রগুলো উত্তাল হয়ে উঠবে।

আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব:সূরাটিতে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে, যিনি মানুষকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য পথপ্রদর্শক প্রেরণ করেছেন।

মানুষের অবাধ্যতা:সূরাটিতে মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে অবাধ্যতা করে, তাদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

প্রতিদান ও শাস্তি:কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার কর্মফল অনুযায়ী প্রতিদান বা শাস্তি দেওয়া হবে, এই বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

শুভ ও অশুভ পরিণাম:সূরাটিতে ভালো ও মন্দের দুটি পথ এবং তাদের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যারা সৎকর্ম করে, তারা পুরষ্কার লাভ করবে এবং যারা অসৎকর্ম করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।
সারসংক্ষেপে, সূরা আল-ইনফিতার কিয়ামত ও বিচার দিবস, আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব, মানুষের অবাধ্যতা এবং প্রতিদান ও শাস্তির বিষয়ে আলোকপাত করে।

ব্যাখ্যা : প্রথম তিনটি আয়াতে কিয়ামত দিনের প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কুরআন মজিদে বিভিন্ন জায়গায় কিয়ামতের বর্ণনা রয়েছে। বর্তমানে যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার ভিত্তিতে এ বিশ্বজাহান পরিচালিত হচ্ছে, আল্লাহপাক নিজেই একদিন তা ভেঙ্গে দেবেন।

হাদিসে সিঙ্গায় তিনটি ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে। প্রথম ফুৎকারে এক প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্প, তা কোন এক নির্দিষ্ট এলাকায় নয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী সংঘটিত হবে। এখানে বলা হয়েছে যে আকাশ ফেটে যাবে, তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে এবং সমুদ্রসমূহ ফেটে যাব্ কোথাও বলা হয়েছে সমুদ্রসমূহে আগুন জ্বলতে থাকবে।

কোথাও বলা হয়েছে পাহাড়সমূহ ধূলা পশমের মত উড়তে থাকবে। মোট কথা পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, সাগর-মহাসাগর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এ জমীন এক সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। মনে হবে যেন একটি দস্তরখানা বিছায়ে দেয়া হয়েছে।

পরবর্তী ফুৎকারে সব মানুষ কবর থেকে উঠে আসবে এবং সে তখন সামনের ও পেছনের ঘটে যাওয়া সকল কৃতকর্ম জানতে পারবে। অর্থাৎ সে তার জীবদ্দশায় ভালো-মন্দ যা করেছে তা যেমন জানতে পারবে তেমনি মৃত্যুর পরে তার রেখে আসা আমলের দ্বারা অন্যান্যরা প্রভাবিত হলে তারও ছওয়াব ও গুনাহের সে ভাগীদার হবে।

৬-১২ আয়াতে মানুষের সুন্দর গঠন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সুসামঞ্জ্যকরণ ও বিভিন্ন আকৃতিতে সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করে তার মধ্যে সম্বিত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। ময়ের গর্ভে পিতার শুক্রকীট নিক্ষেপ এবং ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মানবশিশুর জন্ম আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। মানবশিশুর বেড়ে উঠা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোজন, প্রাণের সঞ্চার আল্লাহর ইচ্ছার ফলেই সম্ভব হয়।

তারপর মানুষের আকার-আকৃতি, চেহারা, কণ্ঠস্বর, এমন কী বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপের ভিন্নতাসহ প্রত্যেককে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি আল্লাহপাকের অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞারই পরিচায়ক। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এ দুনিয়ায় আসবে কারো সাথে কারো কোন মিল হবে না; সবাই স্বতন্ত্র দৈহিক কাঠামো, রুচি-পছন্দ নিয়ে এ পৃথিবীতে আগমন করবে-এ সব চিন্তা করলে আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত না হয়ে উপায় থাকে না।

কিন্তু মানুষ উল্টো তাঁর নাফরমানিতেই লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহর ভাষায় এর মূলে কারণ একটিই এবং তা হলো আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস। অথচ মানুষের ভালো-মন্দ সকল কাজই আল্লাহর নিযুক্ত ফেরেশতা কর্তৃক রেকর্ডভুক্ত হচ্ছে এবং তাঁরা হলেন সম্মানিত, অর্থাৎ তাঁরা এমন নন যে, কোন ধরনের পক্ষপাতিত্ব বা ঘুষ-দুর্নীতির বিনিময়ে মিথ্যা লেখার মত তাঁরা নন।

তাঁদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা দুনিয়ার সরকারসমূহের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের মত নন যারা হাজারো চেষ্টা করেও অনেক সময় প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হন। আল্লাহর ফেরেশ্তারা সকল বিষয়ে জ্ঞাত; কোন কিছুই তাঁদের অগোচরে নয়।

পৃথিবীতে মানুষের আচার-আচরণ, চাল-চলন ও কর্মকান্ডে যেমন ভিন্নতা রয়েছে, তেমনি আখিরাতে তাদের পরিণতিও ভিন্ন হবে। এখানে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করেছেন যে, বর্তমান দুনিয়ায় যারা নেক কাজ করবে তারা আখিরাতে পরমানন্দে থাকবে; পক্ষান্তরে পাপীদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ আযাব। যারা জাহান্নামে যাবে কখনই সেখান থেকে তারা সরে পড়তে পারবে না। সেদিনের অবস্থা ব্যাখ্যা করতে যেয়ে আল্লাহপাক বলেছেন, আখিরাতে কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না।

অতীতকালে মানুষের একটি ধারণা ছিল যে, নবী-রসূল বা আল্লাহর নেক বান্দারা বা তাদের উপাস্য দেবতারা সুপারিশ করে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিবে। এ ভ্রান্তি বর্তমানেও রয়েছে, যার কারণে মানুষ বিভিন্ন মাজার ও দরবারে ঘুরাঘুরি করে। এখানে বলা হয়েছে, কারোর জন্য কোন কিছু করার সাধ্য কারোর থাকবে না। ফয়সালা সেদিন একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে থাকবে।

অবশ্য শিরকমিশ্রিত শাফায়াতের পরিবর্তে ইসলাম আমাদের সম্মুখে তাওহীদভিত্তিক সুপারিশের ধারণা প্রদান করেছে। সুপারিশ প্রসঙ্গে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার জন্য সুপারিশ পছন্দ করবেন কেবল তিনিই সুপারিশ করতে পারবেন। আল্লাহর ওপর প্রভাব বিস্তার করে বা সুপারিশের মাধ্যমে কাউকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নেয়ার ক্ষমতা সেদিন কারো থাকবে না।

আল্লাহপাকের ক্ষমা করার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে সেদিন কিছু লোককে তিনি সুপারিশ করার সুযোগ দান করবেন (নবী-রসূল ও নেক বান্দারা) এবং এর মাধ্যমে তিনি তাঁর নেক বান্দাদের মর্যাদা উচ্চে তুলে ধরবেন ও কিছু গোনাহগার বান্দাকে শাস্তি থেকে রেহাই দান করবেন।

শিক্ষা : আখিরাতের প্রতি ঈমান আনায়নই এই সূরার মৌলিক শিক্ষা। সমাজে জুলুম-নির্যাতন ও নানাবিধ পাপাচারের মূল কারণ আখিরাতে অবিশ্বাস। প্রথমত কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে; এরপর মানুষের সৃষ্টি প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন যে, আল্লাহর নাফরমানির পেছনে পরকাল অবিশ্বাস ছাড়া আর কোন কারণ নেই।

আল্লাহপাক আমাদেরকে পরকাল বিশ্বাসের মাধ্যমে সকল পাপাচার থেকে মুক্ত থেকে নেক আমল করার তাওফিক দান করুন।

বইনোটঃ সত্যের সাক্ষ্য,

লেখকঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র:)
সাক্ষ্যঃ নিজে যা জানে তা অন্যের কাছে বলা বা যথাযথভাবেপ্রকাশ করার নামই সাক্ষ্য।
সত্যের সাক্ষ্যঃ আল্লাহর পক্ষথেকে যে সত্য এসেছে, উদ্ভাসিত হয়েছে, তার সত্যতা দুনিয়ার সামনে এমনভাবেপ্রকাশ করা যাতে দ্বীনের যথার্থতাপ্রমানিত হয়, এটাই সত্যের সাক্ষ্য।
সত্যের সাক্ষ্য দানের গুরুত্ব:
১. সাক্ষ্যদানের ভিতিত্তেই হাশরের ময়দানে ফয়সালা হবে।
২. সাক্ষ্যদান সকল নবীর সুন্নাত।
৩. সত্যের সাক্ষী না হলে যালেমদের অন্তভূক্ত হবে।
৪. সাক্ষ্য না দিলে দুনিয়ার লাঞ্ছনা, অপমান, অধঃপতন চেপে বসবে।
৫. সাক্ষ্য দান আল্লাহর পক্ষথেকে দেয়া দায়িত্ব।

সাক্ষ্যদানেরপ্রকারভেদ: ২প্রকার
১. মৌখিক সাক্ষ্য: নবী (সা:) এর মাধ্যমে আমাদের কাছে যে সত্য এসে পৌছেছে তা বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে মানুষের কাছে সহজবোধ্য করাকে মৌখিক সাক্ষ্য বলে। দাওয়াতের সকল পদ্ধতিপ্রয়োগ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল উপাদান ব্যবহার করে ইসলামকে একমাত্র সঠিক পরিপূর্ণ বিধান হিসাবেপ্রমান এবংপ্রতিষ্ঠিত বাতিল মতাদশের্র দোষ ত্রুটি তুলে ধরা।
২. বাস্তব সাক্ষ্য: যা মুখে বলা হয় তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের সামনে তার সত্যতা প্রমান। সৌন্দর্য্য ও কল্যানকারীতা প্রদর্শন করা নয়।
সাক্ষ্য দানের পূর্ণতা: আল্লাহর দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে মানতে পারলেই দ্বীনের পূর্ণ সাক্ষ্যপ্রদান হবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকলে দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে মানা সম্ভব নয়। সুতরাং শুধুমাত্রদ্বীনপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সাক্ষ্যদানের পূর্ণতা সম্ভব।

সত্য গোপনে শাস্তি:
১. দুনিয়ার শাস্তি:
= গোটা দুনিয়ায় মুসলমানরা নির্যাতিত।
= পূর্বে ইসলামপ্রতিষ্ঠিত স্থানগুলো মুসলমানদের স্থানচ্যুত হয়ে যাওয়া।
২. আখেরাতের শাস্তি: সত্যের সাক্ষ্য না দিলে দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি হয়। দায়িত্ব পালন না করার কারনে পরকালে কঠিনতম শাস্তি ভোগ করতে হবে।

মুসলমানদের সমস্যা:
চিন্তার ত্রুটি: অন্যান্য জাতি পার্থিব যেসব সমস্যাকে মূল সমস্যা হিসেবে গুরুত্ব দেয় আমরাও সেসব বিষয়কে একই ভাবে গুরুত্ব দিই। যেমন: সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলিম।
সঠিক চিন্তা: যাবতীয় সমস্যার উৎস মূল দায়িত্ব তথা সত্যের সাক্ষ্যদান হতে বিমুখতার পরিনতি। কারন এ দায়িত্ব পালন না করার কারনেই অন্যেরা এসব সমস্যার সৃষ্টির সুযোগ পাচ্ছে।
যেমন: আর যে সংখ্যালঘু মুসলিম জাতি সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে সংখ্যাগুরুত্ব এ পরিনত হয়েছে।

সমস্যার সমাধান:
যাবতীয় সমস্যা সমাধানের পথ হচ্ছে যথাযথভাবে সত্যের সাক্ষ্য পেশ করা।
আসল সমস্যা: দুনিয়ায় মুসলিম হিসাবেপ্রতিনিধিত্বের দাবী ইসলামের, বাস্তবে ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করি।
ফলাফল:
= দুনিয়ার মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ভুল তথ্য জানছে।
= মানুষ আমাদের কারনে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারছে না।

মুসলমানদের দুনিয়ায় ব্যর্থতার কারণ: ইসলামের লেবেল খুলে দিয়ে কুফরী গ্রহন করলে দুনিয়াবী জিন্দেগী চাকচিক্যময় হত। কিন্তু নাম ও কর্ম সংঘাত হওয়ায় উন্নতিও বন্ধ।

আমাদের কর্মপদ্ধতি:

= মুসলমানদের ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানপ্রদান এবং তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা।

= শুধু ব্যক্তিজীবন নয় ইসলামকে মানা এবংপ্রতিষ্ঠার জন্য সামষ্টিক বা সংগঠনিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এটা বুঝিয়ে দেয়া।

কাজের পথ:

= আমাদের নিয়ম, শৃংখলা, কর্মনীতি, আকীদা ভাল লাগলে আমাদের সাথে যোগদান করা।

= অন্যদলকে আমাদের চেয়ে খাঁটি মনে হলে সে দলে যোগ দেয়া।

= কোন দল খাঁটি মনে না হলে নিজের উদ্যোগে দল গঠন করা।

দ্বীনের একাধিক দল গঠনের আশংকা: আপাতত দৃষ্টিতে ইসলামী দল বেশি হলে বিশৃংখলা দেখা দিবে।

একাধিক দল গঠনের কারণ:

নবী করীম সা: পরিচালিত সংগঠনই শুধুমাত্র "আল জামায়াত" হিসাবে দাবী করতে পারে। অন্য কোন দলকে "আল জামায়াত" বলা যাবে না। সুতরাং দ্বীনের জন্য একাধিক দল গঠনে বাধা নেই।

ফলাফল: নিষ্ঠার সাথে সবাই কাজ করলে লক্ষ্য যেহেতু একই সেহেতু মাঝপথে মিলিত হবে।

বাইয়াত সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত

বাইয়াত সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত

সুরা আত তাওবা -১১১

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۟ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١١﴾

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।

সুরা আল আনআম- ১৬২

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾

বল, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব'।

আল-ফাতহ: ১০

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٠﴾

আর যারা তোমার কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর; অতঃপর যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলে তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই উপর। আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে অচিরেই আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।

আল-ফাতহ: ১৮

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কী ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে।

মুমতাহিনা: ১২

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّ لَا يَسْرِقْنَ وَ لَا يَزْنِيْنَ وَ لَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَ لَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

হে নবী, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাইআত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাইআত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বাইয়াত সংক্রান্ত হাদিসঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَيُلَقِّنُنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ

ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করতাম যে, আমরা তাঁর কথা শুনব এবং আমল করব। আর তিনি আমাদেরকে এরূপ শিক্ষা দিতেন যে তোমরা তোমাদের সাধ্যমত দীনের কাজ করবে। (আবু দাউদ, ইসলামি ফাউন্ডেশন ২৯৩০)

একাধিক বার বাইয়াত নেওয়া প্রসঙ্গেঃ

عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي " يَا سَلَمَةُ أَلاَ تُبَايِعُ ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الأَوَّلِ. قَالَ " وَفِي الثَّانِي ".

সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বৃক্ষের নিচে বায়আত (বায়আতে রিদওয়ান) গ্রহণ করেছিলাম। পরে তিনি আমাকে বললেনঃ হে সালামা! তুমি বায়'আত গ্রহণ করবে না? আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি তো প্রথমবার বায়আত গ্রহন করেছি। তিনি বললেনঃ দ্বিতীয়বারও গ্রহণ কর। (বুখারী, ইসলামি ফাউন্ডেশন ৬৭১৫)

মাসআলাঃ নামায সংক্রান্ত (পৃষ্ঠা-০৩)
অনুশীলনী -১৪(**জুলাই-৩য় সপ্তাহঃ)**
দারসুল কুরআন
সুরা আল ইনফিতার - পৃষ্ঠা-৩১

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
লেখকঃ আব্বাস আলী খান
প্রকাশকঃ আবু তাহের মুহম্ দ মাসুম, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, প্রকাশনা বিভাগ
প্রথম প্রকাশ-জুলাই ১৯৮৬

ভুমিকাঃ দশ বছর পূর্বে ১৯৮৬ সালে এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। যাঁরাই জামায়াতে ইসলামীর সাথে সঠিকভাবে পরিচিত হতে চান এবং যাঁরা এ আন্দোলনের সাথে জড়িত হতে চান, তাঁদের অবশ্য অবশ্যই জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস মন দিয়ে পড়া উচিত। জামায়াতের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ এবং আদর্শিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ লাভের জন্যে এ ইতিহাস পাঠ অপরিহার্য। ইতিহাস ও কাল পরিক্রমায় দেখা যায়, কোন একটি আন্দোলন অথবা জাতি যুগের পর যুগ অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে কিছু বিকৃতি বা আদর্শচ্যুতি শুরু হয়। এমন সময়ে তার প্রতিরোধ করতে না পারলে অথবা প্রতিরোধের চেষ্টা না করলে অবশেষে তার পতন ঘটে। ঠিক তেমনি জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে একটি দ্বীনি আন্দোলনের সম্ভাব্য বিকৃতি অথবা পতন রোধ করতে হলে জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস দৈনন্দিন পাঠ্য তালিকায় রাখতে হবে।

এ ইতিহাস যদিও তার প্রাথমিক যুগের সাত বছরের ইতিহাস, কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে জামায়াত গঠনের পটভূমি, উপমহাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি যথা একজাতীয়তার ভিত্তিতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প, সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একাকার করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র প্রভৃতি।

এ ইতিহাসে জামায়াতের আদর্শ, লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি, ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া ও ইহসানের সহজ সরল ব্যাখ্যা, যা নিয়ে ইসলামের প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে, আন্দোলনের নেতাকর্মীদের অপরিহার্য গুণাবলী প্রভৃতি বিষয়গুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জামায়াত গঠনকালে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন সম্ে লনে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা যেসব অমূল্য ভাষণ দিয়েছেন, পাঠক অবশ্যই তার থেকে একামতে দ্বীনের প্রেরণা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়ার মনমানসিকতা ও রূহের খোরাক এবং এ সব হতে তাঁর এ কঠিন পথে চলার মূল্যবান পাথেয় লাভ করতে পারবেন।

সূচিপত্র

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস- ১৯৪১-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত

প্রথম অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী কি?
ইসলামী আন্দোলনের সূচনা
মানব জাতির দুঃখ-দুর্দশা ও ধ্বংসের কারণ
খোলাফায়ে রাশেদীনের ইসলামী আন্দোলন
খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামী আন্দোলন
ভারতে ইসলামী আন্দোলন

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়
আল-জিহাদু ফিল ইসলাম গ্রন্থ

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা ও ইসলামী আন্দোলনের প্রস্তুতি স্তর
তৎকালীন ভারতে মুসলমানদের অবস্থা
তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন
দারুল ইসলাম ট্রাস্ট গঠন ও ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে
দল গঠনের পটভূমিকা রচনা
দারুল ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ

চতুর্থ অধ্যায়

দারুল ইসলাম পরিকল্পনা ও মাওলানা মওদূদী
মাওলানার বক্তব্য
দারুল ইসলাম সম্পর্কে আরো কিছু কথা
দারুল ইসলামের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা
দারুল ইসলামের গঠনতন্ত্র
কাজের চিত্র
ইসলামী সীরাত
আর্থিক উপায়-উপকরণ
উদ্দেশ্য হাসিলের পথ
প্রতিরোধ
গঠনমূলক কাজ
তাত্ত্বিক বিভাগ
ব্যবহারিক বিভাগ
কাজের প্রসার

পঞ্চম অধ্যায়

মাওলানা মওদুদীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা
তর্জুমানুল কুরআনে মাওলানা বলেন
মাওলানা জিজ্ঞেস করেন
ইসলামী জাতীয়তা
মাওলানা বড় সত্য কথা বলেন
ধর্মহীন সংবিধান সম্পর্কে মাওলানা বলেন
বৃটিশ পূজারী বলে যারা গালি দেয় তাদের জবাবে মাওলানা বলেন
ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে মাওলানা বলেন
মুসলিম জাতীয়তা
মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত (প্রথম খণ্ড)
অভাব কিসের?
মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত (দ্বিতীয় খণ্ড)

ষষ্ঠ অধ্যায়

শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব
একজাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীদের সমালোচনা
পাশ্চাত্য জাতীয়তা, ইসলামী জাতীয়তা ও একজাতীয়তা
প্রথম প্রস্তাব
দ্বিতীয় প্রস্তাব
তৃতীয় প্রস্তাব
জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা
জামায়াতে ইসলামীর কাজ
জামায়াতের গঠনতন্ত্র অনুমোদন
জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত
আমীরে জামায়াতের সাংগঠনিক ও দাওয়াতী সফর

জামায়াত দফতর স্থানান্তর
মাওলানার বিশেষ হেদায়েত
মাওলানার অসাধারণ কর্মব্যস্ত জীবন (১৯৩৯-৪২)

সপ্তম অধ্যায়

জামায়াত সংকটের সম্মুখীন
আন্দোলনের বিরোধিতা
মজলিসে শূরার জরুরী বৈঠক
অস্থায়ীভাবে দারুল ইসলামে কেন্দ্র স্থানান্তরিত
নতুন কেন্দ্রে নতুন পরিকল্পনা
মতপার্থক্য ও তার সমাধান
সাংগঠনিক কাজের পর্যালোচনা
মহাযুদ্ধ আন্দোলনের বিরাট প্রতিবন্ধক
সংগঠন ও প্রশিক্ষণের স্তর
তিনটি আঞ্চলিক সম্মেলন
মধ্যভারতের সম্মেলন
ইসলামী দাওয়াতের রিপোর্ট ও তার পর্যালোচনা
একটি অর্থনৈতিক স্কীম
সংগঠন, তরবিয়ত ও তাকিয়া
সমাজ স্বয়ং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সম্মেলনের উদ্দেশ্য
তরবিয়তী ব্যবস্থা খানকাহী নয়- আন্দোলনমূলক
যাহের ও বাতেনের সংশোধনের কাজ
উত্তর ভারতীয় সম্মেলন
রুকনিয়াতের শপথ ও স্থবিরতা
দিল্লী সম্মেলন।
কর্মীদের গুণাবলী
মুবাল্লিগের সর্বোৎকৃষ্ট কাজ
কাইয়েমে জামায়াত নিয়োগ
হায়দরাবাদ সম্মেলন
মাওলানার উদ্বোধনী ভাষণ

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন
আমীরে জামায়াতের উদ্বোধনী ভাষণ
জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত
নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য: নবী মুস্তাফার (সঃ) সে উদ্দেশ্য পূরণের পদ্ধতি

নবম অধ্যায়

সম্প্রসারণ ও উন্নতির যুগ
দ্বিতীয় নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামী রুকন সম্মেলন
জামায়াতে ইসলামীর
শূরায়ী নিযামের (পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থার) ক্রমোন্নতি
জামায়াতে সমালোচনার নিয়মিত ব্যবস্থা
সমাজের মধ্যে জামায়াতের প্রভাব বিস্তার
উলামায়ে কেরামের মধ্যে দাওয়াতের প্রভাব
আধুনিক শিক্ষিত লোকের মধ্যে জামায়াতের প্রভাব
জামায়াতে ইসলামী ও তাগুতী শাসন
অন্যান্য মহলে জামায়াতের প্রভাব
বিভিন্ন মহলে প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনা
মহিলাদের মধ্যে কাজ
বহির্বিশ্বে জামায়াতের প্রভাব

দাওয়াতী সাহিত্য প্রণয়ন
তরজমার ব্যবস্থাপনা

দশম অধ্যায়

চারটি ঐতিহাসিক সম্মে লন
মাদ্রাজ সম্মে লন (২৫ শে ও ২৬ শে এপ্রিল)
ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যত কর্মসূচি
পাটনা সম্মে লন (২৫ শে ও ২৬ শে এপ্রিল ১৯৪৭)
পাঠানকোট সম্মে লন (৯ই ও ১০ই মে- ১৯৪৭)
জনসভায় ভাষণ দেয়ার জন্যে বক্তার মান নির্ণয়
প্রশ্নমালা

একাদশ অধ্যায়

পাকিস্তান আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী
শাহ ওলী উল্লাহ দেহলবী (রঃ)
সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রঃ) ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রঃ)

দ্বাদশ অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য
ইসলামী আন্দোলনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
মুসলিম জাতীয়তার আন্দোলন
ইসলাম আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
মাওলানা একজন নওমুসলিম
আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ
আন্দোলনের পতনযুগ
ইসলামের বর্তমান অবস্থা
ইসলাম ও তার দাবী
একটি ইসলামী জামায়াতের দাবীসমূহ
যারা কাজ করতে চায় তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতা
পাকিস্তান প্রকৃতপক্ষে কিরূপ হওয়া উচিত
অখণ্ড ভারতের পজিশন
কুরআন কি বলে
আমাদের সম্পর্ক
আমাদের পদমর্যাদা
প্রকৃত ইসলামী লক্ষ্য
এ লক্ষ্যে পৌঁছুবার সোজাপথ
পাকিস্তান আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত
মুসলিম ও অমুসলিমদের সামনে ইসলামের দাওয়াত
মানুষের ধ্বংসের প্রকৃত কারণ
মানুষের কল্যাণ কিভাবে হতে পারে?
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মপন্থা
রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ
ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য
ইসলামী বিপ্লবের পথ
নবী পাকের (সঃ) সে আহ্বানের প্রতিক্রিয়া
হিজরতের পর আন্দোলন

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও জনসেবা
জামায়াতে ইসলামী ও জনসেবা
দারুল ইসলাম, পাঠানকোট
দারুল ইসলাম বস্তির অতি বেদনাদায়ক দৃশ্য

কেন্দ্রীয় জামায়াত লাহোরে স্থানান্তরিত
জামায়াতে ইসলামী দু'ভাগে বিভক্ত

চতুর্দশ অধ্যায়

জামায়াতের সাহিত্য সৃষ্টি
জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য

পঞ্চদশ অধ্যায়

কাজের মূল্যায়ন
বারো দফা আলোচ্য বিষয়
সার্বভৌমত্বের ধারণা ও খেলাফতের মতবাদ
স্বাধীনতার ধারণা
নেতৃত্বের ধারণা
শুণগত সদস্যপদ
গণতন্ত্রের ধারণা
সংগঠনের ধারণা
জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও গণতান্ত্রিক দসগুলোর সভাপতির মধ্যে পার্থক্য
ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্যের ধারণা
জাতীয়তার ধারণা
ইসলামের ধারণা
মৌলিক অধিকারের ধারণা
শাসনব্যবস্থা ও সরকার পরিবর্তনের ব্যাপারে পার্থক্য
জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ
জামায়াত এক নতুন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ
সত্য কি শুধু জামায়াতে ইসলামীর মধ্যেই সীমিত?
দ্বীন ইসলামকে আন্দোলন হিসেবে পেশ করা
একামতে দ্বীনের ধারণা একটা পাগলামি
জামায়াতের বাইরে কি ইসলাম নেই?
রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লালসা
ব্যক্তি সংস্কারের পরিবর্তে সমষ্টির সংস্কারের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে
জামায়াতে ইসলামীর থিওক্র্যাসির (Theocracy)
পতাকাবাহী
জামায়াতে ইসলামী একটি নতুন ফের্কা
উম্ তের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কারণ

পরিশিষ্ট-

একখানা পত্র
পরিশিষ্ট-
জামায়াতে ইসলামীর প্রথম সার্কুলার
পরিশিষ্ট-
এক নজরে জামায়াতের গুরুত্বপূর্ণ সম্ মেলনসমূহ
পরিশিষ্ট-
তজুমানুল কুরআনের কিছু মূল্যবান কথা
পরিশিষ্ট-
জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার কিছু মূল্যবান কথা:
দল গঠনের আবশ্যকতা
তবলীগ ও বিপ্লব
ইকামতে দ্বীন একটি অটল ও অপরিহার্য কর্তব্য
হুকুমতে ইলাহিয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টি
সত্য পথের দাবী
পরিশিষ্ট-
সন্দেহ-সংশয় নিরসন

মাওলানার জবাব

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস- ১৯৪৭-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত

প্রথম অধ্যায়ঃ

জামায়াতে ইসলামী কী
ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইসলামী আন্দোলন
জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়
জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা লাভ
জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ও জামায়াতে ইসলামী
পাকিস্থান আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী
দ্বি-জাতিতত্ব ও মাওলানা মওদূদী

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ
স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২৮
দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও জামায়াতে ইসলামী ২৯
পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন যেভাবে শুরু
ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্ দ আলী জিন্নাহ
ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সূচনা ৪৩
ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন ৮৮

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা আব্দুর রহীম ৪৭
পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম ইউনিট
ঢাকায় কাজের সূচনা
স্বাধীনতা উত্তর পাকিস্তানের নেতৃত্ব
জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস ২য় খণ্ড ৭
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে স্ মারক লিপি প্রদান
সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা
মাওলানা আব্দুর রহীমকে প্রাদেশিক জামায়াতের সেক্রেটারি নিয়োগ
পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াত প্রতিনিধিদের সফর
পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের প্রথম আমীর
প্রথম প্রাদেশিক অফিস
মাওলানা মওদূদীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ
ফাঁসির কক্ষে মাওলানা মওদূদী
চতুর্থ অধ্যায়
জনাব আব্দুল খালেকের জামায়াতে যোগদান
অধ্যাপক গোলাম আযমের জামায়াতে যোগদান
অধ্যাপক গোলাম আযমের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
কারাগারে অধ্যাপক গোলাম আযমের রুকনিয়াতের শপথ
রংপুরে অধ্যাপক গোলাম আযমের সাংগঠনিক তৎপরতা
অঞ্চলভিত্তিক সাংগঠনিক দায়িত্ব বণ্টন
জনাৰ আব্বাস আলী খানের জামায়াতে যোগদান
সংগঠনের নির্দেশে আব্বাস আলী খান সাহেবের চাকরি থেকে ইস্তফা
পঞ্চম অধ্যায়
করাচি রুকন সম্মে লনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি দল
প্রথম প্রাদেশিক আমীর নির্বাচন
মাওলানা মওদূদীর প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফর

ঢাকায় মাওলানার অবস্থান
মাওলানা মওদূদীর ৪০ দিনের সফর সূচি
সভা-সম্মে লনে মাওলানার আলোচনার বিষয়
মাওলানা মওদূদীর সফরের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া
মাওলানা মওদূদীর সফরের পর
আওয়ামী লীগ সরকারের ইসলাম বিরোধী পরিকল্পনা

বাকী সকল পড়া আগের ক্লাশনোট ১৪ এ আছে

অনুশীলনী -১৫(আগষ্ট-১ম সপ্তাহঃ)

দারস তৈরী -সূরা বাকারা (১-৫ নং আয়াত)

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ * وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

অর্থঃ (১) আলিফ লাম মীম [এর প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না]। (২) এই তো কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, আছে মোত্তাকীদের (অন্যায় পরিহারকারী, আল্লাহভীরু, সৎকর্মশীল ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের) জন্য পথনির্দেশ; (৩) যারা অদৃশ্য সত্যকে বিশ্বাস করে, নামায আদায় করে, আর আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে; (৪) যারা তোমার কাছে যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে (অন্য নবীদের কাছে) যা নাযিল করা হয়েছিল তা বিশ্বাস করে; আর পরকালের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (৫) এ ধরনের লোকেরাই তাদের প্রভুর সঠিক পথে আছে এবং এরাই সফলকাম।

নামকরণ ঃ সূরা আল-বাকারার নামকরণ হয়েছে 'আল-বাকারাহ' (গাভী) শব্দটি থেকে। এই নামকরণটি এই সূরার ৬৭ থকে ৭৩ নম্বর আয়াতে বর্ণিত বনী ইসরাঈলের গাভী জবাই করার ঘটনা থেকে এসেছে।

শানে নুযুলঃ মহানবী (স) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসার ফলে ইসলাম প্রচার ব্যাপক হতে থাকে। তখন কুরাইশদের সাথে সাথে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান এবং মুনাফিকরা ইসলামের গতিরোধ করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তারা ইসলামের প্রতি অমূলক নানারকম অপবাদ প্রচার করতে থাকে। এমনকি তারা পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যাপারে নানারূপ সন্দেহমূলক উক্তি করতে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের সেই মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে সূরা আল-বাকারা নাযিল করেন। এ সূরায় ইসলাম বিদ্বেষীদের সমস্ত অপবাদের জবাব দেওয়া হয়। কুরআন যে একান্ত আল্লাহ তা'আলারই সত্য বাণী, ইসলাম যে বিশ্বমানবতার একমাত্র দিশারী তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। (তাফসীরে হাক্কানী)

তাফসীরে নুরুল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- এ সূরার শানে নুযুল হল এই যে, মালিক ইবন সাইফ নামক এক ইয়াহুদি কুরআনের বিরুদ্ধে এ অপপ্রচার চালাতো যে-এটা সেই পবিত্র গ্রন্থ নয়, যার নাযিল হওয়ার সুসংবাদ পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবে দেওয়া হয়েছিল। তখন পবিত্র কুরআন সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ দূর করার জন্য এ সূরা নাযিল করা হয়। এতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়- এটা সেই কিতাব, যাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিষয়বস্তু ঃ আল-কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ সূরা হচ্ছে সূরা আল-বাকারা। এ সূরাটি মহানবী (স)-এর হিজরতের পর মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এ সূরার আয়াত সংখ্যা ২৮৬ এবং এতে ৪০টি রুকু রয়েছে।

- সূরা আল-বাকারায় ইসলামের অধিকাংশ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে।
- এ সূরার মধ্যে সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, জিহাদ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
- হযরত আদম আ. ও হাওয়ার আ. সৃষ্টি কাহিনী, তাঁদের জান্নাতে অবস্থান, ফেরেশতা কর্তৃক তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ ও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ ও তাঁদের তাওবা কবুল করার কথা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।
- মুনাফিকদের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য এবং ইয়াহুদিদের প্রতি আল্লাহর বিভিন্ন অনুগ্রহ এবং তাদের নাফরমানীর কথাও বর্ণিত হয়েছে।
- মুসলমানদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে মাসজিদুল হারাম নির্বাচনের ঘটনাও এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে।
- সবশেষে দুনিয়া ও আখিরাতে পরম কল্যাণ, সাফল্য অর্জনের নিমিত্তে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের একটি হৃদয়গ্রাহী দু'আও শিক্ষা দিয়েছেন এ সূরায়।

সূরা আল-বাকারার আলোচ্য বিষয়ঃ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনা জীবনের সূচনাতে এ সূরা নাযিল হয়। এ সূরায় ইসলামের বেশ কিছু মৌলিক বিষয় আলোচিত হয়েছে।

- সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় সূরা আল-বাকারায় অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে। তবে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় বিষয় সেসব আলোচ্য বিষয়কেই সংযুক্ত করেছে। আলোচনার দু'টি প্রধান ধারা। একটি হল- মদীনায় অবস্থিত ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও মুনাফিক শ্রেণির ইসলামের বিরোধিতার জবাব ও তাদের অসারতা প্রমাণ করা। দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে- পথিবীতে তাওহীদের একমাত্র ধারক-বাহক জাতি হিসেবে মুসলমানদের গড়ে তোলার দিক নির্দেশনা দেওয়া। এ দুটো ধারাই সূরা আল-বাকারার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।
- কুরআনের নির্ভুলতা এ সূরার প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে- "এ কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই"। পরবর্তীতে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে- এটা কোন মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়।
- মু'মিন-মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র সূরার শুরুতে মু'মিন-মুত্তাকিদের গুণ-বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। মু'মিনগণ কীভাবে আল্লাহর আদেশ মান্য করে এবং তাদের জীবন-ই যে সাফল্যময়-তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

কাফির-নাস্তিকদের ব্যর্থতা নাস্তিক-কাফিরদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তারা সত্য-সুন্দরকে সব সময় প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণে বলে দেওয়া হয়েছে কাফিরদের অন্তর সত্য গ্রহণের উপযুক্ত নয়। এদের জীবন চরমভাবে ব্যর্থ।

- মুনাফিকদের পরিণতি মুনাফিকরা সুবিধা আদায়ের জন্য ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু এ চক্রটি ইসলাম ও মুসলমানের ভীষণ ক্ষতি করে। তাদের ঘণ্য আচরণ, তাদের জীবনের পরিণতির কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- মানব সষ্টির উদ্দেশ্য মানব সষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে- পথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে মানুষকে।
- আদম (আ) সৃষ্টির কাহিনী হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি কাহিনী, পথিবীতে প্রেরণ ও দায়িত্ব-কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।
- ইয়াহুদি জাতির মুখোশ উন্মোচন বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং তাদের অপকর্মের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আরও আলোচিত হয়েছে যে, কীভাবে তারা পথিবীর নেতৃত্বে এসেছিল এবং দুষ্কর্মের কারণে কীভাবে তারা নেতত্ব থেকে দূরে সরে গিয়ে অভিশপ্ত হয়।
- ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের মধ্যে বিরোধ হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে, কীভাবে আহলে কিতাবের লোকেরা নিজেদের ধর্মের বিরোধিতা করেছে। হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে প্রতিশ্রুত আখেরী নবী হিসেবে অস্বীকার করে তাদের স্বার্থহানির ভয়ে তারা যেসব কথা বলেছে, সে কথাও এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।
- কুরআনের মুজিযা আল-কুরআন মহানবী (স)-এর চিরন্তন মুজিযা। এটা মানব রচিত নয় বরং মহান আল্লাহ প্রেরিত। এ বিষয়টি চ্যালেঞ্জ আকারে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- হযরত ইবরাহীম (আ) ও কাবা ঘর প্রসঙ্গ এ সূরায় মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরহীম (আ)–এর প্রসঙ্গ এবং ইসমাইল-ইসহাক ও কাবা ঘর নির্মাণ-একে পবিত্রকরণ, তাওহীদের প্রতিষ্ঠা, সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং তাদের প্রার্থনা সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে তলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্মিত বায়তুল মোকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা শরীফকে বিশ্ব মুসলিমের কিবলা নির্ধারণ এবং একে কেন্দ্র করে ইবাদাতানুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে মুসলিম উম্াহকে পুনর্গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ইসলামি শরীআতের প্রবর্তন ইসলামি শরীআতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম, খাদ্য-পানীয়, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, কিসাস, অসীয়ত, জিহাদ, বিবাহ, তালাক, মুহরানা, ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, বন্ধক, মদ, জুয়া, অনাথ-ইয়াতিম, ঋণের আদান-প্রদান ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। আর এসব শরীআতের বিধান সমাজে প্রবর্তন করা হয়েছে।
- তাওহীদ-রিসালাত ও আখিরাতের বর্ণনা এ সূরায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর একত্ববাদ, রাসূলগণের পরস্পর বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম-নমরুদ বিরোধ তুলে ধরে তাওহীদের বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে। সফলতার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা মানব জীবনের সফলতা নির্ভর করছে আল্লাহর মর্জির উপর। কাফির-নাস্তিকদের বিরুদ্ধে সফল ও বিজয়ী হওয়ার জন্য এবং জীবনের সফলতার জন্য সবর্তোভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর:

(১) الم আলিফ লা-ম মী-ম।

ব্যাখ্যা: এ গুলোকে আরবীতে 'হুরুফে মুক্বাত্ত্বাআত' (বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা) বলা হয়। অর্থাৎ, একটি একটি ক'রে পঠনীয় অক্ষর। এগুলোর অর্থের ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা নেই। আল্লাহই এর অর্থ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। কুরআনে মোট উনত্রিশটি সূরার শুরুতে এইগুলো এসেছে মোট চৌদ্দটি হরফে।

আলিফ-লা- মিম (الم) এসেছে সূরা বাকারা; আলে ইমরান, আনকাবুত, রূম, লুকমান, সাজদাতে

আলিফ লাম মিম সোয়াদ (المص)এসেছে সূরা আরাফে।

আলিফ-রা (الر) এসেছে: সূরা ইউনুস, হূদ, ইউসুফ, ইবরাহিম, হিজর।

আলিফ-লাম-মিম-রা (المر): সূরা রা'দ

কাফ হা ইয়া আইন সোয়াদ (كهيعص): সূরা মারইয়াম।

ত্বাহা(طه) : সূরা ত্বাহা
ত্ব-সিন-মিম(طسم): সূরা শোয়ারা, আল-কাসাস।
ত্ব-সিন(طس): সূরা নামল।
ইয়া-সিন(يس): সূরা ইয়াসিন।
সোয়াদ(ص) সূরা সোয়াদ
হা-মিম(حم): সূরা গাফির, ফুসসিলাত, যুখরুফ, দুখান, জাসিয়া, আহকাফ।
হা-মিম-আইন-সিন-কফ(حم عسق):সূরা শুরা
ক্বফ(ق): সূরা ক্বাফ
নুন(ن): সূরা আল-কলম।

নবী করীম (সাঃ) বলেন যে, আমি এ কথা বলি না যে, 'আলিফ লাম মীম' একটি অক্ষর। বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরে একটি করে নেকী হয়। আর একটি নেকীর প্রতিদান দশটি করে পাওয়া যায়। (সুনানে তিরমিযী, পরিচ্ছেদঃ ক্বুরআনের ফযীলত, অধ্যায়ঃ যে ক্বুরআনের একটি অক্ষর পড়ে)

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

(২) এই সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন।

ব্যখ্যা: এ কিতাবের অবতরণ যে আল্লাহর নিকট থেকে এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "এ কিতাবের অবতরণ বিশ্বপালনকর্তার নিকট থেকে এতে কোন সন্দেহ নেই।" (সূরা সাজদা ২) অথবা এটা একটা যে হেদায়েতের কিতাব তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মুত্তাকী বা পরহেযগারদের জন্য এই কিতাব পথ-প্রদর্শনকারী। মুত্তাকীর বর্ণনায় আল্লাহ পরবর্তীতে বলছেন-
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

(৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে

ব্যখ্যা: অদেখা বিষয়সমূহ হল এমন সব জিনিস যার উপলব্ধি জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভব নয়। যেমন মহান আল্লাহর সত্তা, তাঁর অহী (প্রত্যাদেশ), জান্নাত ও জাহান্নাম, ফিরিশতা, কবরের আযাব এবং মৃত দেহের পুনরুত্থান ইত্যাদি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এমন কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাও ঈমানের অংশ যা জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। আর তা অস্বীকার করা কুফরী ও ভ্রষ্টতা।

যথাযথভাবে নামায পড়া বা নামায কায়েম করার অর্থ হল, নিয়মিতভাবে রসূল (সাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী নামায আদায়ের প্রতি যত্ন নেওয়া। নচেৎ নামায তো মুনাফিকরাও পড়তো।

'ব্যয় করা' কথাটি ব্যাপক; যাতে ফরয ও নফল উভয় প্রকার (ব্যয়, খরচ, দান বা সদকা)ই শামিল। ঈমানদাররা তাদের সামর্থ্যানুযায়ী উভয় প্রকার সদকার ব্যাপারে কোন প্রকার কৃপণতা করে না। এমনকি পিতা-মাতা এবং পরিবার ও সন্তান-সন্ততির উপর ব্যয় করাও এই 'ব্যয় করা'র মধ্যে শামিল এবং তাও নেকী লাভের মাধ্যম।

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

(৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

ব্যখ্যা: পূর্ববতী নবী-রাসূলদের প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে এবং মুহাম্ দ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এবং সর্বশেষ কিতাব (আল কুরআন) অনুযায়ী জীবন চালাতে হবে।

أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(৫) তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।

ব্যখ্যা: উপরে বর্ণিত গুণাবলীর লোকেরাই সফলকাম এবং পথপ্রাপ্ত। তারাই নাযাতের পথে।

শিক্ষাঃ সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত মু'মিন ও মুত্তাকির পরিচয় ঃ
মু'মিন মানে বিশ্বাসী। আর মুত্তাকি অর্থ হল পরহেযগার ও আল্লাহভীরু, আল্লাহর প্রিয় বান্দা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যারা ঈমান গ্রহণ করে শিরক, কবীরা গুণাহ, অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর হুকুমআহকাম পালন করে, তারাই মুত্তাকি। প্রকৃত মু'মিন-মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য হল-

- তারা গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসী মু'মিন-মুত্তাকির প্রথম গুণটি হল তারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে। ইসলামি আকীদা-বিশ্বাস ও প্রত্যয়-সংস্কৃতি এবং আদর্শের মৌলিক বিষয় এটাই। এ বিশ্বাসের মূল কথা হচ্ছে : "যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে।" (সূরা আল-বাকারা ২ঃ২) অদৃশ্যের বিষয়াবলির মধ্যে আছে- মহান প্রভু আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি, ফেরেশতা, ওহী, আখিরাত, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি। অদৃশ্যে বিশ্বাস মু'মিন-মুত্তাকি হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তু বাদীরা এ অদৃশ্যে বিশ্বাস না করে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হয়েছে।
- তারা সালাত কায়েম করে সালাত প্রতিষ্ঠা করা মু'মিন-মুত্তাকির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন- "তারা সালাত কায়েম করে।" (সূরা আল-বাকারা ২ঃ২) সালাতের মধ্য দিয়ে তারা এক আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শুধু গায়েবে বিশ্বাস করে চুপচাপ বসে থেকে 'জপ' করলেই মুত্তাকি হওয়া যায় না। আনুগত্যের বাস্তব নমুনা দেখাতে হবে সালাতের মাধ্যমে। দিবা-রাত্র পাঁচবার ফরয সালাত ও সিজদার মাধ্যমে তারা শিরক থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে।
- তারা আল্লাহর দেওয়া রিয্ক থেকে ব্যয় করে মু'মিন-মুত্তাকির ততীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- "তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" (সূরা আল-বাকারা ২ঃ২) যা কিছু ধন সম্পদ আছে তা মহান আল্লাহর দান। এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। এ বিশ্বাস অর্থের মোহ থেকে মুক্ত করে। কাজেই মু'মিন-মুত্তাকি অর্থের পূজারী হয় না। তার ধন-সম্পদে আল্লাহ ও অন্যান্য মানুষের যে অধিকার আছে সে তা থেকে ব্যয় করে।
- তারা আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করে মু'মিন-মুত্তাকিদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- "এবং তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান আনে।" (সূরা আল-বাকারা ২ঃ৩) মানব জাতির পথ নির্দেশনার জন্যে আল্লাহ তাআলা যে সব আসমানি কিতাব যুগেযুগে নাযিল করেছেন- মু'মিন-মুত্তাকিগণ তা স্বীকার করে।
- তারা আখিরাত জীবনে সুদঢ় বিশ্বাসী মু'মিন-মুত্তাকির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- "এবং যারা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।" (সূরা আল-বাকারা ২ঃ৩) এ বিশ্বাস কর্মকে কর্মফলের সাথে এবং সূচনাকে পরিণতির সাথে যুক্ত করে। এ বিশ্বাস মানুষকে এ চেতনা দান করে যে, পথিবীতে তার সৃষ্টি, তার কর্মকাণ্ড, তৎপরতা, বিশ্বাস, জীবনাচার কিছুই বৃথা যাবে না। সে নিরর্থক সষ্টি নয়। তাকে তার কর্মের জন্যে মহাবিচারকের নিকট হাযির হতে হবে। ভাল কাজের জন্যে পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্যে শাস্তি পেতে হবে। এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মু'মিন-মুত্তাকির জীবনই সাফল্যময় হবে ইহজগতে ও পরজগতে।

বিষয়ঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস,

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে হাদিসের পবিত্রতা রক্ষা এবং কুরআনে বিশদ ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার জন্য হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। যার ফলে উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর যুগে হাদিস সংকলনের শুভসূচনা হয় এবং আব্বাসীয় খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের যুগে তা পূর্ণতা লাভ করে।

সামগ্রিক বিশ্লেষণে হাদিস সংকলনের ইতিহাসকে মোট পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়। যথা-

ক. রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে হাদিস সংকলন।
খ. সাহাবায়ে কেরামের যুগে হাদিস সংকলন।
গ. ওমর ইবনে আবদুল আযীযের যুগে হাদিস সংকলন।
ঘ, আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের যুগে হাদিস সংকলন।
ঙ. সিহাহ সিত্তাহ প্রণয়ন।

ক. মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে হাদিস সংকলন :

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরআনের সাথে হাদিসের সংমিশ্রণের আশঙ্কা থাকায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীগণকে হাদিস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেন-

لا تكتبوا عنى غير القران ومن كتبه فليمحه

কিন্তু পরবর্তীতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লেখার মাধ্যমে হাদিস সংরক্ষণের অনুমতি প্রদান করলে সাহাবীগণ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলন করেন। যেমন-

১) মদিনা সনদঃ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিজরত করে মদিনায় গমন করার পর সেখানে সকল ধর্মের লোকদের সাথে সহাবস্থানের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, যা মদিনা সনদ নামে পরিচিত। এটাই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র।

২) ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকা: মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নব মুসলিমদের নামের তালিকা করতে নির্দেশ প্রদান করেন। এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা) বলেন-وكتبنا له الفا وخمس مائة رجل

৩) হযরত আবু যার (রা)-এর লেখা: হাফেয ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন।

-وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن بعمرو بن حزم وغيره

অর্থাৎ, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমর ইবনে হাযম ও অন্যান্যকে সদকা, দিয়াত এবং ফরয ও সুন্নাত সম্পর্কে এক দস্তাবেজ লিখে দিয়াছিলেন।

৪) সন্ধিপত্রঃ বনু সাকীফের সাথে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন, যা নিম্নোক্ত শিরোনামে শুরু করেছিলেন

-هذا الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيفٍ

৫) অন্যান্যঃ বিভিন্ন গোত্রে ও সম্প্রদায়ের প্রতি বিভিন্ন সময় লিখিত ফরমান, হুদায়বিয়ার সন্ধি, বিভিন্ন বাদশাহ ও রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে লিখিত ইসলামের দাওয়াত সংবলিত চিঠি ইত্যাদির মাধ্যমে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিস সংকলন ও সংরক্ষণ করা হয়।

খ. সাহাবায়ে কেরামের যুগে হাদিস সংকলন :

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের পর সাহাবীগণ হাদিস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। বিশিষ্ট সাহাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে কিছুসংখ্যক হাদিস সংগ্রহ করে তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। যেমন-

১) হযরত আলী (রা) কর্তৃক সংরক্ষিত হাদিস সংকলন 'সহীফায়ে আলী'।
২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-এর সংকলন সহীফায়ে সাদেকাহ'।
৩) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সংকলন 'সহীফায়ে আনাস ইবনে মালেক'।
৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক সংকলিত 'সহীফায়ে ইবনে আব্বাস'।
৫) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক সংকলিত 'সহীফায়ে ইবনে মাসউদ'।
৬) হযরত আবু হোরায়রা (রা) কর্তৃক সংকলিত 'সহীফায়ে আবু হুরায়রা'।

গ. ওমর ইবনে আবদুল আযীযের যুগে হাদিস সংকলন :

উমাইয়া খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর যুগেই সরকারিভাবে হাদিস সংকলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১) খলিফার নির্দেশ জারিঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে উমাইয়া খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) ইসলামি রাষ্ট্রের সমগ্র এলাকায় এ নির্দেশ জারি করেন-

-أنظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء

এ সময় খলিফার নির্দেশ মোতাবেক মদিনার গভর্নর হযরত আবু বকর ইবনে হাযম বিপুল সংখ্যক হাদিস সংগ্রহ করে হাদিসের কয়েকটি খণ্ড গ্রন্থ সংকলন করেন।

২) মুহাদ্দিসগণের হাদিস সংকলনে আত্মনিয়োগঃ সে সময় ইসলামি রাষ্ট্রের আনাচে-কানাচে হাদিস বিশারদগণ হাদিসে নববী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যেমন- ইবনে জুরাইজ, আওযায়ী, যুহরী, সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, মাকতুল, হিশাম, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা প্রমুখ। এদের প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে হাদিসের পান্ডুলিপি তৈরি করেন।

ঘ. খলিফা মুতাওয়াক্কিলের যুগে হাদিস সংকলন :

আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের যুগ হলো হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনের সোনালি যুগ। এ যুগ তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম শতাব্দীতে শেষ হয়।

১) মুতাওয়াক্কিলের উদ্যোগ: খলিফা মুতাওয়াক্কিলের যুগে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিজেদের মতবাদ প্রমাণ ও ইসলামি সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেওয়ার নিমিত্তে মিথ্যা হাদিস প্রচার শুরু করে। তখন খলিফা মুতাওয়াক্কিল সরকারিভাবে হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনে উদ্যোগী হন। তিনি হাদিস শিক্ষাদানের জন্য অনেক মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন।

২) রিওয়ায়াত ও দিরায়াত: মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদিস ও জাল হাদিসের মধ্যে পার্থক্য প্রমাণ করার জন্য রিওয়ায়াত ও দিরায়াত নামে দুটি হাদিস পরীক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তাঁরা অত্যন্ত যাচাইবাছাই করে সহীহ হাদিসসমূহ নিজেদের সংকলিত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন।

ঙ. সিহাহ সিত্তাহ প্রণয়ন :

এ যুগে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ৬টি হাদিসগ্রন্থ সংকলন হয়।

গ্রন্থগুলো হলো-

১. ইমাম বুখারী (র) সংকলিত 'সহীহ বুখারী'।
২. ইমাম মুসলিম (র) সংকলিত 'সহীহ মুসলিম'।
৩. ইমাম তিরমিযী (র) সংকলিত 'জামে তিরমিযী'।
৪. ইমাম আবু দাউদ (র) সংকলিত 'সুনানে আবু দাউদ'।
৫. ইমাম নাসায়ী (র) সংকলিত 'সুনানে নাসায়ী'।
৬. ইমাম ইবনে মাজাহ (র) সংকলিত 'সুনানে ইবনে মাজাহ'।

হাদিস সংকলনের সময়োচিত পদক্ষেপ নিয়ে উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) ও আব্বাসীয় খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল (র) যে অবদান রেখেছেন মুসলিম জাতির নিকট তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সুত্রঃ https://www.senaninews.com/

আয়াত মুখস্তঃ

আল-বাকারা: ২৬১

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۱﴾

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

আলে-ইমরান: ৯২

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۹۲﴾

তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা; এবং তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন।

আল-হাদীদ: ১১

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَ لَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿۱۱﴾

এমন কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি বহু গুণে এটাকে বৃদ্ধি করবেন তার জন্য। আর তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্ত হাদিসঃ

عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " انْفَحِي - أَوِ انْضَحِي أَوْ أَنْفِقِي - وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ

আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেনঃ তুমি ছড়িয়ে দাও অথবা বিলিয়ে দাও অথবা ব্যয় কর। গুণে গুণে রেখ না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুণে গুনে দিবেন। আর গুটিয়ে রেখ না তবে আল্লাহ ও তোমার থেকে গুটিয়ে রাখবেন। (সহীহ মুসলিমঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-২২৪৮)

মাসয়ালা: তাহারাত সংক্রান্তঃ দেখুন ক্লাশ ১০, পৃষ্ঠা- ১০

অনুশীলনী -১৬(আগষ্ট-৩য় সপ্তাহঃ)
দারস তৈরী - সূরা নাস,

দয়াময়, পরম করুনাময় আল্লাহর নামে (১) কুল আউযু বিরাব্বিন নাস। (অর্থ: বলো, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার।) (২) মালিকিন নাস। (অর্থ: যিনি মানুষের অধিপতি।) (৩) ইলাহিন নাস। (অর্থ: যিনি মানুষের উপাস্য।) (৪) মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্না-স। (অর্থ: কুমন্ত্রণাদাতা শয়তানের অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়।) (৫) আল্লাযি ইউয়াস ডিসু ফি সুদুরিন নাস। (অর্থ: যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়।) (৬) মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। (অর্থ: জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।) [১, ২]	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (1) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (2) مَلِكِ النَّاسِ (3) إِلَٰهِ النَّاسِ (4) مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (5) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (6) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

নামকরণ: সূরা আন-নাস (আরবি: سورة الناس) নামকরণ করা হয়েছে "নাস" (الناس) শব্দটি থেকে, যার অর্থ "মানুষ"। এই সূরাটিতে মানুষের প্রতিপালক, শাসক ও উপাস্যের কাছে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য। এটি কোরআনের সর্বশেষ সূরা এবং মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা আন-নাস এর নামকরণ "নাস" শব্দটি থেকে এসেছে, যা আরবি ভাষায় "মানুষ" অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই সূরাটিতে মানুষের প্রতিপালক, মালিক ও উপাস্যের কাছে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য।
সূরা আন-নাস এর নামকরণ এর মূল কারণ হলো, এখানে বারবার "নাস" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটি "মানুষ" বা "মানবজাতি" অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
সূরা আন-নাস এর নামকরণ:

- সূরাটির নামকরণ "নাস" শব্দটি থেকে হয়েছে, যার অর্থ "মানুষ"।
- এটি কোরআনের ১১৪তম ও সর্বশেষ সূরা।
- এই সূরায় ৬টি আয়াত রয়েছে।
- এটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।
- সূরাটিতে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

শানে নুযুল
এই সুরার শানে নুযুল হলো- সূরা ফালাক ও সুরা নাস একসঙ্গে নাজিল হয়েছে। এই দুই সুরা নাজিলের প্রেক্ষাপট বা শানে নুযূল হল, হুদাইবিয়ার ঘটনার পর লাবীদ ইবনে আসাম এবং তার কন্যারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যাদু করেছিল। ফলে তিনি কিছুটা কষ্ট অনুভব করেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যাদুকরের নাম এবং কোথায়, কিভাবে যাদু করা হয়েছে এ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। চিরুনী ও চুলের সাহায্যে যাদু করা হয়, যা যারওয়ান কূপের তলদেশে একটি পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। এ সুরাটি নাজিল হওয়ার পর ফেরেশতাদের বিবরণ অনুযায়ী ওই কূপ থেকে তা তুলে আনা হয়। অতপর ওই সূরাটি পড়ে গিরা খুললে তৎক্ষণাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ হয়ে উঠেন। এই সূরাটি পড়লে অনিষ্ট ও যাদু থেকে হেফাজতে থাকা যায়।

সূরা আন-নাস (আরবি: سورة الناس) হলো মক্কায় অবতীর্ণ একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, যাতে ৬টি আয়াত রয়েছে। এটি কোরআন শরীফের ১১৪তম এবং সর্বশেষ সূরা। সূরাটিতে মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই সূরা এবং এর আগের সূরা আল-ফালাক একত্রে মুআউযাতাইন নামে পরিচিত, যা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দুটি সূরা হিসেবে পরিচিত।

সূরা আন-নাস এর প্রধান **বিষয়বস্তু হলো:** আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা
কুমন্ত্রণার উৎস: এই সূরায় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, যা মানুষের মনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। শয়তান জীন এবং মানুষের রূপেও এসে কুমন্ত্রণা দিতে পারে।
আল্লাহর সার্বভৌমত্ব: সূরাটিতে বারবার "রব্বিন নাস" (মানুষের প্রতিপালক), "মালিকিন নাস" (মানুষের রাজা), এবং "ইলা-হিন নাস" (মানুষের উপাস্য) শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।
শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি: সূরাটিতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যমে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি এবং আত্মিক সুরক্ষা কামনা করা হয়েছে।

মূল বক্তব্য
মক্কা মু'আয্যমায় এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। তখন ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্বেই মনে হচ্ছিল , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন ভীমরুলের চাকে হাত দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর দাওয়াত যতই বিস্তার লাভ করতে থেকেছে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের বিরোধিতাও ততোই বেড়ে যেতে থেকেছে। যতদিন তাদের আশা ছিল কোনরকম দেয়া-নেয়া করে অথবা ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে তাঁকে ইসলামী দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারা যাবে , ততদিন তো বিদ্বেষ ও শত্রুতার তীব্রতার কিছুটা কমতি ছিল। কিন্তু নবী করীম (সা) যখন দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন প্রকার আপোষ রফা করার প্রশ্নে তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিলেন এবং সূরা আল কাফেরুনে তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিলেন – যাদের বন্দেগী তোমরা করছো আমি তার বন্দেগী করবো না এবং আমি যার বন্দেগী করছি তোমরা তার বন্দেগী করো না , কাজেই আমার পথ আলাদা এবং তোমাদের পথ ও আলাদা – তখন কাফেরদের শত্রুতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। বিশেষ করে যেসব পরিবারের ব্যক্তিবর্গ (পুরুষ-নারী , ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে) ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের মনে তো নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে সবসময় তুষের আগুন জ্বলছিল। ঘরে ঘরে তাঁকে অভিশাপ দেয়া হচ্ছিল। কোন দিন রাতের আঁধারে লুকিয়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। যাতে বনী হাশেমদের কেউ হত্যাকরীর সন্ধান পেয়ে আবার প্রতিশোধ নিতে না পারে এ জন্য এ ধরনের পরামর্শ চলছিল। তাঁকে যাদু টোনা করা হচ্ছিল। এভাবে তাঁকে মেরে ফেলার বা কঠিন রোগে আক্রান্ত করার অথবা পাগল করে দেয়ার অভিপ্রায় ছিল। জিন ও মানুষদের মধ্যকার শয়তানরা সব দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা চাচ্ছিল জিন মানুষের মনে তাঁর এবং তিনি যে দীন তথা জীবন বিধান কুরআন এনেছেন তার বিরুদ্ধে কোন না কোন সংশয় সৃষ্টি করতে। এর ফলে লোকেরা তাঁর প্রতি বিরূপ ধারণা করে দূরে সরে যাবে বলে তারা মনে

করছিল। অনেক লোকেরা মনে হিংসার আগুন জ্বলছিল। কারণ তারা নিজেদের ছাড়া বা নিজেদের গোত্রের লোকদের ছাড়া আর কারো প্রদীপের আলো জ্বলতে দেখতে পারতো না। উদাহরণ স্বরূপ , আবু জেহেল যে কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেটি ছিল তার নিজের ভাষায় : " আমাদের ও বনী আবদে মান্নাফের (তথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার) মধ্যে ছিল পারস্পরিক প্রতিযোগিতা । তারা মানুষকে আহার করিয়েছে , আমরা ও আহার করিয়েছি । তারা লোকদেরকে সওয়ারী দিয়েছে , আমরা ও দিয়েছি। তারা দান করেছে , আমরাও দান করেছি। এমন কি তারা ও আমরা মান মর্যাদার দৌঁড়ে সামনে সমান হয়ে গেছি। এখন তারা বলছে কি , আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে , তার কাছে আকাশ থেকে অহী আসে। আচ্ছ , এখন কি এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের সাথে কেমন করে মোকাবেলা করতে পারি ? আল্লাহর কসম , আমরা কখনো তাকে মেনে নেবো না এবং তার সত্যতার স্বীকৃতি দেবো না। " (ইবনে হিশাম , প্রথম খণ্ড , ৩৩৭-৩৩৮ পৃষ্ঠা)

এহেন অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে : এদেরকে বলে দাও আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রবের , সমুদয় সৃষ্টির দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট থেকে , রাতের আঁধার থেকে যাদুকর ও যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকদের দৃষ্কৃতি থেকে । আর এদেরকে বলে দাও , আমি আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত মানুষের রব , সমস্ত মানুষের বাদশা ও সমস্ত মানুষের মাবুদের কাছে। এমন প্রত্যেটি সন্দেহ ও প্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে যা বার বার ঘুরে ফিরে আসে এবং মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে ও তাদেরকে প্ররোচিত করে । তারা জিন শয়তানদের মধ্য থেকে হতে পারে , আবার মানুষ শয়তানদের মধ্য থেকেও হতে পারে। এটা হযরত মূসার (আ) ঠিক সেই সময়ের কথার মতো যখন ফেরাউন ভরা দরবারে তাঁকে হত্যা করার সংকল্প প্রকাশ করেছিল। হযরত মূসা তখন বলেছিলেন :

وَ قَالَ مُوْسٰۤى اِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَ رَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۲۷﴾

" আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি এমন ধরনের প্রত্যেক দাম্ভিকের মোকাবেলায় যে হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না। " (আল মু'মিন (গাফির), ২৭)

وَاِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ

" আর তোমরা আমর ওপর আক্রমণ করবে এ জন্য আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি। " (আদ দুখান, ২০)

ফজিলত

হাদীস শরীফে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তা পড়ার গুরুত্ব এসেছে। এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সূরা ইখলাস ও এই দুই সূরা পড়বে সে সকল বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (জামে তিরমিজি, হাদীস : ২৯০৩; সুনানে আবু দাউদ,হাদীস : ১৫২৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ১৯২৬৬; সুনানে নাসাঈ ২/১৫৪; তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৯১৭)

হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে যখন ঘুমাতে যেতেন, তখন নিজের উভয় হাত এক সঙ্গে মিলাতেন। তারপর উভয় হাতে ফুঁক দিতেন এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়তেন। তারপর দেহের যতটুকু অংশ সম্ভব হাত বুলিয়ে নিতেন। তিনি মাথা, মুখমণ্ডল ও শরীরের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। তিনি এরূপ তিনবার করতেন। -(সহি বুখারি ৫০১৭, সুনানে আবু দাউদ : ৫০৫৮, জামে তিরমিজি, হাদিস নং-৩৪০২)

হজরত উকবা ইবনে আমের জুহানি (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার ওপর কিছু আয়াত নাজিল হয়েছে, যা আমি এর মতো অনুরূপ দেখিনি। কুল আয়ুজু বি রাব্বিল ফালাক ও কুল আয়ুজু বি রাব্বিন নাস। -(জামে তিরমিজি, হাদিস নং-২৯০২)

নির্দেশনা

১. আশ্রয় কামনা একমাত্র আল্লাহর নিকট করা, তিনি এ মহাবিশ্বের প্রতিপালক ও আশ্রয়দাতা।

২. আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে কিছু কিছু সৃষ্টিতে অনিষ্ট রয়েছে। কিংবা সেগুলোকে অবলম্বন করে কুচক্রীমহল শত্রুপক্ষকে ক্ষতি সাধন করতে পারে। এ জন্য এজাতীয় ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

৩. এ সূরায় অন্ধকার রাত ও জাদুকারিণীদের অনিষ্টের কথা ফুটে উঠলেও এ ছাড়া আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যার মাধ্যমে ক্ষতি সাধন করা হয়ে থাকে। সে সকল বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। বস্তুত মানুষের ক্ষতি করা, কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা অনেক বড় পাপ। মানুষ মানুষের ক্ষতি করে থাকে প্রধানত তিনটি বিষয়ে- জানের ক্ষতি, ধন-সম্পদের ক্ষতি এবং ইজ্জত-আব্রু, মান-সম্ মানের ক্ষতি সাধন। এই তিন ধরনের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয়ের পদ্ধতি এ সূরায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । হাদীসে রাসূল স. বলেছেন, 'প্রকৃত মুসলমান সে ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে।' অর্থাৎ তার মাধ্যমে কেউ কোনোরূপ ক্ষতি বা অনিষ্টের শিকার হয় না। (সহীহ বুখারী-১০, সহীহ মুসলিম-৪০)

৪. হিংসা অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় কাজ। হিংসা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। হিংসুকের হিংসা কেবল তাকেই পোড়ায় না বরং যাবতীয় পুণ্যকেও ভস্ করে দেয়।

৫. শয়তান দৃশ্যমান নয়, মনুষ্য চোখে তাকে দেখা না গেলেও সে বিদ্যমান ও মানুষের শত্রু তা সত্য। সে মানুষকে বিপথগামী করার ক্ষমতা রাখে। এক হাদীসে এসেছে, 'নিশ্চয়ই শয়তান বলেছে, হে রব! আমি তোমার ইজ্জত-সম্মানের কসম করে বলছি, আমি তোমার বান্দাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের শরীরে রূহ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপথগামী করব। আল্লাহ বলেছেন, "আমি আমার ইজ্জত ও মহত্ত্বের শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব।' (মুসনাদে আবী ইয়ালা-২/৪৫৮, হা. ১৩৬৯, মুসতাদরাকে হাকেম-৪/২৯০, হা. ৭৬৭২ সহীহ)

৬. শয়তানের অস্তিত্ব সত্য। সে মানুষকে আড়ালে থেকে ধোঁকা দেয়, মনে কুমন্ত্রণা দেয় । কতিপয় মানুষ এমন রয়েছে, যাদের মাঝে শয়তানী কূটচাল বিদ্যমান। তারা সরল-সত্য পথ থেকে বিচ্যুত । এরা মানুষরূপী শয়তান। তারাও মানুষদের কুমন্ত্রণা দেয় । জিন শয়তান এবং মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায় হলো আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

উল্লেখ্য যে, আপন আপন ভাষায় আল্লাহর কাছে শয়তান ও অনিষ্টকারী মানুষ এবং অনিষ্টকারী জীবজন্তু থেকে আশ্রয় চাওয়া যায়। আউযুবিল্লাহ পড়ে অথবা রাসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত আশ্রয় প্রার্থনা করা সম্পর্কিত কোনো দোয়া পড়ে আশ্রয় চাওয়া যায়। এ ছাড়া সূরা ফালাক্ব ও নাস ইত্যাদি পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া যায়।

বইঃ ইকামাতে দ্বীন,

লেখকঃ মরহুম অধ্যাপক গোলাম আজম

প্রাথমিক কথাঃ

১৯৭৮ সালে 'বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন' নামে প্রথম প্রকাশিত এবং ১৯৮১ সালের তৃতীয় সংস্করণ থেকে "ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন" নামে লেখা পুস্তিকার দ্বিতীয় সিরিজ হিসেবে প্রকাশিত 'ইকামাতে দ্বীন'।

দ্বীনি দায়িত্ব পালনের দুটি দিক রয়েছে।

১. খিদমাতে দ্বীন,

২. ইক্বামাতে দ্বীন।

মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকাহ, ওয়াজ, তাবলীগ, ইসলামী সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীন-ইসলামের যে, বিরাট খেদমত হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রকার খেদমতই অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সকলের খেদমত মিলেই ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করছে এবং এ খেদমতগুলোকে পরস্পর পরিপূরক মনে করা প্রত্যেক মুসলিম খাদেমে দ্বীনের কর্তব্য।

যারা নিজেদের দ্বীনি খেদমতকেই শুধু মূল্যবান মনে করে এবং অন্যদের খেদমতের কদর করে না, তাদের দ্বারা উম্মাতের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবার আশংকা রয়েছে।

'ইকামাতে দ্বীন' পুস্তকটিতে খেদমতে দ্বীন ও ইকামাতে দ্বীনে পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে।

★ এ বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয় ২ টিঃ

১. 'দ্বীন' শব্দের ব্যাখ্যা,

২. "ইকামাতে দ্বীনের" মর্ম,

★ 'দ্বীন' শব্দের ব্যাখ্যাঃ

১. দ্বীন শব্দের অর্থ ৪ টি।

২. দ্বীনের ব্যাপকতা,

৩. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনই দ্বীন ইসলামের বাস্তব নমুনা

 # দ্বীন শব্দের অর্থ ৪ টি।

১. প্রথম অর্থ প্রতিদান বা বদলা, যেমন- مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (সূরা ফাতেহা) অর্থ: "প্রতিদান দিবসের মালিক।"

২. দ্বিতীয় অর্থ আনুগত্য, যেমন- "আল্লার প্রতি আনুগত্যকে নিরংকুশ (খাস) করে তার দাসত্ব কর।" -(সূরা আয যুমার: ২)

৩. তৃতীয় অর্থ আনুগত্যের বিধান বা পদ্ধতি, যেমন- "নিশ্চয় আল্লার নিকট একমাত্র ইসলামই আনুগত্যের বিধান (জীবন বিধান) "-(সূরা আলে ইমরান: ১৯)

৪. চতুর্থ অর্থ আইন, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা, যেমন- "ফিরাউন বললো, আমাকে ছাড়, আমি মূসাকে হত্যা করবো। সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলিয়ে দেবে অথবা (অন্ততপক্ষে) দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে।"-(সূরা মুমিন: ২৬)

 # দ্বীনের ব্যাপকতাঃ

আল্লার আনুগত্যের যে বিধান হিসেবে দ্বীন ইসলামকে পাঠানো হয়েছে তা মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। ব্যাক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ ও আন্তর্জাতিক সব বিষয়ে যাতে মানুষ একমাত্র আল্লার সঠিক আনুগত্য করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক স্বয়ং ইসলামী জীবন বিধান রচনা করেছেন। সব দেশ, সব কাল ও সব জাতির উপযোগী জীবন বিধান রচনার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো হতেই পারে না।

 # রাসূলূল্লাহ (সঃ) এর জীবনই দ্বীন ইসলামের বাস্তব নমুনাঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

- "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লার (সন্তুষ্টি) ও শেষ দিনের (মুক্তির) আকাংখা করে তাদের জন্য রাসূল (সঃ) এর মধ্যে সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে। "-(সূরা আল আহযাব: ২১)
- দ্বীন ইসলাম কতটা ব্যাপক তা শেষ নবী (সঃ) এর বাস্তব জীবন থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায়। তিনি আল্লার রাসূল হিসেবেই সব কাজ করতেন।
- রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর গোটা জীবনটাই ইসলামী জীবন এবং আল্লাহর দ্বীন বা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে শামিল।
- একদল "ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে" বিশ্বাসী আর অন্যদল "রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মে" বিশ্বাসী। রাসূল (সঃ) এর আনীত দ্বীন-ইসলামের দৃষ্টিতে উভয় দলই ভুল পথে আছেন।

★ "ইকামাতে দ্বীন"

১."ইকামাতে দ্বীনের" মর্ম,
২. ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি,
৩. হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য কেন?
৪. দ্বীনি খেদমতের সাথে এ সংঘর্ষ হয় না কেন?
৫. ওলামায়ে কেরাম সবাই "ইকামাতে দ্বীনে" সক্রিয় নন কেন?
৬. উপমহাদেশের বড় বড় ওলামা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন করেন নি কেন?
৭. জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্ব,
৮. জামায়াতের বৈশিষ্ট্য,
৯. বাংলাদেশে এ জাতীয় জামায়াত আছে কি?
১০. জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদুদী (রঃ)
১১. জামায়াত বিরোধী ফতোয়া,
১২. মাওলানা মওদূদী (রঃ) বিরোধী ফতোয়া
১৩. ওলামা ও মাশায়েখে কেরামের খেদমতে।

 # "ইকামাতে দ্বীনের" মর্মঃ

- ইকামাত শব্দের সহজ বোধ্য অর্থ হলো কায়েম করা, চালু করা, খাড়া করা, অস্তিত্বে আনা, প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি।
- "ইকামাতে দ্বীন" এমন একটি পরিভাষা যার অর্থ বাংলায় বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যায়। "আল্লার দ্বীন কায়েম করা" বা "দ্বীন ইসলাম কায়েম করা" বললে এর সহজ তরজমা হতে পারে।
- "তোমরা পূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। "-(সূরা আল বাকারা: ২০৮)

 # বাংলাদেশে দ্বীনে হকের অবস্থাঃ

- দ্বীনে হক বাংলাদেশে ততটুকুই বেঁচে আছে যতটুকু দ্বীনে বতিল অনুমতি দিয়েছে।
- ইসলম এ দেশে ঐ পরিমাণেই টিকে আছে যেটুকুতে বাতিল বাধা দেয় না।
- ইসলাম পূর্ণাংগ একমাত্র জীবন বিধান। ইসলামকে যদি বিরাট একটি দালানের সংগে তুলনা করা হয় তাহলে কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সে বিরাট বিল্ডিং এর ভিত্তি মাত্র।
- বাংলাদেশে ইসলামের গোটাবিল্ডিং এর তো কোন অস্তিত্বই নেই। শুধু ভিত্তিটুকুর অবস্থাই করুণ।

 # দ্বীনে হক কায়েম হলে বাতিলের অবস্থা কী হয়?

- যেখানে দ্বীনে বাতিল কায়েম আছে সেখানে যেমন দ্বীনে হক বাতিলের অধীনে হয়ে থাকতে বাধ্য হয়, তেমনি দ্বীনে হক কায়েম হলে বাতিলকেই হকের অধীন হতে হয়।
- আল্লাহ পাক বাতিলকে খতম করার হুকুম দেননি। তিনি হককে বিজয়ী করার নির্দেশ দিয়েছেন।
- দ্বীনে হক কায়েম হলে বাতিল ধর্ম খতম হয়ে যাবে না। যারা অন্য ধর্ম পালন করতে চায় তাদেরকে বাধা দেয়া যাবে না।
- মন্দির, গির্জা ইত্যাদির হেফাযত করতে হবে। কারণ ধর্মের উপর শক্তি প্রয়োগ কুরআনে নিষেধ।

★ ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্বঃ

- আল্লাহ পাক এ দায়িত্ব দিয়েই রাসূল (সঃ) কে পাঠিয়েছেন।

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ۙ وَ لَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ ﴿۳۳﴾

"তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও একমাত্র হক দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন (সে দ্বীনকে) আর সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন।" -সূরা আত তাওবা: ৩৩,

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ؕ وَ کَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیۡدًا ﴿۲۸﴾

তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এটাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। -সূরা ফাতহ: ২৮

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ۙ وَ لَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ ﴿۹﴾

তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।- সূরা আস সফ: ৯

- রাসূলের দায়িত্ব পালনে পূর্ণভাবে শরীক হওয়া ঈমানের অপরিহার্য দাবী। - ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলিমেরই।
- ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব (ফরিযায়ে ইকামাতে দ্বীন) প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।

★ রাসূল (সঃ) কি দায়িত্বের অতিরিক্ত কাজ করেছেন?

- ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা, এ রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করা, এ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার গঠন করা, দেশের প্রচলিত আইনের বদলে কুরআনের আইন চালু করা, ইনসাফপূর্ণ বিচার-ব্যবস্থা কায়েম করা, আল্লাহর দেয়া রিযক থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না থাকে এমন অর্থনৈতিক বিধান জারী করা ইত্যাদি অগণিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজ তিনি করেছেন। এ কাজগুলো কি ইসলামী দায়িত্ব হিসেবেই তিনি করেননি?
- আল্লার রাসূলই হচ্ছেন দ্বীন ইসলামের আদর্শ। এসব কাজ যদি তিনি দ্বীনের দায়িত্ব হিসেবে নিজেই করে থকেন তাহলে এগুলোর গুরুত্বকে অবহেলা করলে দ্বীনদারীর ক্ষতি হবে কি না?
- বিস্ ময়ের বিষয় যে, দ্বীনদারীর দোহাই দিয়েই দ্বীনের এসব দায়িত্বকে অগ্রাহ্য করা হয়।
- বাতিলকে পরাজিত করে দ্বীনে হককে বিজয়ী করার দ্বীনি দায়িত্বই যে আসল কাজ এবং সে কাজের যোগ্য হবার জন্যই যে, নামায, রোযা, যিকর ইত্যাদির দরকার, যদি দ্বীনদার লোকেরাই সে কথা না বুঝে তাহলে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার দায়িত্ব কারা পালন করবে?
- "ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব অমুক বড় আলেম পালন করেননি বলে আমিও পালন করা দরকার মনে করিনি"এ খোঁড়া যুক্তি সেখানে কোন কাজে আসবে না।

★ ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন কর্মপদ্ধতিঃ

দুনিয়ায় যে কোন আদর্শ কায়েমের এটাই একমাত্র স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

এক: আদর্শ কায়েমের জন্য একদল নেতা ও কর্মী বাহিনী তৈরী হওয়া প্রয়োজন।

দুই: যোগ্য নেতা ও কর্মী দল আসমান থেকে নাযিল হয় না। মানব সমাজ থেকেই এদেরকে সংগঠিত করে গড়ে তুলতে হয়।

তিন: ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাথে কায়েমী স্বার্থের এ সংঘর্ষ প্রত্যেক নবীর জীবনেই দেখা গেছে।

চার: আন্দোলনের যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী তৈরীর এ চিরন্তন পদ্ধতি অবশ্যই সময় সাপেক্ষ।

পাঁচ: ব্যক্তি গঠনের এ পর্যায় অতিক্রম করার পরই সমাজ গঠনের সুযোগ হতে পারে।

ছয়: ইসলামের খেদমত ও ইসলামী আন্দোলনে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

সাত: ইসলামী আন্দোলন সঠিক কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী নিয়ে দীর্ঘ সংগ্রাম যুগ অতিক্রম করা সত্ত্বেও এবং ইসলাম কায়েমের যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীদল সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত বিজয় যুগ নাও আসতে পারে।

 # ইসলামী আন্দোলন ও ক্যাডার পদ্ধতিঃ

- যে কোন আদর্শ বাস্তবে কায়েম করতে হলে সে আদর্শে মন, মগয ও চরিত্র বিশিষ্টি নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী তৈরী করতেই হবে।
- আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলন উপযুক্ত নেতা ও কর্মীদল তৈরী করার জন্য কোন না কোন ক্যাডার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য।
- প্রথমে সমর্থক, ক্রমে কর্মী ও সদস্যের দায়িত্ব গ্রহণ করার একটা স্বভাবিক ক্রমিক পর্যায় প্রয়োজন। এ জাতীয় পদ্ধতিকেই ক্যাডার সিষ্টেম বলে।

★ হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য কেন?

- হক কায়েমের চেষ্টা করলে বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা আসাই স্বাভাবিক। কারণ হক ও বাতিল একই সাথে চালু থাকতে পারে না।
- ইসলামের প্রথম কথাই বাতিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ কারণেই কালেমার দাওয়াত নিয়ে যে নবীই এসছেন তাগুত বা বাতিল তাকে স্বাভাবিকভাবেই দুশমন মনে করে নিয়েছে।

★ দ্বীনি খেদমতের সাথে এ সংঘর্ষ হয় না কেন?

- যে দেশে দ্বীনে হক কায়েম নেই সেখানে ইকামাতে দ্বীনের কাজ বা ইসলামী আন্দোলন চালালে কায়েমী স্বার্থ অবশ্যই বাধা দেবে।
- যদি কায়েমী স্বার্থ কোন ইসলামী খেদমতকে বিপজ্জনক মনে না করে তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐ খেদমত যতই মূল্যবান হোক তা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন নয়।
- মাদরাসা, খানকা, তাবলীগ দুনিয়াময় দ্বীনের বুনিয়াদী শিক্ষাকে পৌঁছানের মাধ্যমে খিদমাতে দ্বীনের মহান কাজ করে যাচ্ছেন।
- মাদ্রাসা,তাবলীগ,ও খানকাসহ অন্যান্য খেদমতে দ্বীনের সাথে বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হয় না। কারণ, তাঁদের পদ্ধতির মধ্যে বাতিলের উৎখাতের কোন কর্মসূচি নেই।
- একমাত্র ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াত ও প্রোগ্রামের সংগেই এ সংঘর্ষ বাধে। সব নবীর জীবনেই একথা সত্য বলে দেখিয়ে গিয়েছে।

★ ওলামায়ে কেরাম সবাই "ইকামাতে দ্বীনে" সক্রিয় নন কেন?

- বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ ওলামায়ে কেরাম আছেন। তারা বিভিন্ন প্রকার দ্বীনি খেদমতে নিযুক্ত রয়েছেন।
- ইকামাতে দ্বীনের দাবী অনুযায়ী তারা ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় না হওয়ার পেছনে কারণ ৫ টি।

একঃ যারা মাদ্রাসায় পড়তে আসে তারা প্রায় সবাই গরীবের সন্তান। ফলে উন্নত মানের আলেম কমই হচ্ছে।

দুইঃ মাদ্রাসা শিক্ষা দ্বারা দুনিয়ার উন্নতির আশা কম বলে ধনী লোকেরা মাদ্রাসায় ছেলেদেরকে পাঠাতে চায় না।

তিনঃ যারা মাদ্রাসায় পড়তে বাধ্য হয় তারা শুধু আখেরাতের আশাই করে।

চারঃ মাদ্রাসা শিক্ষায় ইসলামকে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে শেখাবার ব্যবস্থা নেই। শুধু ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবেই ইসলামকে শেখান হয়।

পাঁচঃ সম্ভবত সবচেয়ে বড় কারন রাসূল (সঃ)-কে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মানা সম্পর্কে সঠিক ধরনার অভাব।

 # দ্বীনের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (স.)ঃ

- আল্লাহ পাক একমাত্র রাসূল (সঃ)-কে উসওয়াতুন হাসানা বা দ্বীনের মাপকাঠি বানিয়েছেন।
- রাসূল (সঃ)-কে মানার উদ্দেশ্যেই আমরা সাহাবায়ে কেরামকে মানি।
- ওহী দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দরুন রাসূল যেমন নির্ভূল তেমন আরকেউ হতে পারে না। এজন্যই রাসূলকে যেমন অন্ধভাবে মানতে হয় তেমন আর কাউকে মানা চলে না।

 # উপমহাদেশের বড় বড় ওলামা

ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন করেন নি কেন?

- বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে আলেমগনের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।
- ১৮৩১ সালে বালাকোটে পরাজয়ের পর থেকে ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের তখনকার রাজনৈতিক পরিবেশে ওলামায়ে হিন্দের নিকট ইংরেজ থেকে আজাদী হাসিলই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।
- আর মুসলিমলীগ পন্থি ওলামাদের নিকট দেশ ভাগ করে স্বাধীন মুসলীম দেশ কায়েমই আসল লক্ষ্য ছিল।
- এ দুটো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজের নেতৃত্ব দেয়ার মতো পজিশন তাদের ছিল না।
- ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াত ও কর্মসূচী নিয়ে এ দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিনত করার আন্দোলন করাই যে দ্বীনের দাবী তা উপলব্ধির অভাব।

★ জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্বঃ

- ইকামাতে দ্বীনের কাজ কারো পক্ষে একা করা কিছুতেই সম্ভব নয়।
- এমন কি শত যোগ্যতা সত্বেও কোন নবীও একা দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন নি। অবশ্য প্রথমে নবীকে একা শুরু করতে হয়েছে।
- সফরের সময় দু'জন এক সাথে সফর করলেও একজনকে আমীর মেনে জামায়াতের শৃঙ্খলা মতো চলার জন্য রসূল (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন।
- জমায়াত ছাড়া ইসলামী জিন্দেগী সম্ভব নয় এবং আমীর ছাড়া ও জামায়াত হতে পারে না।

★ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে গঠিত জামায়াতের বৈশিষ্ট্যঃ

- প্রত্যেক সংগঠন,জামায়াত বা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। স্বাভাবিকভাবে ঐ উদ্দেশ্যেই সেখানে লোক তৈরী করার পরিকল্পনা থাকে।

- ইকামাতে দ্বীনের জন্য গঠিত জামায়াতের কয়েকটি বৈশিষ্ট রয়েছেঃ

১. একঃ ইসলাম যতটা ব্যাপক এ জামায়াতের দাওয়াত ততটা ব্যাপক হবে।

২. দুইঃ এ জামায়াত ইসলামের পূর্নাংগ শিক্ষাকে মানব সমাজের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করবে।
৩. তিনঃ পূর্ন দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে মানুষকে এ সংগঠনে শামিল করার চেষ্টা করবে।
৪. চারঃ যত প্রকার তারবিয়াত বা ট্রেনং সম্ভব তার মাধ্যমে যোগ্য কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করবে।
৫. পাঁচঃ বাতিল নেজাম বা দ্বীনে বাতিল এ জাতীয় জামায়াতকে তাদের জন্য বিপদ জনক মনে করে তার অগ্রগতি রোধ করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে।
৬. ছয়ঃ বাতিল শক্তি ও কায়েমী স্বার্থের এ বিরোধিতা ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী হয়।
৭. সাতঃ এ জাতীয় সংগঠনের কেউ নেতা হবার চেষ্টা করে না। এবং নেতার যোগ্যতা সম্পন্ন লোককে নেতৃত্ব গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।
৮. আটঃ ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে গঠিত জামায়াতের নিকট ইসলামী আদর্শই আসল আকর্ষন। মানুষকে এ আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করাই এর বৈশিষ্ট্য।

★বাংলাদেশে এ জাতীয় জামায়াত আছে কি?

- পূর্নাঙ্গ জামায়াত না পাওয়ার অজুহাতে ইকামাতে দ্বীনের কাজ না করলে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।
- আল্লাহপাক আমাকে যতটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন তাতে ইকামাতের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীর চেয়ে উন্নত কোন জামায়াত আমি পাইনি।
- আল্লাহর দ্বীনকে এ দেশে কায়েম করার জন্য যদি জামায়াতে ইসলমীর চেয়ে আরও উন্নত কোন সংগঠন আমি পাই এ জামায়াত ছেড়ে ঐ সংগঠনে যোগ দান করা ফরয মনে করবো।

#জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদুদী (রঃ)

- বর্তমান জামায়াতে ইসলামীর সাথে মরহুমের সম্পর্কঃ

১. একঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আল মওদুদী (রঃ) আজীবন একথার উপর জোর দিয়েছেন যে, আল্লার রাসূল (সঃ) ছাড়া আর কোন ব্যক্তিকে অন্ধভাবে মানা উচিত নয়।
২. দুইঃ এ জামায়াতে আহালে সুন্নাহ আল জামায়াতের যে কোন মাযহাবের লোক শামিল হতে পারে।
৩. তিনঃ জামায়াতের সবারই ইসলাম সম্পর্কে অতীত ও বর্তমান সকল লেখকের বই থেকে স্বাধীন ভাবে মতামত গ্রহন করার পূর্ন স্বাধীনতা রয়েছে। মওলানা মওদুদী (রঃ) চিন্তার স্বাধীনতার উপর এত গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই তাকে অন্ধভাবে অনুসরনের কোন আশংকা নেই।
৪. চারঃ জামায়াতে ইসলামী মওলানা মওদূদী (রঃ)-কে ফেকাহ বা আকায়েদের ইমাম মনে করে না।
৫. পাঁচঃ আরব দুনিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশের বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদ ও ওলামায়ে কেরাম মাওলানা মওদূদী (রঃ)-কে এ যুগের শ্রেষ্টতম ইসলামী চিন্তাবিদ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

 # জামায়াত বিরোধী ফতোয়াঃ

- জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যারা ফতোয়া দেন ও প্রচার করেন জামায়াত তাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে সময় নষ্ট করে না।
- জামায়াত তাদের দ্বীনি খেদমতকে স্বীকার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ করে না।
- দেশে দ্বীনে হক ও দ্বীনে বাতিলের যে সংঘর্ষ চলছে তাতে অবশ্য ঐসব ফতোয়া বাতিলের পক্ষে লাগাচ্ছে।
- তবুও জামায়াত তাদেরকে বিরোধী শক্তি বলে মনে করে না। তাদের সাথে জামায়াতের কোন লড়াই নেই।
- জামায়াতে ইসলামীকে সংশোধন করার নিয়তে আলেমগণ যে কোন ধরনের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিলে জামায়াত তাদের এ মহান খেদমতের জন্য শুকরিয়া জানাবে।

 # মাওলানা মওদূদী (রঃ) বিরোধী ফতোয়াঃ

- মাওলানা মওদূদী (রঃ) ছোট বড় শতাধিক বই লিখেছেন।
- যিনি এতকিছু লিখেছেন তার লেখায় কোন ভুল ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। - কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তার বিভিন্ন লেখা থেকে উদ্বৃতি নিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন, লেখকের মূল বক্তব্যের সাথে সমালোচনার কোন মিল নেই।
- যারা জ্ঞান চর্চায় নিযুক্ত তারা যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে তার লেখার সমালোচনা করলে দ্বীনের অবশ্যই উপকার ও খেদমত হবে।
- দুনিয়ার বড় বড় ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মওদূদী (রঃ)-কে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ট আলেম ও ইসলামের মহান বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকার করেন।

★ওলামা ও মাশায়েখে কেরামের খেদমতেঃ

- ওলামায়ে কেরামে ও মাশায়েখে এযাম হলেন নবীর ওয়ারিস।

- অগণিত আধুনিক শিক্ষিত লোকের পক্ষে ইসলামের ইলম ও আমল সম্বন্ধে শিক্ষা পেতে হলে ওলামা ও মাশায়েখের সাহায্য ছড়া উপায় নেই।
- সকল হাক্কানী ওলামা ও মাশায়েখের খেদমতে আরজ মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর "তাফহীমুল কুরআন" "রাসায়েল ও মাসায়েল" নামক পুস্তকগুলো পড়ে দেখুন।
- শুধু অন্যের মন্তব্য শুনেই সিদ্ধান্ত না নিয়ে নিজে দেখে ফয়সালা করুন।

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। - আল-বাকারা: ২৬১ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।- আল-ইমরান: ৯২ঃ

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَ لَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١١﴾

এমন কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি বহু গুণে এটাকে বৃদ্ধি করবেন তার জন্য। আর তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। -আল-হাদীদ: ১১ঃ

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্ত ১টি হাদীস

عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " انْفَحِي - أَوِ انْضَحِي أَوْ أَنْفِقِي - وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ

আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেনঃ তুমি ছড়িয়ে দাও অথবা বিলিয়ে দাও অথবা ব্যয় কর। গুণে গুণে রেখ না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুণে গুনে দিবেন। আর গুটিয়ে রেখ না তবে আল্লাহ ও তোমার থেকে গুটিয়ে রাখবেন। (সহীহ মুসলিমঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-২২৪৮)

মাসয়ালা: ত্বহারাত সংক্রান্ত। পৃষ্ঠা -১০

অনুশীলনী -১৭(সেপ্টেম্বর-১ম সপ্তাহঃ)
বিষয় : মহান রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায় আমাদের তৎপরতা
- প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম
দারস তৈরী -সূরা মুদ্দাসির(১-৭নংআয়াত),

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ(১) قُمْ فَأَنْذِرْ(2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7) فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ

১. হে কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি ২. উঠুন এবং সতর্ক করুন ৩. এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত্ত্ব ঘোষণা করুন ৪. আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন ৫. প্রতিমা থেকে দূরে থাকুন ৬. অধিক প্রাপ্তির আশায় কারো প্রতি অনুগ্রহ করবেন না ৭. এবং আপনার রবের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করুন। (সূরা আল-মুদ্দাস্সির ১-৭)

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের আল-মুদ্দাস্সির (এ) শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আল-মুদ্দাসির (এ) অর্থ বস্তু বা কম্বল আচ্ছাদনকারী। এখানে আল-মুদ্দাস্সির (প্রে) শব্দ দ্বারা। রাসূলুল্লাহ সা.-কে সম্বোধন করা হয়েছে।
নাযিল হওয়ার সময়কালঃ সূরা আল-মুদ্দাসসির দুটি অংশে নাযিল হয়। প্রথম অংশে সূরার প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হয়। এটি

✦ নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'আল-মুদ্দাস্সির' (الْمُدَّثِّرُ) শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'আল-মুদ্দাস্সির' (الْمُدَّثِّرُ) অর্থ বস্ত্র বা কম্বল আচ্ছাদনকারী। এখানে 'আল-মুদ্দাস্সির' (الْمُدَّثِّرُ) শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সা.-কে সম্বোধন করা হয়েছে।

✦ **নাযিল হওয়ার সময়কাল**

সূরা আল-মুদ্দাসসির দু'টি অংশে নাযিল হয়। প্রথম অংশে সূরার প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হয়। এটি সর্বপ্রথম নাযিলকৃত সূরাহ আলাকের পর নাযিল হয়। অর্থাৎ সম্ভবত এ আয়াতগুলো ৬১০ খ্রি. শাওয়াল মাসে নাযিল হয়।

দ্বিতীয় অংশে অষ্টম আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। এটি প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রচার শুরু হওয়ার পর প্রথমবার মক্কায় হজের মওসুম সমাগত হলে নাযিল হয়।

✦ **সূরার বিষয়বস্তু**

- সূরার প্রথম সাতটি আয়াতে নবুওয়াতের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্মনীতি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মহান রবের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা বা তাওহিদের প্রতি আহ্বান এবং আহ্বানের ক্ষেত্রে রাসূল সা.-এর শারীরিক ও আত্মিক প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

- ৮-৫৩ আয়াতে সত্য দ্বীন অমান্যকারীদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে কিয়ামতের দিবসে তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

- ৫৪-৫৬ আয়াতে বলা হয়েছে, এ কুরআন হচ্ছে মানুষের জন্য উপদেশ। কিন্তু এ উপদেশ কবুল করার জন্য আল্লাহ কাউকে বাধ্য করেন না। যে গ্রহণ করবে সে-ই উপকৃত হবে; আর যে গ্রহণ করবে না সে-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

✦ **নির্বাচিত আয়াতসমূহের আলোচ্য বিষয়**

সূরাহ আল-মুদ্দাস্সিরের প্রথম সাতটি আয়াতে নবুওয়াতের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্মনীতি সংক্রান্ত ছয়টি নির্দেশনা প্রদান হয়েছে।
প্রথম নির্দেশ : قُمْ فَأَنْذِرْ অর্থাৎ উঠুন এবং বিশ্ববাসীকে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপনের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করুন।
দ্বিতীয় নির্দেশ : وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ অর্থাৎ মহান রবের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করুন ও প্রতিষ্ঠা করুন।
তৃতীয় নির্দেশ : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ পোশাক, দেহ, অন্তর ও মনকে পবিত্র করুন।
চতুর্থ নির্দেশ : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ অর্থাৎ প্রতিমা পূজা ও যাবতীয় পাপাচার থেকে দূরে থাকুন।
পঞ্চম নির্দেশ : وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ অর্থাৎ পার্থিব প্রতিদানের আশায় কাউকে দান ও অনুগ্রহ করা থেকে বিরত থাকুন।
ষষ্ঠ নির্দেশ : وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ অর্থাৎ সর্বাবস্থায় রবের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করুন।
নির্বাচিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাঃ

❖ **প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা:** يا أَيُّها المدَّثِّر ওহে বস্ত্র আচ্ছাদিত ব্যক্তি।"

আরবীতে কাউকে ডাকার জন্য 'হরফে নিন্দা')ا(حرف(ব্যবহার করা হয়। এখানে 'ইয়া আইয়ুহা') 'হরফে নিদা। আর যাকে ডাকা হয় বা সম্বোধন করা হয় সেটি মুনাদা। এ আয়াতে মুহাম্ াদ সা.-কে আল-মুদ্দাস্সির (খ) তথা 'ওহে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এটি প্রীতিপূর্ণ সম্বোধন। মহান আল্লাহ অন্য সকল নবীকে আহ্বান করার সময় নাম ধরেই সম্বোধন করেছেন। কিন্তু মুহাম্ াদ সা.-কে কখনও ইয়া মুহাম্ াদ' বলেননি, বরং তাঁকে অতি আদর করে সম্বোধন করেছেন। এ রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি বিশেষ সম্ ান।

সূরাহ আলাক নাযিলের পর কিছুকাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওপর অহি নাযিল বন্ধ থাকে। এ সময়কে ফাতরাতুল অহি' বলে। সে সময় রাসূলুল্লাহ সা. এতো কঠিন মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। অহি নাযিলের বিরতির শেষভাগে একদিন রাসূল সা পবিত্র মক্কায় পথ চলাকালে ওপর দিক থেকে কিছু আওয়াজ শুনতে পান। তিনি ওপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে ফেরেশতা জিবরিল (আ) আকাশে একটি ঝুলন্ত আসনে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে তিনি ভীত-আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরে বললেন رمى زيتونى( )আমাকে চাদরাবৃত কর আমাকে চাদরাবৃত কর।। অতঃপর তিনি চাদরাবৃত হয়ে শুয়ে পড়লেন।

সেমতাবস্থায় রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে ডেকে বলা হচ্ছে হে আমার প্রিয় বান্দা মুহাম্ াদ সা। আপনি চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছেন কেন? আপনার ওপরে তো একটি বিরাট মহৎ কাজের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালন করার জন্য আপনাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উঠে দাঁড়াতে হবে। অতঃপর তাঁকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে ছয়টি কাজের নির্দেশ দেয়া হয়। (ইবনে জারির)

❖ **দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা :** قُمْ فَأَنْذِر "উঠুন অতঃপর সতর্ক করুন।"

এখানে 'কুম' (قُمْ) এবং 'আনযির' (أَنْذِر) দু'টি শব্দে একটি আয়াত। দু'টি শব্দই 'আমর' বা আদেশ সূচক। 'কুম' (قُمْ) অর্থ উঠুন, দ-ায়মান হোন, কর্মে তৎপর হোন ইত্যাদি। আর 'আনযির' (أَنْذِر) অর্থ সতর্ক করুন, ভয় দেখান ইত্যাদি।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দেন, হে কম্বলজড়ানো ব্যক্তি! আপনার কম্বল জড়িয়ে শয্যা গ্রহণের অবকাশ কোথায়। আপনার প্রতি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার এক বিরাট দায়িত্ব চাপানো হয়েছে, আপনি উঠুন। আমার একত্ববাদ প্রচার করুন এবং যারা আমার সত্তায়, গুণে ও ক্ষমতায় আমার সাথে অন্যান্য বস্তুকে শরিক করে তাদেরকে এটার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করুন।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি এ নির্দেশ এমন এক সময় ও পরিবেশে অবতীর্ণ হয়, যখন মক্কাসহ সমগ্র আরবের লোক ও জনপদগুলো শিরকে নিমজ্জিত ছিল আর তিনি ছিলেন একাকী। তাঁর সঙ্গী-সাথী কেউই ছিল না। এহেন পরিবেশে সর্বজন বিরোধী একটি মতাদর্শ নিয়ে দ-ায়মান হওয়া এবং তা জনসম্ ুখে প্রচার করা কত বড় বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার ছিল তা একটু চিন্তা করলেই বোধগম্য হয়। এহেন পরিবেশের মধ্যেই আল্লাহ বললেন, আপনি তৌহিদের পতাকা নিয়ে দ-ায়মান হোন এবং মানুষকে তৌহিদের পরিপন্থী আকিদা-বিশ্বাসের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকুন। এটাই আপনার প্রথম কাজ। এ যেন মহা স্রোতের বিপরীতে চলার এক কঠিন নির্দেশ।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে রাসূলকে সা. 'নাযির' তথা সতর্ককারীর দায়িত্বসহ প্রেরণের কথা বলা হয়েছে।
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
"হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে।" (সূরাহ আহযাব : ৪৫)
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ.
"আমি তোমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে। আর এমন কোন সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়নি যার মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেনি।" (সূরাহ ফাতির : ২৪)
إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (১) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
"আমি নূহকে তার কওমের কাছে পাঠিয়েছিলাম, যেন তিনি তার কওমের লোকদের ওপর এক ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব আসার পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করে দেন। তিনি বলেছিলেন, হে আমার দেশবাসী! আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সাবধানকারী।" (সূরা নূহ : ১-২)

❖ **তৃতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা :** وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ "আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।"
সূরাহ আল-মুদ্দাসসিরে দ্বিতীয় নির্দেশনায় মহান আল্লাহ বলেন, হে নবী! মানুষ আমার মহানত্ব, বিরাটত্ব ও অসীমত্বের কথা ভুলে আমার জমিনে শয়তানের কথামত রাজত্ব পরিচালনা করছে। আমার জমিনে এখন বাতিলের রাজত্ব চলছে। লাত, মানতের পূজা-অর্চনা করা হচ্ছে। অথচ জমিনের মালিক হলাম আমি আল্লাহ। আমার জমিনে শয়তানের রাজত্ব চলতে পারে না। মানবরচিত মতবাদ চলতে পারে না। আপনি উঠুন এবং আল্লাহর তাকবির ঘোষণা করুন। 'ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির' (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) অর্থাৎ সব জায়গায় 'আল্লাহু আকবার' (الله اكبر) ধ্বনিত হবে। জগতের সর্বত্রই থাকবে আমার শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ। মানুষের আকিদা-বিশ্বাস হতে শুরু করে তাদের কর্মময় জীবনের প্রতিটি স্তরে থাকবে আমারই শ্রেষ্ঠত্বের ফলিতরূপ। একজন মু'মিন 'আল্লাহু আকবার' (الله اكبر)-এর তাকবির বা স্লোগান ছাড়া কোনো মানুষের তাকবির বা স্লোগান দিতে পারে না। এটি কুফরি স্লোগান। আল্লাহ বলেন, জমিনের মালিক আমি আল্লাহ। এ জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই আমার হুকুমে তৈরি হয়েছে। সুতরাং এ জমিনে আইন চলবে একমাত্র আল্লাহর। এ সম্পর্কে সূরাহ আরাফের ৫৪তম আয়াতে বলা হয়েছে,
أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
"সাবধান! সৃষ্টি যার, আইন চলবে একমাত্র তার। বরকতময় আল্লাহই বিশ্ব জগতের মালিক।"
পৃথিবীতে যতজন নবী ও রাসূল আগমন করেছেন, এটিই ছিলো তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। এ ব্যাপারে সূরাহ আন-নাহলের ৩৬তম আয়াতে বলা হয়েছে,
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
"প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে, "আল্লাহর বন্দেগি করো এবং তাগুতের বন্দেগি পরিহার করো।"
সকল নবীরই প্রধান কাজ ছিলো মহান রবের একত্ববাদের দিকে আহ্বান করা। সূরাহ আরাফের ৫৯, ৬৫, ৭৩ ও ৮৫তম আয়াতে হযরত নূহ, হুদ, সালেহ, শুয়াইব (আ) এর দাওয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে,
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ.
"হে আমার দেশবাসী! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।"
তাই একজন নবীর প্রথম কাজই হলো, অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা এ পৃথিবীতে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ মেনে চলছে তাদের সবাইকে অস্বীকার করবে এবং গোটা পৃথিবীর সামনে উচ্চকণ্ঠে এ কথা ঘোষণা করবে যে, এ বিশ্বজাহানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ নেই।
ইসলামে 'আল্লাহু আকবার' (الله اكبر) তথা 'আল্লাহই শ্রেষ্ঠ' কথাটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। 'আল্লাহু আকবার' ঘোষণার মাধ্যমেই আযান শুরু হয়। 'আল্লাহু আকবার' এ কথাটি বলে মানুষ সালাত শুরু করে এবং বারবার 'আল্লাহু আকবার' বলে ওঠে ও বসে। কোন পশুকে জবাই করার সময়ও 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করে। জন্মের সময় শিশুর কানে দেয়া হয় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি আবার মৃত্যুর পর সালাতু যানাজার মাধ্যমেও দেয়া হয় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি। তাকবির ধ্বনি বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সর্বাধিক স্পষ্ট ও পার্থক্যসূচক প্রতীক। কারণ, মহানবী সা. আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মাধ্যমেই রিসালাতের কাজ শুরু করেছিলেন। অতএব একজন মুমিনের 'আল্লাহু আকবার' ছাড়া অন্য কোনো স্লোগান হতে পারে না।

❖ **চতুর্থ আয়াতের ব্যাখ্যা :** وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ "আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন।"
এ আয়াতে 'সিয়াব' (ثِيَابْ) ও 'তাহির' (طَهِّرْ) দু'টি শব্দ রয়েছে। 'সিয়াব' (ثِيَابْ) শব্দটি 'সাওবুন' (ثَوْبً) এর বহুবচন। একে 'লিবাস' (لباس)ও বলা হয়। এর আসল অর্থ কাপড় বা পোশাক। এর রূপক অর্থ অন্তর, মন, দেহ, কর্ম ইত্যাদি।
অতএব, এ আয়াতে নবীকে সা. নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, হে নবী! আপনি স্বীয় পোশাক ও দেহকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন, পোশাকের নৈতিক দোষত্রুটি হতে মুক্ত রাখুন। অর্থাৎ পোশাকে অহংকার, গৌরব, রিয়া বা লৌকিকতা থেকে মুক্ত রাখুন। অনুরূপভাবে অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং অসৎচরিত্রতা থেকে মুক্ত রাখুন।
ইসলাম মানুষকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হতে শিক্ষা দেয়। হাদিসে পবিত্রতাকে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে। তাই মুমিনগণকে সর্বাবস্থায় দেহ, স্থান ও পোশাক বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে এবং অন্তরকে অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে।

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা., ইবরাহিম নাখয়ী, শা'বী, আতা, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সায়ীদ ইবন যুবাইর, হাসান বসরী (রহ.) ও অন্যান্য বড় বড় মুফাসসির এ আয়াতের তাৎপর্যে বলেছেন, আপনার চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখুন ও সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি হতে নিজেকে মুক্ত রাখুন। রাসূলুল্লাহ সা. যে সমাজে ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন তা শুধু আকিদা-বিশ্বাস ও নৈতিক আবিলতার মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল না বরং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে পর্যন্ত সে সমাজের লোক অজ্ঞ ছিল। এসব লোককে সব রকমের পবিত্রতা শিক্ষা দেয়া ছিল রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাজ। তাই তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তাঁর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জীবনের সকল পবিত্রতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখেন।

নবী করীম সা. স্বভাবগতভাবেই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন। তাই তিনি যেন সচেতনতার সাথে পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখেন তারই শিক্ষা রয়েছে এই আয়াতে। নৈতিক দিক দিয়ে পোশাক পবিত্রতার অর্থ হচ্ছে- পোশাক এমন হতে হবে যাতে অহংকার প্রকাশ পাবে না, তাতে কুরুচির ছাপও থাকবে না।

মহান আল্লাহ পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। যেমন- পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "অবশ্যই মহান আল্লাহ অধিক হারে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২২২)

পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ পরিচ্ছন্ন, তিনি পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসেন।" (তিরমিজি)

অনুরূপভাবে সূরাহ মায়িদার ষষ্ঠ আয়াতে সালাতের পূর্বে পবিত্রতা তথা অজুর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

এক কথায় বলা যেতে পারে, এই আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে-

১. পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

২. পোশাক পরিচ্ছদ নৈতিক দোষত্রুটি থেকে পবিত্র রাখা।

৩. সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি হতে নিজ চরিত্রকে পবিত্র রাখা।

অতএব দায়ী হিসেবে আমাদের সকলকে পবিত্রতার ক্ষেত্রে এ তিনটি দিকেই সতর্ক থাকতে হবে।

❖ **পঞ্চম আয়াতের ব্যাখ্যা :** وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ "প্রতিমা থেকে দূরে থাকুন।"

অত্র আয়াতে 'আর-রুজ্যন' (الرُّجْزَ) থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 'আর-রুজ্যন' (الرُّجْزَ) শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ।

- প্রসিদ্ধ তাবিঈ মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদাহ, যুহরী, ইবন যায়েদ, আবূ সালামা (রহ.) প্রমুখ বলেছেন, 'আর-রুজ্যন' (الرُّجْزَ) অর্থ মূর্তি। অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে বর্জন করো, এগুলোর কাছেও যেয়ো না।
- ইবন আব্বাস রা. বলেছেন, এর অর্থ হলো পাপাচার।
- আবু আলিয়া এবং রবী (রহ.) বলেছেন, এর অর্থ অপবিত্রতা এবং গুনাহ।
- ইমাম যাহহাক বলেছেন, এর অর্থ শিরক।
- কালবী বলেছেন, এর অর্থ আজব।
- আল্লামা সাবুনি বলেছেন, এর দ্বারা সর্বপ্রকার খারাপ জিনিস উদ্দেশ্য হতে পারে।

অতএব আয়াতের অর্থ হলো, হে নবী! আপনি প্রতিমা পূজা এবং যাবতীয় গুনাহ ও অপবিত্রতা পরিত্যাগ করুন।

এখানে অপবিত্রতা বলতে, আকিদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার অপবিত্রতা হতে পারে, নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্মের অপবিত্রতা হতে পারে আবার শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ওঠা-বসা চলাফেরার অপবিত্রতাও হতে পারে। অর্থাৎ চিন্তা-চেতনা, আচার- ব্যবহার, ও দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজকর্ম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের সামান্যতমও যেন অনুপ্রবেশ না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য মুহাম্ াদ সা.-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্র থেকে মুক্ত রাখুন।

এ বিষয়ে যদি কেউ প্রশ্ন করে, রাসূলুল্লাহ সা. তো আগে থেকেই প্রতিমা পূজা ও যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ছিলেন, তার ধারে কাছেও ছিলেন না। তাহলে তাঁকে এ আদেশ দেয়ার অর্থ কী? এর উত্তরে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সা.-কে নির্দেশের মাধ্যমে উম্ তে মুহাম্ াদীকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য।

❖ **ষষ্ঠ আয়াতের ব্যাখ্যা:** وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ "অধিক প্রতিদানের আশায় কারো প্রতি অনুগ্রহ করো না।"

এ আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে কয়েকটি মেসেজ দেয়া হয়েছে।

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া পার্থিব বিনিময়ের আশায় সকল প্রকার দান-খয়রাত এবং মানব কল্যাণমূলক কাজ করতে এখানে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে কোনো কাজ যদিও ভালো মনে হয়, আর সে কাজের মধ্যে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য না থাকে, তবে সে কাজ আল্লাহর কাছে ভালো বলে গণ্য হবে না।

২. আমরা যারা ইসলামী আন্দোলনের কাজ করছি, এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর একটি বড় হুকুম পালন করছি। তবে এ কাজটি যদি ব্যক্তিস্বার্থের জন্য হয় বা নিজের কোনো উপকার হাসিলের জন্য হয়, তাহলে এ আন্দোলন করার মাধ্যমে নাজাত পাওয়া যাবে না।

৩. আমরা যারা সার্বক্ষণিকভাবে দ্বীনের পথে বা দ্বীনি আন্দোলনের পথে কাজ করছি তাদের এ কথা ভাবার বা মনে করার সুযোগ নেই যে, আমি দ্বীনের অনেক উপকার করলাম। বরং মনে রাখতে হবে যে, কোনো নেক কাজ কিংবা দ্বীনের কাজ করে আল্লাহর কোনো উপকার হয় না, যা উপকার বা কল্যাণ হয় তা নিজেরই উপকার বা কল্যাণ হয়।

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের দিকে দৃষ্টি দিলে আমাদের ধারণা আরো পরিষ্কার হবে।

১.قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
"বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মৃত্যু প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।" (সূরা আনআম : ১৬২)
২.إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
"আমি একমুখী হয়ে স্বীয় লক্ষ্য ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোম-ল ও ভূম-ল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেকদের মধ্যে শামিল নই।" (সূরা আনআম, ৬ : ৭৯)
৩. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (১৭)
"তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না। বরং আল্লাহ্ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক।"
৪. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ.
"(নূহ, হুদ, সালেহ, লূত, শুআইব (আ) জাতির উদ্দেশ্যে বলেন) এ কাজে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমাকে প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব তো রাব্বুল আলামিনের।" (শুআ'রা : ১০৯; ১২৭; ১৪৫, ১৬৪, ১৮০)
৫.إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের চেহারা এবং ধন-সম্পদের দিকে তাকান না। তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও 'আমলসমূহের দিকে। (সহীহ মুসলিম; সুনানু ইবন মাজাহ)
৬.أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ
নুমান ইবন বাশীর রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, জেনে রাখ, নিশ্চয়ই মানুষের শরীরে একটি গোশতের টুকরা আছে- তা বিশুদ্ধ থাকলে গোটা শরীর সুস্থ থাকে। আর তা বিনষ্ট হলে গোটা শরীরই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যায়। জেনে রাখো ঐ গোশতের টুকরাটি হলো মানুষের কলব বা আত্মা। (সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম)
৭. ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ
আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, রাসূল সা. বলেছেন, সে ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্াদ সা.-কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে। (জামি তিরমিজি; সহীহ মুসলিম)
৮.عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.
আবু উমামা আল-বাহলি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে-ই পূর্ণ ঈমানদার। (সুনানু আবি দাউদ)

❖ **সপ্তম আয়াতের ব্যাখ্যা :** وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ "এবং তোমার রবের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করো।"
অত্র আয়াতে সবর সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সবর বা ধৈর্য তিন প্রকার।
১. 'আস-সাবরু আলাল মা'আসী' তথা অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য ধৈর্য।
২. 'আস-সাবরু আলাত ত্বাওয়া' তথা আনুগত্যে ওপর ধৈর্য।
৩. 'আস-সাবরু আলাল মাসিবাহ' তথা বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ। অতএব সকল অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যক।
এ আয়াতটি নবুয়তের একেবারে প্রথম দিকের আয়াত এবং মহান রবের শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা নিয়ে মুহাম্াদ সা. এখনো ময়দানে নামেননি। তাই তিনি এই ঘোষণা নিয়ে ময়দানে নামলে তার সাথে কী কী নেতিবাচক ঘটনা ঘটতে পারে সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্াদ সা.-কে আগেই সবরের শিক্ষা দিয়েছেন।
এ পথে চলতে গিয়ে যে কোন বিপদ-মুসিবতই আসুক না কেন প্রভুর উদ্দেশ্যে সেসব বিপদের মুখে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে এবং অত্যন্ত অটল ও দৃঢ়চিত্ত হয়ে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে।
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা বা প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গেলেই খোদাদ্রোহী শক্তির সাথে বিরোধ হবেই। এ জন্যই সকল নবী বা রাসূলের সাথে সমসাময়িক শাসকদের বিরোধ হয়েছে। আজও যারা বলে আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই। তাদের ওপরও জুলুম নির্যাতন চলে। অতএব এ বাধা, নির্যানত ছিল, আছে এবং থাকবে। এ অবস্থায় ধৈর্যের সাথে সামনে অগ্রসর হতে হবে।
রাসূলুল্লাহ সা. প্রথম অহি প্রাপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে খাদিজা রা.-কে ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি তাঁকে ওয়ারাকা ইবন নওফিলের কাছে নিয়ে গেলে ওয়ারাকা সব কথা শুনেই রাসূল সা.-কে বলেছিলেন, ইনি সে দূত (النَّامُوسُ) যাঁকে আল্লাহ মূসা (আ) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কাওম তোমাকে বের করে দেবে। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তাঁরা কি আমাকে বের করে দিবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা রা. ইন্তেকাল করেন।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও আল-হাদিসে সবরের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। আমরা এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস অধ্যয়ন করতে পারি। (যেমন- সূরা আল-বাকারাহ : ১৫৩; আলে ইমরান : ২০০; আনফাল : ৪৬; সোয়াদ : ১৭; কাফ : ৩৯)

আয়াত সমূহের শিক্ষা

১. আল্লাহর দ্বীনি দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার ভয়-ভীতি কিংবা মনের কষ্টের কারণে ঘরে শুয়ে বসে থাকা যাবে না।
২. রাসূল সা.-এর অনুকরণে আমাদেরকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা দিতে হবে এবং আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
৩. আয়াতে পবিত্রতার শিক্ষা আমাদের পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মুমিন ও দায়ী হিসেবে বাহ্যিক পবিত্রতার পাশাপাশি সকল প্রকার শিরক, কুফর, ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে অন্তর ও চরিত্রকে পবিত্র রাখতে হবে।
৪. আল্লাহর একত্ববাদ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে। বৈষয়িক কোন উদ্দেশ্য এখানে থাকবে না।
৫. পার্থিব বিনিময় পাওয়ার আশায় অন্যকে দান করা যাবে না। কারো কোনো উপকার করলে তার বিনিময়ের আশা করা যাবে না। হাদিয়া বা উপঢৌকন বিনিময় পাওয়ার আশায় দেয়া যাবে না। এমনকি আল্লাহর কোনো বন্দেগি বা নেক কাজ করে কিংবা দ্বীনের কাজ করে মনে করা যাবে না যে আল্লাহর মহা উপকার করলাম। কেননা কোনো নেক কাজ কিংবা দ্বীনের কাজ করে আল্লাহর কোনো উপকার ছয় না যা উপকার বা কল্যাণ হয় তা নিজেরই উপকার যা কল্যাণ হয় মনে করতে হবে।
৬. এ কাজ করতে গিয়ে বাতিলের আক্রোমণ ও বাধার সম্মুখীন হলে চুপ থাকা যাবে না বরং দৃঢ়পদে আরবের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে সবার আঅবলম্বনের মাধ্যমে কনরে চালিয়ে যেতে হবে।

পরিশেষে আমরা সবাই মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে সকল প্রকার বাহ্যিক ও আত্মিক পাপাচার ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে দৃঢ়তার সাথে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে টিকে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

https://www.armansdiary.com/2024/01/Al-Muddassir-darsul-Quran.html

বইঃ রাসূলুল্লাহার (সা:) বিপ্লবী জীবন,
নোট করার মত কিছু নাই, পুরো বই ই পড়তে হবে

ইমানি পরীক্ষা সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত
আল বাকারা: ২১৪

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاۡتِكُمۡ مَّثَلُ الَّذِيۡنَ خَلَوۡا مِنۡ قَبۡلِكُمۡ ؕ مَسَّتۡهُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلۡزِلُوۡا حَتّٰى يَقُوۡلَ الرَّسُوۡلُ وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ مَتٰى نَصۡرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصۡرَ اللّٰهِ قَرِيۡبٌ ﴿۲۱۴﴾

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশত প্রবেশ করবে; যদিও পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অবস্থা এখনো তোমরা প্রাপ্ত হওনি? দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-বালা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। তারা এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে, রসূল ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।

আনকাবুত: ১-৩

الٓمّٓ ﴿۱﴾ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنۡ يُّتۡرَكُوۡۤا اَنۡ يَّقُوۡلُوۡۤا اٰمَنَّا وَ هُمۡ لَا يُفۡتَنُوۡنَ ﴿۲﴾ وَ لَقَدۡ فَتَنَّا الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَلَيَعۡلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ صَدَقُوۡا وَ لَيَعۡلَمَنَّ الۡكٰذِبِيۡنَ ﴿۳﴾

১. আলিফ-লাম-মীম; (২) মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এ কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? (৩) আমি অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।

১টি হাদীস মুখস্ত,
وقال: "إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤناً نكبة من شوكة فما فوق ذلك، إلا حُطت بها عنه خطيئة، ورفع بها درجة".

তিনি আরও বলেন; "নিশ্চয়ই নেককারদের উপর কঠিন বিপদ দেওয়া হয়। আর মুমিন বান্দার উপর কাঁটা বা তার চেয়ে নগণ্য পিরমাণ মত বিপদ আসে, তার প্রতিটির জন্য তার গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।" (তাবারানি, সিলসিলাতুস সাহিহা ১৬১০)

وقال :"إن عظم الجزاء مع عظم البلأ، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط
তিনি আরও বলেন; নিশ্চয়ই বড় প্রতিদান বড় পরীক্ষার সাথেই। আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। অতঃপর যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য থাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিজি, ইবনে মাযাহ, সিলসিলাতুস সাহিহা ১৪৬)

মাসয়ালা: হাজ্ব ও নামাজ সংক্রান্ত।

নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরূহ ও নামাজ ভঙ্গের কারনসমুহ

নামাজের ফরজসমূহ (আরকান ও আহকাম)ঃ

আহকাম ও আরকান মিলিয়ে নামাজের ফরজ মোট ১৩টি। নামাজ শুরু হওয়ার আগে বাইরে যেসব কাজ ফরজ, সেগুলোকে নামাজের আহকাম বলা হয়।

❖ **নামাজের আহকাম ৭টি**। যথাঃ

১. শরীর পাক হওয়াঃ এ জন্য অজুর দরকার হলে অজু বা তায়াম্মুম করতে হবে, গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল বা তায়াম্মুম করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)। (সূরা মায়েদাঃ ৬)

২. কাপড় পাক হওয়াঃ পরনের জামা, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি, শাড়ি ইত্যাদি পাক পবিত্র হওয়া।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর।(সূরা মুদ্দাসসিরঃ ৪)

৩. নামাজের জায়গা পাক হওয়াঃ অর্থাৎ নামাজির দু'পা, দু'হাঁটু,দু'হাত ও সিজদার স্থান পাক হওয়া।

৪. সতর বা শরীর ঢাকাঃ পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের দু'হাতের কব্জি,পদদ্বয় এবং মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ অর্থঃ হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর। (সূরা আরাফঃ৩১)

৫. কিবলামুখী হওয়াঃ কিবলা মানে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও। (সূরা বাকারাঃ ১৫০)

৬. ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ পড়াঃ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ সময়মতো আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا নিশ্চয় সলাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয। (সূরা নিসাঃ১০৩)

৭. নামাজের নিয়্যাত করাঃ নামাজ আদায়ের জন্য সেই ওয়াক্তের নামাজের নিয়্যাত করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ إنما الأعمال بالنية নিশ্চই আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। (বুখারী,হাদিস-১)

নামাজ শুরু করার পর নামাজের ভেতরে যেসব কাজ ফরজ, সেগুলোকে নামাজের আরকান বলা হয়।

নামাজের আরকান ৬টি। যথাঃ

১. তাকবিরে-তাহরিমা বলাঃ অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্বসূচক শব্দ দিয়ে নামাজ আরম্ভ করা। তবে 'আল্লাহু আকবর' বলে নামাজ আরম্ভ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (সূরা মুদ্দাসসিরঃ৩)

২. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াঃ মানে কিয়াম করা। আল্লাহ বলেনঃ حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

তোমরা সলাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে। (সূরা বাকারাঃ ২৩৮)

৩. ক্বেরাত পড়াঃ চার রাকাতনিশিষ্ট ফরজ নামাজের প্রথম দু'রাকাত এবং ওয়াজিব,সুন্নাত,নফল নামাজের সকল রাকাতে ক্বিরাত পড়া ফরজ। আল্লাহ বলেনঃ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। (সূরা মুযাম্মি ল,আয়াতঃ ২০)

৪. রুকু করাঃ প্রতিটি নামাজের প্রত্যেক রাকাতে রুকু করা ফরজ।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

অর্থঃআর তোমরা সলাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর। (সূরা বাকারাঃ৪৩)

৫. সিজদা করাঃ নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সিজদা করা ফরজ।আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۩ অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে। (সূরা হজ্জঃ৭৭)

৬. শেষ বৈঠক করাঃ নামাজের শেষ রাকাতে সিজদার পর তাশহুদ পড়তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় বসা।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ قُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ অর্থঃ "অতঃপর ধীর স্থিরভাবে উঠে বসবে। পরে উঠে দাঁড়াবে। এইরূপ করতে পারলে তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে।

সূত্রঃ বুক অব ইসলামিক নলেজ, লেখকঃ ইকবাল কবীর মোহন

নামাযের ওয়াজিবসমূহঃ

ওয়াজিব অর্থ হলো আবাশ্যক। নামাযের মধ্যে কিছু বিষয় আছে অবশ্য করণীয়। তবে তা ফরজ নয়, আবার সুন্নাতও নয়। যা ভুলক্রমে ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়।আর ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। নিচে ওয়াজিবসমূহ উপস্থাপন করা হলো । রুকন এর পরেই ওয়াজিব এর স্থান, যা আবাশ্যিক। যা ইচ্ছাকৃতভাবে তরক(বাদ) করলে নামায বাতিল হয়ে যায় এবং ভূলক্রমে তরক করলে 'সিজদায়ে সাহু' দিতে হয়।

নামাযের ওয়াজিব মোট ১৪টি। যথাঃ

১. সূরা ফাতিহা পাঠ করাঃ ফরয নামাযের প্রথম দু' রাক'আতে এবং সকল প্রকার নামাযের প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল সব ধরণের নামাযের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। এটাই ইমাম আবু হানিফা (রহতুল্লাহ আলাই) এর অভিমত। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহমতুল্লাহ আলাই)এটাকে ফরয হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর দলিল-

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَا تِحَةِ الْكِتَابِ

" যে নামাযে ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি" (বুখারী)

২. সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোঃ ফরয নামাযসমূহের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে যেকোনো সূরা বা আয়াত মিলিয়ে পড়া কমপক্ষে বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পাঠ করা আবশ্যক।

৩. তারতীব মত নামায আদায় করাঃ তারতীব অনুযায়ী নামায অর্থাৎ নামাযে যে সকল কাজ বারবার আসে ঐ কাজগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা ওয়াজিব। যেমন রুকু, ও সিজদা যা নামাযের প্রতি রাক'আতে বারবার আসে। কিরা'আত পাঠ শেষ করে রুকু' এবং রুকু শেষ করে উঠে সিজদা করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে নামায নষ্ট হবে এবং নতুন করে নামায আদায় করতে হবে।

৪. প্রথম বৈঠকঃ চার রাকা'আত ও তিন রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে দু রাকা'আত শেষ করে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে যতটুকু সময় লাগে, সে পরিমাণ সময় পর্যন্ত বসে থাকা ওয়াজিব।

৫. আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করাঃ নামাযের উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব। আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আত্তাহিয়্যাতু পড়। সুতরাং আলোচ্য হাদীসটিই প্রথম ও শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করে।

৬. প্রকাশ্য কিরা'আত পাঠ করাঃ যে সকল নামাযে প্রকাশ্য বা উচ্চঃস্বরে কিরা'আত পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে সেগুলোতে প্রকাশ্য কিরা'আত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন-ফজর, মাগরিব, ইশা, জুমু'আ' দু'ঈদের নামায ও তারাবীর নামায। অবশ্য একাকী আদায় করলে কিরা'আত উচ্চঃস্বরে পাঠ করা আবশ্যক নয়।

৭. চুপিসারে কিরা'আত পাঠ করাঃ যেমন নামাযে চুপে চুপে কিরা'আত পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে সেসব নামাযে নীরবে বা চুপে চুপে কিরা'আত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন- যোহর ও আসরের নামায।

৮. তা'দীলে আরকান বা ধীরস্থিরভাবে নামায আদায় করাঃ নামাযের সব কাজ ধীরে-সুস্থে করতে হবে। যেমন রুকু' ও সিজদা নিশ্চিত ও প্রশান্ত মনে তাড়াহুড়া না করে ভালোভাবে আস্তে আস্তে আদায় করা ওয়াজিব।

৯. রুকু'থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোঃ অর্থাৎ রুকু' শেষে সিজদা করার পূর্বে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

১০. সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসাঃ দু' সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব।

১১. সালাম বলাঃ নামায শেষে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলে নামায শেষ করা। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাই এর মতে এটি ফরজ।

১২. তারতীব ঠিক রাখাঃ প্রত্যেক রাকা'আতের তারতীব বা ধারাবাহীকতা ঠিক রাখা অর্থাৎ আগের কাজ পেছনে এবং পেছনের কাজ আগে না করা।

১৩. দু'আ কুনুত পাঠ করাঃ বেতরের নামাযে দু'আ কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব।

১৪. ঈদের নামাযে তাকবীরঃ দুই ঈদের নামযে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর বলা ওয়াজিব।

সূত্রঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায, দারুস সালাম বাংলাদেশ

❖ **নামাজের সুন্নাত সমূহঃ**

১। আজান ও ইকামত বলা। (আদ্দুররুল মুখতার মাআ শামী-২/৪৮)
২। তাকবিরে তাহরিমার সময় উভয় হাত উঠানো। (তানভীরুল আবসার মাআ শামী-২/১৮২)
৩। হাত উঠানোর সময় আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক রাখা। (ফাতাওয়া শামী-২/১৭১)
৪। ইমামের জন্য তাকবীর গুলিউচ্চ স্বরে বলা। (হিন্দিয়া-১/১৩০)
৫। সানা পড়া। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭১)
৬। আউযুবিল্লাহ পড়া। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭২)
৭। বিসমিল্লাহ পড়া। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭৪)
৮। অনুচ্চস্বরে আমীন বলা। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭৩)
৯। সানা,আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ,আমীন অনুচ্চস্বরে বলা। (হিন্দিয়া-১৩১)
১০। হাত বাধার সময় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। (হিন্দিয়া-১/১৩১)
১১। পুরুষের জন্য নাভির নিচে,আর মহিলার জন্য বুকের উপর হাত বাঁধা। (হিন্দিয়া-১/১৩০)
১২। এক রোকন থেকে অন্য রোকনে যাবার সময় "আল্লাহু আকবার" বলা। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৮৩-৪৮৯)
১৩। একাকী নামাজ পাঠকারির জন্য রুকু থেকে উঠার সময় "সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা" ও "রব্বানা লাকাল হামদ" বলা। ইমামের জন্য শুধু "সামিয়া'ল্লাহু লিমান হামিদা" বলা আর মুক্তাদির জন্য শুধু "রব্বানা লাকাল হামদ" বলা। (মারাকিল ফালাহ-২৭৮)
১৪। রুকুতে "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" বলা। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭৮)
১৫। সেজদায় বলা "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা"। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৯৪)
১৬। রুকুতে উভয় হাটু আকড়ে ধরা। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৮৭)
১৭। রুকুতে পুরুষের জন্য উভয় হাতের আঙ্গুল ফাঁকা রাখা। আর মহিলার জন্য মিলিয়ে রাখা। (শামী-২/১৭৩)
১৮। পুরুষের জন্য নামজে বসার সময় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা ও ডান পা খাড়া রাখে আঙ্গুলগুলো কেব্লার দিক করে রাখা। আর মহিলার জন্য উভয় পা ডান দিকে বের করে জমিনের উপর বসা। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৪৯৬)
১৯। শেষ বৈঠকে তাশাহ্যুদের পর দুরুদ শরীফ পড়া। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৫০০)
২০। দুরুদের পর দোয়া পড়া। (হিন্দিয়া-১/১৩০)
২১। তাশাহ্যুদে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার সময় শাহাদাত(তর্জনি) আঙ্গুল দ্বারা কেবলার দিকে ইশারা করা। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৫০১-৫০২)

নামাজের মুস্তাহাব সমূহঃ

১। দাঁড়ানো অবস্থায় সেজদার স্থানের দিকে, রুকু অবস্থায় উভয় পায়ের পাতার উপর, সেজদার সময় নাকের দিকে, বৈঠকের সময় কোলের দিকে দৃষ্টি রাখা। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৫০৩)
২। তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় হাত চাদর থেকে বাহিরে বের করে রাখা।
৩। সালাম ফিরানোর সময় উভয় কাঁধের উপর দৃষ্টি রাখা। (মারাকিল ফালাহ-১৫১)
৪। নামাজে মুস্তাহাব পরিমান ক্বেরাত(ফজর ও যোহরে তিওয়ালে মুফাস্যাল,সূরা হুজরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত।আছর ও ইশাতে আওসাতে মুফাস্যাল, সূরা তরেক থেকে বায়্যিনা পর্যন্ত। মাগরীবে কিসারে মুফাস্যাল সূরা যিলযাল থেকে শেষ পর্যন্ত।)পড়া। (ফাতাওয়া শামী-২/২৬১)
৫। জুমআর দিন ফজরের নামাজে প্রথম রাকাতে সূরা আলিফ,লাম,মিম সেজদা ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দাহর পড়া। (ফাতাওয়া শামী-২/২৬৫)
৬। যথা সম্ভব কাঁশি ও ঢেকুর চেপে রাখা। (ফাতাওয়া শামী-২/১৭৬)
৭। হাই আসলে মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা। (ফাতাওয়া শামী-২/১৭৭)

লেখকঃ মুফতি হাফিজ উদ্দীন, জামেয়াতুল আলআসাদ আল-ইসলামিয়া, ঢাকা

❖ **নামাজ মাকরূহ হওয়ার কারণঃ**

১. নামাজরত অবস্থায় কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা মাকরূহ, যদি তা আমলে কাসীর না হয় আর আমলে কাসীর হলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।
২. সেজদার স্থান থেকে কংকর বা পাথরকণা সরানো (মাকরূহ)। অবশ্য সেজদা করা অসম্ভব হলে এক-দুইবার কংকর সরানোর অবকাশ আছে।
৩. আঙ্গুল সমূহকে মলা বা টেনে ফুটানো।
৪. কোমরে হাত রাখাও মাকরূহ।
৫. ডানে-বামে মুখ ফিরানোর দ্বারা যদি সিনা কেবলার দিক থেকে ফিরে যায় তাহলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সিনা কেবলা দিক থেকে না ফিরে, তাহলে নামাজ নষ্ট হবে না; অবশ্য নামাজ মাকরূহ হবে।

৬. উভয় হাটু খাড়া করে হাত মাটিতে রেখে নিতম্ব ও পায়ের উপর কুকুরের ন্যায় বসা।
৭. সেজদায় উভয় বাহুকে মাটিতে বিছিয়ে দেয়া।
৮. হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া।
৯. ফরজ নামাজে বিনা ওজরে আসন করে বসা।
১০. মাটি লেগে যাওয়ার ভয়ে কাপড় হেফাযত করা।
১১. সদলে ছাওব করা অর্থাৎ কাপড় কাঁধে রেখে তার উভয় প্রান্ত একত্র না করে ঝুলিয়ে দেয়া।
১২. হাই তোলা। হাই ও হাচি যথাসম্ভব প্রতিহত করবে। না পারলে সমস্যা নেই।
১৩. শরীরের অলসতা দূর করার জন্য মোচড়ানো।
১৪. চোখ বন্ধ রাখা। অথচ দৃষ্টি সেজদার স্থানে রাখা উচিত।
১৫. চুল মাথার উপর ভাজ করে গিরা দিয়ে নামাজ পড়া। মাথায় চুল থাকলে নামাজের মধ্যে তা ছেড়ে রাখা সুন্নত যাতে চুলও সেজদা করতে পারে।
১৬. খোলা মাথায় নামাজ পড়া মাকরূহ। তবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের নিমিত্তে এরূপ করলে মাকরূহ হবে না।
১৭. আয়াত ও তাসবীহসমূহ হাতে গণনা করা। তবে সাহেবাইন (রহ.)- এর মতে এটা মাকরূহ নয়।
১৮. শুধু ইমাম সাহেব মসজিদের মেহরাবে এবং সমস্ত লোক মেহরাবের বাইরে দাঁড়ানো।
১৯. ইমাম সাহেব একা উঁচু স্থানে এবং সমস্ত লোক নিচে দাঁড়ানো।
২০. কাতারে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পিছনে একা দাঁড়ানো। তবে যদি সুযোগ না থাকে তাহলে (সামনের কাতার থেকে মাসআলা জানে এমন একজনকে টেনে এনে নিজের সাথে দাড় করাবে। তার পরও চেষ্টা করবেন একা শুধু কাতারে না দাঁড়াতে।
২১. মানুষ অথবা জন্তুর ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা।
২২. সামনে, বামে অথবা ডানে ছবি থাকাবস্থায় নামাজ মাকরূহ। তবে যদি ছবি পায়ের নিচে কিংবা পিছনে থাকে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

❖ নামায ভঙ্গের কারণসমূহঃ

নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যেমন কিছু শর্ত রয়েছে, তেমনিভাবে নষ্ট হওয়ার জন্যও কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। নিম্নোক্ত কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। যথাঃ

১. সালামের জবাব দিলে : নামাযরত অবস্থায় কারো সালামের জবাব দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সালাম যিকিরের পর্যায়ভুক্ত নয়।
২. নামাযের মধ্যে সালাম দিলে : ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক নামাযের মধ্যে সালাম দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।
৩. দুঃখসূচক শব্দ উচ্চারণ করা : নামাযের মধ্যে কেউ দুঃখসূচক শব্দ যেমন-আহ, উহ, হায় ইত্যাদি উচ্চস্বরে বললে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।
৪. নামাযের ফরয ছুটে গেলেঃ নামাযের মধ্যে যেসব কাজ করা ফরয তন্মধ্যে কোনো একটি ফরয ছুটে গেলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।
৫. কিরা'আতে ভুল করলে : নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতে যদি এমন ভুল করে যে ভুলের কারণে আয়াতের মর্মার্থ ওলট পালট হয়ে যায়, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।
৬. নামাযে কিরা আত দেখে দেখে পড়া : নামাযরত ব্যক্তি যদি কুরআন শরীফ দেখে দেখে পাঠ করে, তবে তার নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।
৭. নামাযের মধ্যে কথা বলাঃ নামায়ী ব্যক্তি যদি নামাযের মধ্যে কথা বলে, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।
عن زيدِ بْنِ أَرْقَمَ، قال: " كنَّا نتكلمُ فِي الصّلاةِ يُكَلِّمُ الرّجُلُ صَاحِبَهَ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصّلاةِ حَتّى نَزَلَتْ { وَقُوْمُوْا لِلهِ قَانِتِيْنَ } فأُمِرْنا بالسَّكُوْتِ, ونهينا عَنِ الْكَلَامِ
"যায়েদ ইবনে আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (এক সময়) আমরা নামাযের মধ্যে কথা বলতাম। মুসল্লী নামাযের মধ্যে তার পার্শ্ববর্তী সাথীর সাথে কথা বলত। অতঃপর যখন কুরআনের বাণী "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।" حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ (সূরা বাকারাঃ২৩৮)
অবতীর্ণ হয়, তখন আমাদেরকে নীরবতা পালনের নির্দেশ দেয়া হয় এবং কথা বলতে নিষেধ করা হয়।"
৮. নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়লে : মাদকাসক্ত মাতাল অবস্থায় নামায আদায় করলে তা আদায় হবে না। কেননা, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন لا تقربوا الصلوة وانتم سكرى "‡ তামরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ে না।" (সূরা নিসা,আয়াতঃ ৪৩)
৯. ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে : নামাযের মধ্যে নির্ধারিত ১৪টি ওয়াজিবের কোন একটি ওয়াজিব যদি নামাযী ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিলে নামায শুদ্ধ হবে। কিন্তু সাহু সিজদা না দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। পুনরায় আদায় করতে হবে।
১০. অট্টহাসি দিলে : নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দিলে শুধু নামাযই নয়, অজুও নষ্ট হয়ে যাবে।
১১. অপ্রাসঙ্গিক কিছু করা : কোনা দুঃসংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহ সুসংবাদ শুনে আল-হামদুলিল্লাহ' এবং বিক্রয়ের সংবাদ শুনে "সুবহানাল্লাহ' বললে নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে।
১২. অন্য দিকে ঘুরে গেলেঃ নামাযের মধ্যে কিবলার দিক থেকে অন্য দিকে ফিরে গেলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।
১৩. বাচ্চাকে দুধ পান করালে : নামাযরত স্ত্রীলোকের দুধ যদি তার সন্তান এসে খায়, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১৪. হাঁচির জবাব দেয়া : নামাযের মধ্যে যদি কেউ অন্যের হাঁচি শুনে ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে হাঁচির জবাব দেয়, তবে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।
১৫. চলাফেরা করলে : নামাযের মধ্যে চলাফেরা করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, প্রয়োজনে সম্মুখে বা পেছনে যাওয়া যাবে।
১৬. অপবিত্র স্থানে সিজদা করলে : অপবিত্র স্থানে সিজদা করলে নামায নষ্ট হয়ে
১৭. আমলে কাসীর হলে : নামাযের মধ্যে যদি কেউ আমলে কাসীর করে তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আমলে কাসীর হলো নামাযের মধ্যে এমন আমল করা যা দূর থেকে দেখলে মনে হয় যে, লোকটি নামায আদায় করছে না।
১৮. নিজের ইমাম ছাড়া অন্যকে লোকমা দেয়া : যদি কেউ নামাযের মধ্যে নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে লোকমা দেয়, অথবা ইমাম যদি মুক্তাদি ব্যতীত অন্য কারো লোকমা নেয় অথবা ইমাম যদি জামাত বহির্ভূত অন্য কারো ভুল সংশোধন গ্রহণ করে তবে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১৯. নামাজে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলাঃ এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছেঃ
عنْ مُعَا وِيةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِى. قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ هذه الصلاة لا يصلُحُ فيها شيْءٌ من كلامِ النَّاسِ , إِنّما هو التسبيح و التكبير وقراءةُ القران.
"হযরত মুয়াবিয়া বিন হাকাম সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নামাযে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তিগত কথা বলা চলবে না বরং নামায তিলাওয়াতের সমষ্টি মাত্র।" (মুসলিমঃ ৫৩৭)

২০. নামাযে কাতার সোজা না করে নামায পড়া, এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছ
عن أبي مسعود، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصّلاة، ويقول: أستووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم.
হযরত আবু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ানোর সময় আমাদের কাঁধগুলো স্পর্শ করে বলতেন: তোমরা সবাই নামাযের কাতারে একদম সোজা হয়ে দাড়াও । একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো দাড়িও না, তা হলে তোমাদের অন্তরগুলোর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। (মুসলিম,হাদিসঃ ৪৩২)

২১. বিনা অজুতে নামায পড়া, এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছেঃ
عن أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة أحد كم إذا أحدث حتى يتوضّأ.
হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কারো অজু না থাকা সত্ত্বেও অজু না করে নামায পড়লে তার নামায কবুল হবে না। (মুসলিম,হাদিসঃ ২২৫)
২২. অন্যান্য : কোনো পত্র বা লেখার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তা মুখে উচ্চারণ করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।
২৩. তিন তাসবীহ পাঠ পরিমাণ সময় সতর খুলে থাকা ।
২৪. নামাযে খাওয়া বা পান করা ।

সূত্রঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামু এর নামায,দারুস সালাল বাংলাদেশ।

হজ্বের সংক্ষিপ্ত নিয়ম ও জরুরি মাসায়িল

মাওলানা মুহম্মাদ ইয়াহইয়া

হজ্ব তিন প্রকার

এক. তামাত্তু হজ্ব

মীকাত অতিক্রমের পূর্বে শুধু উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কা মুকাররামায় পৌঁছে উমরার কাজ সম্পাদন করে চুল কেটে ইহরামমুক্ত হয়ে যাওয়া। অতঃপর এই সফরেই ৮ যিলহজ্ব হজ্বের ইহরাম বেঁধে হজ্বকার্য সম্পাদন করা।

দুই. ইফরাদ

মীকাত অতিক্রমের পূর্বে শুধু হজ্বের নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কা মুকাররামা পৌঁছে (উমরা না করা বরং তাওয়াফে কুদুম করে মুস্তাহাব তাওয়াফ করা) ইহরাম অবস্থায় হজ্বের জন্য অপেক্ষা করতে থাকা।

তিন. কিরান

মীকাত অতিক্রমের পূর্বে একই সাথে উমরা ও হজ্বের নিয়তে ইহরাম বেঁধে এই ইহরামে উমরাহ ও হজ্ব উভয়টি পালন করা। মক্কা মুকাররামা পৌঁছে প্রথমে উমরা করা অতঃপর এই ইহরাম অবস্থাতেই হজ্বের জন্য অপেক্ষা করতে থাকা এবং হজ্বের সময়ে হজ্ব করা।

ইহরাম বাঁধার নিয়ম

হজ্ব অথবা উমরার নিয়তে তালবিয়া পড়লেই ইহরাম সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে এর সুন্নাত তরীকা হল :

* মোচ, নখ এবং শরীরের পরিষ্কারযোগ্য লোম চেঁছে বা কেটে পরিষ্কার করা।
* ইহরামের উদ্দেশ্যে উত্তমরূপে গোসল করা। গোসল সম্ভব না হলে ওযু করে নেওয়া। ঋতুমতী মহিলার জন্য ইহরামের আগে গোসল করা মুস্তাহাব -গুনয়াতুন নাসেক পৃ. ৬৯

* পুরুষগণ দুটি নতুন বা ধৌত সাদা চাদর নিবে। একটি লুঙ্গির মতো করে পরবে। অপরটি চাদর হিসাবে ব্যবহার করবে। কালো বা অন্য কোনো শরীয়তসিদ্ধ রং এর কাপড় পরিধান করাও জায়েয। পায়ের পাতার উপরের উঁচু অংশ খোলা থাকে এমন চপ্পল বা স্যান্ডেল পরা যাবে। মহিলাগণ স্বাভাবিক কাপড় পরবে। তারা ইহরাম অবস্থায় জুতা মোজা ব্যবহার করতে পারবে।

* ইহরাম বাঁধার আগে খালি শরীরে আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। শরীরের আতর ও ঘ্রান ইহরাম বাধারর পরে বাকী থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। আর ইহরামের কাপড়ে আতর/সুগন্ধি লাগাবেনা। কেননা ইহরামের কাপড়ে এভাবে আতর বা সুগন্ধি লাগানো নিষিদ্ধ যা ইহরামের পরও লেগে থাকে। -রদ্দুল মুহতার ২/৪৮৯ গুনাতুন নাসেক পৃ. ৭০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২২ মানাসিক মোল্লা আলী কারী পৃ. ৯৮

(মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে) ইহরাম বাঁধার পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়া ভালো।-গুনয়াতুননাসেক ৭৩, মানাসিক মোল্লা আলী কারী পৃ. ৯৯, রদ্দুল মুহতার ২/৪৮২

* নিয়ত : (পুরুষ হলে টুপি বা মাথার কাপড় খুলে ফেলতে হবে) তামাত্তুকারী শুধু উমরার নিয়ত করবে, ইফরাদকারী শুধু হজ্বের নিয়ত এবং কিরানকারী হজ্ব ও উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পড়বে। পুরুষ উচ্চ স্বরে তালবিয়া পড়বে আর মহিলা নিম্নস্বরে পড়বে।
তালবিয়া হল – لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. -মানাসিক পৃ. ১০০, গুনয়াতুন্নাসেক পৃ. ৭৪, আদ্দুররুল মুখতার পৃ. ৪৮৪

মাসআলা : তালবিয়া পূর্ণ পড়তে হবে। তালবিয়ার এই দুআর অল্প কিছু ছেড়ে দেওয়াও মাকরূহ।-মানাসিক পৃ. ১০২, আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১২৩,
মাসআলা : তালবিয়ার উক্ত দুআর স্থলে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, কালিমা তাইয়্যিবা বা আল্লাহ তাআলার কোনো জিকির পড়লেও ইহরাম সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু তালবিয়া ছাড়া অন্য কিছু পড়া মাকরুহ তাই তালবিয়া পড়া সম্ভব না হলে আল্লাহ তাআলার যে কোনো জিকির পড়ে ইহরাম বাঁধতে পারবে। -মানাসিক ১০২, গুনয়াতুননাসিক ৭৬, আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮৩

মাসআলা : মহিলাগণ ইহরাম অবস্থায় হাত-মোজা ও পা-মোজা ব্যবহার করতে পারবে। তবে হাত মোজার ব্যাপারে দু'ধরনের দলীল বিদ্যমান থাকায় কেউ কেউ হাতমোজা পরিধান না করাকে উত্তম বলেছেন। -আল ইসতিযকার ১১/৩০, সূনানে আবু দাউদ ২/২৫৪ আত্তারগীব ওয়াত তারহীব ৪/৪৭৭, মীযানুল ইতিদাল ৩/৪৫, ইলাউস সুনান ১০/৪৮ আলবাহরুর রায়েক ২/২২৩, বাদায়ে ২/৪১০, ফাতহুল মুলহিম ৩/২০৪, মানাসিক ১১৬, গুনাতুল নাসিক -৭৪, খানিয়া -১/২৮৪, আহকামে হজ্ব ৩৫

মাসআলা : মহিলাগণ ওযর অবস্থায় অর্থাৎ মাসিক ঋতুস্রাব, সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব ইত্যাদি থাকলেও ইহরাম বাঁধতে ও তালবিয়া পড়তে পারবে। হজ্বের অন্যান্য কাজও করতে পারবে তবে এ অবস্থায় তাওয়াফ করা, নামায পড়া জায়েয নয়।

মাসআলা : ইহরাম অবস্থায়ও মহিলাদের জন্য পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা নিষিদ্ধ। তাই এ অবস্থায় চেহারার সাথে কাপড় লেগে না থাকে এভাবে চেহারার পর্দা করা জরুরি। এখন এক ধরনের ক্যাপ পাওয়া যায়, যা পরিধান করে সহজেই চেহারার পর্দা করা যায়। -আদিল্লাতুল হেজাব ৩২৯-৩৩৪; নাইলুল আওতার ৫/৭১ মানাসিক ১১৫, ফাতহুল বারী ৩/৪৭৫; এলামুল মুআককিয়ীন ১/১২২-১২৩, হজ্বের মাস শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ শাওয়াল মাসের আগে হজ্বের ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। -গুনয়াতুন্নাসেক -৬৭
মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় ইহরামের পোশাক পরিবর্তন করা যাবে। -শরহু লুবাবিল মানাসিক ৯৮
মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাকে অন্যান্য মৃতের মতোই গোসল ইত্যাদি দিবে এবং স্বাভাবিক মৃতের মতোই অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করবে।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়

১। পুরুষের জন্য শরীরের কোনো অঙ্গের আকৃতি বা গঠন অনুযায়ী তৈরিকৃত বা সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ। যেমন : পাঞ্জাবি, জুব্বা, শার্ট, সেলোয়ার, প্যান্ট, গেঞ্জি, কোর্ট, সোয়েটার, জাঙ্গিয়া।
মাসআলা : ইহরামের কাপড় ছিঁড়ে গেলে তা সেলাই করে কিংবা জোড়া দিয়ে পরিধান করা যাবে। তবে ইহরামের কাপড় এ ধরনের সেলাইমুক্ত হওয়াই ভালো। -রদ্দুল মুহতার ২/৪৮১, শরহু লুবাবিল মানাসিক ৯৮
মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত ব্যাগ ব্যবহার করা ও বেল্ট বাঁধা নিষিদ্ধ নয়।

২। পুরুষের জন্য মাথা ও চেহারা ঢাকা নিষিদ্ধ। মহিলাদের জন্য শুধু চেহারায় কাপড় স্পর্শ করানো নিষেধ। তাই তারা পরপুরুষের সামনে চেহারায় কাপড় লেগে না থাকে এভাবে পর্দা করবে।
৩। পুরুষের জন্য পায়ের উপরের অংশের উঁচু হাড় ঢেকে যায় এমন জুতা পরিধান করা নিষেধ। এমন জুতা বা স্যান্ডেল করতে হবে যা পরলে ওই উচু অংশ খোলা থাকে। -রদ্দুল মুহতার ২/৪৯০
৪। ইহরামের কাপড় বা শরীরে আতর বা সুগন্ধি লাগানো নিষেধ। সুগন্ধিযুক্ত তেল যয়তূন ও তিলের তেলও লাগানো যাবে না। সুগন্ধি সাবান, পাউডার, স্নো, ক্রীম ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি পৃথকভাবে সুগন্ধি জর্দা খাওয়াও নিষিদ্ধ। পানের সাথে খাওয়া মাকরূহ। ইচ্ছাকৃতভাবে ফল-ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া মাকরূহ। -মানাসিক ১২১; আহকামে হজ্ব ৩৪; আহকামে হজ্ব ৩৪
৫। শরীরের কোনো স্থানের চুল, পশম বা নখ কাটা বা উপড়ানো নিষিদ্ধ।
৬। ইহরাম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করা বা স্ত্রীর সামনে এ সংক্রান্ত কোনো কথা বা কাজ করা নিষিদ্ধ।
৭। কোনো বন্য পশু শিকার করা বা কোনো শিকারীকে সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ।
৮। ঝগড়া-বিবাদ সাধারণ সময়েও নিষিদ্ধ। ইহরাম অবস্থায় এর গুনাহ আরো বেশি।
৯। কাপড় বা শরীরের উকূন মারা নিষিদ্ধ। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮৬-৪৯০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৪, মানাসিক ১১৭-১২০, গুনয়াতুননাসেক ৮৫।
মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় যে কাজগুলো নিষিদ্ধ তাতে লিপ্ত হওয়া গুনাহ। এর কারণে হজ্ব কিছুটা অসম্পূর্ণ হয়ে যায় আর কিছু নিষেধাজ্ঞা এমন রয়েছে যেগুলো করলে 'দম' ওয়াজিব হয়। আর আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলে হজ্বই নষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে গরু বা উট যবেহ করা ছাড়া পরবর্তী বছর কাযা করা জরুরি। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৫৮-৫৫৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৪৪, মানাসিক ১১৭
মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় মাথা ও মুখ ব্যতীত পূর্ণ শরীর চাদর ইত্যাদি দিয়ে আবৃত করা যাবে। কান, ঘাড়, পা ঢাকা যাবে। মাথা ও গাল বালিশে রেখে শোয়া যাবে। তবে পুরো মুখ বালিশের উপর রেখে ঢেকে শোয়া যাবে না। -মানাসিক ১২৩-১২৪, গুনয়াতুননাসেক ৯৩
মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় পান খাওয়া নিষিদ্ধ নয়। তবে পানে সুগন্ধিযুক্ত মসলা বা জর্দা খাওয়া নিষিদ্ধ।
মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় পানিতে ডুব দেওয়া যাবে। -গুনয়াতুনন্নাসেক ৯১

উমরার পদ্ধতি

উমরার ফরয দুটি

১। উমরার ইহরাম বাঁধা। অর্থাৎ উমরার নিয়তে তালবিয়া পড়া।
২। বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করা ।

উমরার ওয়াজিব দুটি

১। সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করা।
২। মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছাঁটা।

মাসআলা : উমরার তাওয়াফে পুরুষের জন্য 'ইজতিবা' অর্থাৎ ডান কাঁধ খালি রেখে চাদর বগলের নিচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের উপর রাখা এবং 'রমল' অর্থাৎ তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে কিছুটা দ্রুত বীরদর্পে হাঁটা।

উমরার তাওয়াফ

মাসআলা : যে তাওয়াফের পর সায়ী আছে সেই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল অর্থাৎ বীরদর্পে কাঁধ হেলিয়ে কিছুটা দ্রুত বেগে চলা সুন্নত। তদ্রূপ পুরো তাওয়াফে ইজতেবা (ডান কাঁধ খালি করে ডান বগলের নিচে দিয়ে বের করে বাম কাঁধের উপর দিয়ে চাদর পরিধান) করা সুন্নতে মুআক্কাদাহ। তবে এ দু'টি শুধু পুরুষদের জন্য সুন্নত। মহিলাদের জন্য নয়। -মানাসিক ১২৯, আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৯৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৫
মাসআলা : তাওয়াফকারীর সীনা বাইতুল্লাহ দিকে করে তাওয়াফ করা যাবে না। এমনকি রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার সময় কিংবা হাজরে আসওয়াদ চুমু দেওয়ার সময় সীনা বাইতুল্লাহর দিকে ঘুরে গেলে যেখান থেকে ঘুরেছে সেখান থেকেই সীনা ঠিক করে আবার তাওয়াফ শুরু করা জরুরি। -মানাসিক ১৫৩, গুন্য়াতুন নাসিক ১১৩, রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৪
মাসআলা : সকল তাওয়াফের পর দুই রাকাত নফল নামায পড়া ওয়াজিব। চাই তাওয়াফ নফল হোক বা ফরয। আর এই দুই রাকাত মাকামে ইব্রাহীমীর পিছনে পড়া ভালো। কিন্তু জায়গার সংকুলান না হলে মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে পড়া যাবে। এমনকি হেরেমের সীমানার ভিতর পড়লেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। হেরেমের বাইরে পড়া মাকরূহ। তবে পড়লে আদায় হবে যাবে। দম ওয়াজিব হবে না। -মানাসিক ১৫৫, আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৯৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৬, গুনয়াতুননাসেক ১১৬
মাসআলা : তাওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাত নামায তাওয়াফের পরেই অবিলম্বে আদায় করা উত্তম। বিনা ওজরে বিলম্বে পড়া মাকরূহ। তবে মাকরূহ ওয়াক্ত হলে পরে পড়বে। -রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৯, মানাসিক ১৫৫, গুনয়াতুননাসেক ১১৬
মাসআলা : একাধিক তাওয়াফ করে পরবর্তী দুই রাকাত নামাযকে একত্রে পড়া মাকরূহ। তবে পূর্বের তাওয়াফের পরের সময় যদি মাকরূহ ওয়াক্ত হয়ে থাকে তবে একাধিক তাওয়াফের নামায একত্রে আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই। -গুনয়াতুনাসেক ১১৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৭

হজ্বের পদ্ধতি

হজ্বের ফরয তিনটি :

১। ইহরাম বাঁধা

২। উকূফে আরাফা। অর্থাৎ ৯ যিলহজ্ব সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে পরবর্তি রাতের সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পূর্বে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।

৩। তাওয়াফে যিয়ারত। ১০ যিলহজ্ব থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগেই এ তাওয়াফ সম্পন্ন করা।

হজ্বের ওয়াজিবসমূহ এই-

১। উকূফে মুযদালিফা। ১০ যিলহজ্ব সোবহে সাদিকের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের ভিতর স্বল্প সময় মুযদালিফায় অবস্থান করলে এ ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

২। সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করা।

এ সায়ী তাওয়াফে যিয়ারতের পরও করা যায়। আবার ৮ যিলহজ্বের আগেও নফল তওয়াফের পর আদায় করা যায়। ইফরাদ হজ্ব আদায়কারীগণ মক্কা প্রবেশের পর যে 'তাওয়াফে কুদুম' করে থাকে এরপর হজ্বের ওয়াজিব সায়ী করে নিতে পারে।

৩। নির্দিষ্ট দিনগুলোতে জামরাতে রমী তথা কংকর নিক্ষেপ করা।

৪। তামাত্তু ও কিরান হজ্ব আদায়কারীর জন্য দমে শুকর তথা হজ্বের কুরবানী।

৫। মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছাটা।

৬। মীকাতের বাহির থেকে আগত লোকদের জন্য 'তাওয়াফে বিদা' করা।

নিম্নে ৮ যিলহজ্ব থেকে ১২ যিলহজ্ব পর্যন্ত ৫ দিন হজ্বের আমলগুলোর কর্মপদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট মাসায়িল আলোচনা করা হচ্ছে :

প্রথম দিন ৮ যিলহজ্ব

আজ সূর্যোদয়ের পর সকল হাজীকে ইহরাম অবস্থায় মিনা গমন করতে হবে। যোহর থেকে পরবর্তী দিনের ফজর পর্যন্ত মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনায় পড়া এবং ৮ তারিখ দিবাগত রাত্রি মিনায় অবস্থান করা সুন্নত। -রদ্দুল মুহতার ২/৫০৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৭

হজ্বের ইহরাম

ইফরাদ হজ্ব ও কিরান হজ্ব আদায়কারী হজ্বের ইহরাম পূর্ব থেকেই করে থাকে। তামাত্তু হজ্ব আদায়কারী আজ মিনায় যাওয়ার পূর্বে হজ্বের ইহরাম বাঁধবে।

হজ্বের ইহরাম বাঁধার স্থান

মাসআলা : হজ্বের ইহরাম বাঁধার জন্য পুরুষ-মহিলা কারো জন্যই মসজিদে হারামে যাওয়া জরুরি নয়। মহিলাগণ নিজ নিজ অবস্থান স্থল থেকেই ইহরাম বাঁধবে। পুরুষরাও হোটেল বা আবাস-স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে পারে। তবে পুরুষগণ সম্ভব হলে মসজিদে হারামে এসে নিয়ম অনুযায়ী ইহরাম বাঁধা ভালো।

মাসআলা : হজ্বের ইহরামের পর থেকে ১০ তারিখ জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পুর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবে। কংকর নিক্ষেপের পর থেকে তালবিয়অ বন্ধ হয়ে যাবে। -মানাসিক ২২৫, গুনয়াতুননাসেক ১৭০

মাসআলা : মিনায় অবস্থান না করা

৮ তারিখ দিবাগত রাতে যদি কেউ মিনায় অবস্থান না করে কিংবা এ তারিখে মোটেই মিনায় না যায় তাহলেও তার হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। তবে মাকরূহ হবে। -মানাসিক ১৮৮-১৮৯, আহকামে হজ্ব ৬২

মাসআলা : তাবু মিনার বাইরে হলে

মিনায় জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে মিনার এলাকার বাইরে বহু তাবু লাগানো হয়। যেহেতু এটি জায়গা সংকীর্ণতার ওজরে করা হয়ে থাকে তাই আশা করা যায়, এ সকল তাবুতে অবস্থানকারীগণও মিনায় অবস্থানের ফযীলত পেয়ে যাবে। তবে যারা তাবুর বাইরে মিনার এলাকায় গিয়ে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করতে পারে তাদের জন্য সেখানে অবস্থান করাই ভালো হবে।

মাসআলা : নির্ধারিত সময়ের আগেই মিনায় রওয়ানা

মিনায় রওয়ানা হওয়ার সময় হল ৮ তারিখ সূর্যোদয়ের পর। কিন্তু আজকাল ৭ তারিখ দিবাগত রাতেই মুআল্লিমের গাড়ি রওয়ানা হয়ে যায় এবং রাতে রাতেই মিনায় পৌঁছে যায়। যদিও ৮ তারিখ সূর্যোদয়ের পর রওয়ানা হওয়া নিয়ম এবং এটিই ভালো, কিন্তু অধিক ভিড়ের কারণে আগে আগে চলে যাওয়া দোষণীয় নয়। -মানাসিক ১৮৮, গুনয়াতুনন্নাসেক ১৪৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৭

মাসআলা : ৯-১৩ যিলহজ্ব পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। তাই প্রত্যেক হাজীকে এ বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।

দ্বিতীয় দিন ৯ যিলহজ্ব

উকূফে আরাফা

আজ হজ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন আদায়ের দিন। ৯ যিলহজ্ব সূর্য ঢলার পর থেকে পরবর্তী রাতের সুবহে সাদিকের মধ্যে যেকোনো স্বল্প সময় আরাফার ময়দানে উপস্থিত থাকলেই এই ফরয আদায় হয়ে যায়। তবে এ দিন সূর্যাস্তের আগে আরাফায় পৌঁছলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। -গুনয়াতুন্নাসেক ১৫৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৯; আহকামে হজ্ব ৬৩

আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

৯ তারিখ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়া উত্তম। -রদ্দুল মুহতার ২/৫০৩; গুনয়াতুন্নাসেক ১৪৬-১৪৭

সূর্যোদয়ের পূর্বে আরাফায় যাওয়া

ভিড়ের কারণে বহু লোক ৮ তারিখ রাতেই আরাফায় চলে যায়। মুআল্লিমের গাড়িগুলোও রাত থেকেই হাজী সাহেবদেরকে আরাফার পৌঁছাতে শুরু করে। রাতে চলে গেলে একাধিক সুন্নাতের খেলাফ হয়। এক. রাতে মিনায় থাকা সুন্নত। এটি আদায় হয় না।

দুই. ৯ তারিখ ফজর নামায মিনায় পড়া সুন্নত। এটাও ছুটে যায়।

তিন. সূর্যোদয়ের পর আরাফার উদ্দেশে রওনা হওয়া মুস্তাহাব। সেটাও আদায় হয় না। তাই সাধ্য মতো চেষ্টা করা চাই যেন বাসগুলো অন্তত ফজরের পর ছাড়ে। যদি মানানো সম্ভব না হয় তাহলে বৃদ্ধ ও মহিলারা মাহরামসহ আগে চলে যাবেন। আর সুস্থ সবল হাজীগণ মিনায় ফজরের নামায পড়ে আরাফার পথে রওয়ানা হবেন। মিনায় ফজর পড়ে হেঁটে গেলেও সুন্দরভাবে দুপুরের আগেই আরাফায় পৌঁছা যায়। গাড়িতে গেলে জ্যামের কারণে একটু বিলম্ব হলেও আরাফায় পৌঁছা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে অনেক সময় একেবারে তাঁবুর নিকটে পৌঁছা যায় না। কিছুটা আগে নেমে যেতে হয়। তাই মাযূর হাজীগণ রাতেও যেতে পারবেন। আর যারা সুস্থ সবল আছেন, হাঁটতে তেমন সমস্যা হয় না তারা ফজরের পরই রওয়ানা হবেন। -রদ্দুল মুহতার -২/৫০৩

আরাফায় কসর করবে না পূর্ণ নামায পড়বে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে আরাফার ময়দানে মুকীম হাজীগণ যোহর-আসর পূর্ণ চার রাকাতই পড়বে। হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তও এমনই। তাই নিজ নিজ তাবুতে পড়লে মুকীম হাজীগণ পূর্ণ নামায পড়বেন, কসর করবেন না। -রদ্দুল মুহতার ২/৫০৫ গুনয়াতুন্নাসেক ১৫১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া -১/২২৮, ২/৫০৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৯

যোহর ও আসর একত্রে পড়া

মসজিদে নামিরার জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারলে যোহর ও আসর একত্রে ইমামের পিছনে আদায় করে নিবে। কিন্তু মসজিদে নামিরার জামাতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব না হলে জোহরের সময় যোহর এবং আসরের সময় আসর পড়বে। একত্রে পড়লে সময়ের আগে পড়া নামায আদায় হবে না।

উকূফে আরাফার করণীয়

উত্তম হল, কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে একেবারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুআ করা। এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে না পারলে অল্প সময় বসবে। এরপর আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুআ মুনাজাতে লেগে যাবে। -আদ্দুররুল মুখতার আহকামে হজ্ব ৬৫

সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা থেকে বেরিয়ে যাওয়া

অনেকে সূর্যাস্তের আগেই মুযদালিফায় রওনা হয়ে যায়। এরূপ হয়ে গেলে কর্তব্য হল পুনরায় আরাফায় ফিরে যাওয়া। যদি ফিরে না যায় তবে দম দিতে হবে। -খ. মানাসিক ২১০ গুনয়াতুনন্নাসেক ১৬০; রদ্দুল মুহতার ২/৫৫২

৯ তারিখ সূর্যাস্তের আগে আরাফায় পৌঁছতে না পারলে

কেউ যদি ৯ তারিখ সূর্যাস্তের আগে আরাফার ময়দানে কোনো কারণে পৌঁছতে না পারে তবে সে সুবহে সাদেক হওয়ার আগে কিছু সময়ের জন্য আরাফায় অবস্থান করলেও তার ফরয আদায় হবে যাবে। আর এ কারণে দম বা অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে যথা সময় আরাফায় না পৌছার ত্রুটি থেকে যায়। -মানাসিক ২০৫-২০৬, গুনয়াতুন্নাসেক ১৫৯

আরাফায় জুমআ

আরাফার ময়দানে জুমআ পড়া জায়েয নয়। তাই এদিন শুক্রবার হলে হাজীগণ যোহর পড়বে, জুমআ নয়। - মানাসিক ১৯৬
মাসআলা : মসজিদে নামিরার পশ্চিমের কিছু অংশসহ 'বাতনে উরানা' নামক স্থান রয়েছে। এখানে উকূফ গ্রহণযোগ্য নয়। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৫০৪

মুযদালিফায় রওয়ানা
আরাফার ময়দান থেকে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায না পড়েই মুযদালিফার উদ্দেশে রওয়ানা হবে। সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার উদ্দেশে রওনা হতে বিলম্ব না করাই শ্রেয়। -রদ্দুল মুহতার ২/৫০৮

৯ তারিখ দিবাগত রাত্রির মাগরিব ও ইশা
আজকের মাগরিব ও ইশা ইশার ওয়াক্তে মুযদালিফায় গিয়ে পড়তে হবে। যদি কেউ মুযদালিফায় পৌঁছার আগেই রাস্তায় মাগরিব ইশা পড়ে নেয় কিংবা মুযদালিফায় পৌঁছার আগে শুধু মাগরিব পড়ে তবে ইভয় ক্ষেত্রে মুযদালিফায় পৌঁছে আবার মাগরিব ইশা একত্রে পড়া জরুরি। - মানাসিক ২১৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩০, গুনয়াতুন্নাসেক ১৬৪

মাসআলা : মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা এক আযান ও এক ইকামতে পড়া উত্তম। পৃথক পৃথক ইকামতও জায়েয। --মানাসিক ২১৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩০; রদ্দুল মুহতার ২/৫০৮
মুযদালিফায় গিয়ে ইশার ওয়াক্ত না থাকলে বিলম্বের কারণে মুযদালিফায় পৌঁছার আগেই ইশার ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে পথিমধ্যে মাগরিব ইশা পড়ে নিবে। এক্ষেত্রে মুযদালিফায় পৌঁছার পর ইশার ওয়াক্ত বাকী না থাকলে মাগরিব ইশা দোহরাতে হবে না। কিন্তু যদি সেখানে গিয়ে মাগরিব-ইশা পড়ার সময় বাকী থাকে তবে এ দুই নামায পুনরায় পড়তে হবে। -তাবয়ীনুল হাকায়েক ২/২৮, আলবাহরুর রায়েক ২/৩৪২, আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৪০৪, তাতারখানিয়া ২/৪৫৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩০; গুনয়াতুন্নাসেক ১৬৪

ইশার ওয়াক্তের পূর্বেই মুযদালিফা পৌঁছে গেলে
যদি কেউ ইশার ওয়াক্তের পূর্বে মুযদালিফায় পৌঁছে যায় তবে সে তখন মাগরিব পড়বে না; বরং ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পর মাগরিব-ইশা আদায় করবে। -মানাসিক ২১৮
মাসআলা : মুযদালিফায় দুই নামায একত্রে পড়ার জন্য জামাত শর্ত নয়। একা পড়লেও দুই নামায একত্রে ইশার সময় পড়বে। তবে নিজেরা জামাত করে পড়া ভালো। -মানাসিক ২১৪, গুনয়াতুন্নাসেক ১৬৩-১৬৪
মাসআলা : কেউ যদি দুই নামাযের মাঝে নফল বা সুন্নাত নামায কিংবা অন্য কোন কাজে বিলম্ব করে। যেমন : খানা-খাওয়া ইত্যাদি তবে ইশার জন্য ভিন্ন ইকামত দেওয়া উচিত। -মানাসিক ২১৯

৩য় দিন ১০ যিলহজ্ব

উকূফে মুযদালিফা
উকূফে মুযদালিফার সময় ১০ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। সুবহে সাদিকের পর স্বল্প সময় অবস্থানের পর মুযদালিফা ত্যাগ করলেও ওয়াজিব আদায় হবে যাবে। তবে সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করা সুন্নত। আর মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। -মানাসিক ২১৫, ২১৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩০, গুনয়াতুন্নাসেক ১৬৫
মাসআলা : উকূফে মুযদালিফা যেহেতু ওয়াজিব তাই বিশেষ ওযর ব্যতীত নির্ধারিত সময়ে উকূফ না করলে দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য ভীড়ের কারণে যদি সূর্যোদয়ের আগে মুযদালিফায় পৌঁছতে না পারে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। -মানাসিক ২১৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩১; আদ্দুররুল মুখতার ২/৫১১

উকূফের স্থান
মুযদালিফার ময়দানের যেকোনো অংশেই অবস্থান করা যাবে। মসজিদে মাশআরে হারামের নিকট উকূফ করা ভালো। অবশ্য মুযদালিফার বাইরে মিনার দিকে 'ওয়াদিয়ে মুহাস্সির' নামক স্থানে উকূফ করা যাবে না। কারণ এখানে উকূফ করা নিষিদ্ধ। এখানকার উকূফ ধর্তব্য নয়। -গুনয়াতুন্নাসেক ১৬৭
মাসআলা : অতিশয় বৃদ্ধ, দুর্বল কিংবা অধিক পীড়িত রোগীর জন্য মুযদালিফায় অবস্থান না করে আরাফা থেকে সোজা মিনায় চলে যাওয়ার অনুমতি আছে। এতে তাদের উপর দম বা কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। -মানাসিক ২১৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩১

১০ম যিলহজ্বের দ্বিতীয় ওয়াজিব জামরায়ে আকাবার রমী

রমীর পদ্ধতি
রমী অর্থ কংকর নিক্ষেপ করা। মসজিদে হারামের দিক থেকে সর্বশেষ কংকর নিক্ষেপের স্থানকে 'জামরা আকাবা' বলা হয়। এখানে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। কংকর নিক্ষেপের স্থানে যে চওড়া পিলার আছে তাতেই কংকর মারা জরুরি নয় বরং বেষ্টনীর ভিতরে পড়াই

যথেষ্ট। পিলারে কংকর লেগে তা যদি বেষ্টনীর বাইরে গিয়ে পড়ে তবে তা ধর্তব্য হবে না, ঐ কংকর পুনরায় নিক্ষেপ করতে হবে। আর পিলারের গোড়ায় মারা ভাল পিলারের উপর অংশে মারা অনুত্তম। -গুনয়াতুন্নাসেক ১৭১ রদ্দুল মুহতার ২/৫১২

কংকর সংগ্রহঃ প্রথম দিনের সাতটি কংকর মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করা মুস্তাহাব। অবশ্য অন্য জায়গা থেকে নিলেও কোনো ক্ষতি নেই। তবে জামরার নিকট থেকে নিবে না। কারণ, এই স্থানের পাথরগুলো হাদীসের ভাষ্যমতে আল্লাহ তাআলার দরবারে ধিকৃত। যাদের হজ্ব কবুল হয়নি তাদের কংকর এখানে পড়ে থাকে। পরবর্তী দিনের কংকর মুযদালিফা থেকে নেওয়া মুস্তাহাব নয়। জামরার নিকট ব্যতীত অন্য যেকোনো স্থান থেকে নিতে পারবে। -মানাসিক ২২২, গুনয়াতুন্নাসেক ১৬৮, আদ্দুররুল মুখতার ৫১৫

কংকরের ধরনঃ বুট বা ছোলার দানার মত ছোট কংকর মারা ভালো। বড়জোর খেজুরের বিচির মত হতে পারে। বড় পাথর মারা মাকরূহ। তদ্রূপ নাপাক কংকর মারাও মাকরূহ। কংকর নাপাক হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তা ধুয়ে নিক্ষেপের কাজে ব্যবহার করা যাবে। -মানাসিক ২২২

জামরা আকাবাতে রমীর সময়ঃ ১০ম যিলহজ্ব সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত সম্ভব হলে রমী করা মুস্তাহাব। তবে ১০ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে ১০ তারিখ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিক পর্যন্ত রমী করা জায়েয। বিনা ওজরে মুস্তাহাব সময় রমী না করে অন্য সময় রমী করা মাকরূহ। কিন্তু আজকাল যেহেতু মুস্তাহাব সময়ে রমীর স্থানে প্রচণ্ড ভীড় হয় তাই মহিলা ও দুর্বলদের মতো অন্যদের জন্যও মুস্তাহাব সময়ের বাইরে রমী করার অবকাশ রয়েছে। ওজর থাকার কারণে তা মাকরূহ হবে না। -গুনয়াতুন্নাসেক ১৬৯-১৭০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২৩৩

সাত কংকর একত্রে মারাঃ কেউ যদি সাত কংকর একবারে নিক্ষেপ করে তবে এক কংকর মারা হয়েছে বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে আরো ছয়টি কংকর পৃথক পৃথক মারতে হবে। -আহকামে হজ্ব ৭৫

মাসআলা : জামরা আকাবার রমীর পর দুআর জন্য এখানে অবস্থান না করাই সুন্নত। তাই আজ কংকর মেরে দুআর জন্য সময়ক্ষেপন করবে না। বরং কংকর মেরে দ্রুত স্থান ত্যাগ করবে। -মানাসিক ২২৪

সময় মতো রমী না করলেঃ ১০ তারিখ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিকের আগে জামরা আকাবার রমী করতে না পারলে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে দম ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্ াদ রহ.-এর মতে দম ওয়াজিব হবে না বেশি মাজুর ব্যক্তিগণ এ মতটি গ্রহণ করতে পারে। তবে ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের আগে আগে মেরে নিতে হবে। অন্যথায় পরে কংকর মারার অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে কংকর না মারার কারণে সবার মতেই ভিন্ন দম ওয়াজিব হবে। -আহকামে হজ্ব ৭৬

অন্যকে দিয়ে রমী করানোঃ প্রত্যেক হাজী পুরুষ হোক বা মহিলা, নিজের রমী নিজেই করবে। ভীড়ের কারণে কিংবা অন্য কোনো শরয়ী ওযর ব্যতীত অন্যের দ্বারা রমী করানো জায়েয নয়। শরয়ী ওযর ব্যতীত অন্যকে দিয়ে রমী করালে তা আদায় হবে না। এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে পুনরায় নিজের রমী করতে হবে। যদি না করে তবে দম ওয়াজিব হবে।

শরয়ী ওযর হল এমন অসুস্থতা বা দুর্বলতা যার কারণে বসে নামায পড়া জায়েয। অথবা অসুস্থতার কারণে জামরাত পর্যন্ত পেঁছা খুবই কষ্টকর হয় কিংবা রোগ অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে তবে এরূপ ব্যক্তি অন্যকে দিয়ে রমী করাতে পারবে। -আহকামে হজ্ব ৭৬-৭৭

মাসআলা : মাজুর ব্যক্তির পক্ষ থেকে রমী করার জন্য তার অনুমতি লাগবে। বিনা অনুমতিতে কেউ তার পক্ষ থেকে রমী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে অচেতন, পাগল এবং ছোট বাচ্চার অনুমতি ছাড়াই তাদের পক্ষ থেকে অভিভাবক রমী করে দিতে পারবে। -আহকামে হজ্ব ৭৭

মাসআলা : যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ থেকে রমী করবে, তার জন্য উত্তম হল প্রথমে নিজের রমী শেষ করবে তারপর বদলী করবে। একটি কংকর নিজের পক্ষ থেকে আর আরেকটি অন্যের পক্ষ থেকে এভাবে মারা মাকরূহ। তাই আগে নিজের সাত কংকর মারবে এরপর বদলী আদায় করবে। -আহকামে হজ্ব ৭৭

মাসআলা : ঋতুবর্তী মহিলাগণও রমী করতে পারবে।

১০ম যিলহজ্বের তৃতীয় ওয়াজিব

দমে শুকর বা হজ্বের কুরবানীঃ তামাত্তু ও কিরানকারি হাজীদের জন্য একটা কুরবানী করা ওয়াজিব। জামরায়ে আকাবার রমীর পর কুরবানী করবে, মাথা মুণ্ডাবে।

মাসআলা : ইফরাদ হজ্বকারীর উপর হজ্বের কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। তবে করলে ভালো।

মাসআলা : ইফরাদ হাজীদের যেহেতু কুরবানী নেই তাই তারা রমীর পরই চুল কাটতে পারবে। রমীর আগে চুল কাটলে দম ওয়াজিব হবে।

দমে শুকর বা হজ্বের কুরবানীর সময়ঃ ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিকের পর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সময়ের ভিতর কুরবানী করতে হবে। সুন্নত সময় শুরু হয় ১০ যিলহজ্ব সূর্যোদয়ের পর থেকে। -রদ্দুল মুহতার ২/৫৩২

কুরবানীর স্থানঃ

মাসআলা : হজ্বের কুরবানী হেরেমের সীমার ভিতরে করা জরুরি। হেরেমের বাইরে জবাই করলে তা দ্বারা হজ্বের কুরবানী আদায় হবে না। হেরেমের যেকোন স্থানে কুরবানী করতে পারে। মিনাতে করা জরুরি নয়। -রদ্দুল মুহতার ২/৫৩২

হাজীদের জন্য ঈদুল আযহার কুরবানীঃ মুসাফিরের উপর ঈদুল আজহার কুরবানী ওয়াজিব নয়। সুতরাং যারা ১০-১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুসাফির থাকবে তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যারা মিনায় রওয়া হওয়ার আগে মক্কাতেই ১৫ দিনের নিয়তে অবস্থান করেছে তারা মুকীম হবে। তাদের জন্য হজ্বের কুরবানী ছাড়াও ঈদুল আযহার ভিন্ন কুরবানী দিতে হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৫১৫

হজ্বের কুরবানীর গোশত

হজ্বের কুরবানীর গোশত হাজী নিজেও খেতে পারবে। এ কুরবানীর গোশতের হুকুম ঈদুল আযহার কুরবানীর মতোই।

হজ্বের কুরবানীর সামর্থ না থাকলেঃ তামাত্তু ও কিরানকারী হাজীদের কারো নিকট হজ্বের কুরবানীর সামর্থ না থাকলে তাকে এর পরিবর্তে ১০টি রোযা রাখতে হবে। ৩টি রোযা আরাফার দিন পর্যন্ত শেষ হতে হবে। আর বাকী সাতটি পরবর্তীতে সুযোগমতো রাখলেই চলবে। আরাফার দিন সহ তিনটি রোযা রাখা না হলে তার জন্য কুরবানী দেওয়াই জরুরি হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক কুরবানীর ব্যবস্থা করতে না পারলে চুল কেটে নিবে এবং পরবর্তীতে দুটি পশু যবেহ করবে। ১টি হজ্বের কুরবানী হিসাবে। আর অপরটি কুরবানী না করে চুল কাটার কারণে।

মাসআলা : হজ্বের কুরবানীতে ঈদুল আযহার কুরবানীর ন্যায় গরু, মহিষ, উটের সাত ভাগের একভাগ দিতে পারবে। এ ছাড়া ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা দেওয়ার সুযোগ তো আছেই।

১০ যিলহজ্বের চতুর্থ ওয়াজিব

মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা

মাথা মুণ্ডানোর সময়ঃ ১০ যিলহজ্বের দিন কুরবানীর পর থকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত মাথা মুণ্ডানোর সুযোগ আছে। এর চেয়ে বিলম্ব করলে দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য মাথা মুণ্ডানোর আগ পর্যন্ত ইহরাম অবস্থাতেই থাকতে হবে। এ সময় পাথর মারার কাজ করলে তাও ইহরাম অবস্থাতেই করতে হবে।-হিদায়া ১/২৭৬, গুজয়াতুল মানাসিক ১৭৫, রদ্দুল মুহতার ২/৫৫৪, বাদায়েউস সানায়ে ২/৩৩০, মাবসূতে সারাখসী ৪/৭০

চুল কাটার পরিমাণঃ মাথার চুল না মুণ্ডিয়ে যদি খাটো করে তবে আঙুলের এক কর (প্রায় এক ইঞ্চি) পরিমাণ ছোট করা ওয়াজিব। মহিলাগণ অন্তত এতটুকু ছেটে নিবে। এ পরিমাণ চুল মাথার এক চতুর্থাংশ থেকে কাটা হলেই হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু মাথার এক অংশ মুণ্ডিয়ে অন্য অংশে চুল রাখা বা ছোট বড় করে রাখা মাকরূহ তাহরীমী। তাই এমনটি করবে না। -রদ্দুল মুহতার ২/৫১৫

মাসআলা : মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটার আগে নখ বা শরীরের অতিরিক্ত পশম ইত্যাদি কাটা যাবে না। যদি কাটে তবে জরিমানা দিতে হবে।

মাসআলা : জামরা আকাবার কংকর নিক্ষেপের পর হজ্ব আদায়কারী নিজের চুল কাটার আগে অন্যের চুল কাটতে পারবে। কিন্তু নিজের চুল কাটার সময় হওয়ার পূর্বে অন্যের চুল কেটে দিলে যে কাটছে তার উপর এক ফিতরা পরিমাণ সাদকা করা জরুরি হবে। -আহকামে হজ্ব ৯৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫১২

মাসআলা : কারো মাথা পূর্ব থেকে মুণ্ডানো থাকলে কিংবা পুরো মাথা টাক থাকলে হালাল হওয়ার জন্য মাথায় ক্ষুর ঘুরিয়ে নিলেই চলবে। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২১২, রদ্দুল মুহতার ২/৫১৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩১

মাথা মুণ্ডানোর স্থানঃ হাজীদের ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য মিনাতে মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা সুন্নাত। হেরেমের সীমার ভিতর অন্য কোথাও করে নিলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। হেরেমের বাইরে মাথা কামালে দম ওয়াজিব হবে। -আহকামে হজ্ব ৭৯

হজ্বের তৃতীয় ফরয তাওয়াফে যিয়ারত

তাওয়াফে যিয়ারতের সময়ঃ সুন্নত হল জামরা আকাবার রমী, কুরবানী এবং মাথা কামানোর পর তাওয়াফ করা। আরাফায় অবস্থানের আগে তাওয়াফে যিয়ারত করলে তা দ্বারা ফরয তাওয়াফ আদায় হবে না। আরাফায় অবস্থানের পর ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিক থেকে ১২ যিলহজ্বের সূর্যাস্তের আগে এই তাওয়াফ করার অবকাশ রয়েছে। যদি ১২ তারিখ সূর্যাস্ত হয়ে যায় এবং তাওয়াফে যিয়ারত করা না হয় তবে দম দেওয়া জরুরি হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৫১৭, ৫৩৩, আহকামে হজ্ব ৮০

মাসআলা : তাওয়াফে যিয়ারত অসুস্থ হলেও নিজেকেই করতে হবে। প্রয়োজনে হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু অন্যকে দিয়ে করানো যাবে না। হাঁ, অচেতন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী তাওয়াফে যিয়ারত করা যাবে। আর সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য পায়ে হেঁটে তাওয়াফে যিয়ারত করা ওয়াজিব। পায়ে হেঁটে করার সামর্থ থাকাবস্থায় হুইল চেয়ারে করে বা অন্য কোনো বাহনে চড়ে তাওয়াফে যিয়ারত করা যাবে না। -রদ্দুল মুহতার ২/৫১৭

তাওয়াফে যিয়ারত রমল ও সায়ীঃ যারা মিনায় যাওয়ার পূর্বে সায়ী করেছে অর্থাৎ ইফরাদ হজ্বকারী তাওয়াফে কুদুমের পর এবং তামাত্তু ও কিরানকারী নফল তাওয়াফের পর, তাদের যেহেতু তাওয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী করতে হবে না তাই এই তাওয়াফে তাদেরকে রমলও করতে হবে না। অবশ্য যারা পূর্বে এভাবে সায়ী করেনি তাদের যেহেতু তাওয়াফের পর সায়ী করতে হবে তাই তাওয়াফে রমলও করতে হবে। -আহকামে হজ্ব ৮১

ঋতুমতি মহিলার তাওয়াফঃ স্রাব চলাকালীন তাওয়াফ নিষিদ্ধ। তাই পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগে পবিত্র হয়ে গেলে অবশ্যই এর ভিতরেই তাওয়াফ সেরে নিতে হবে। কিন্তু যদি ১২ তারিখ সূর্যাস্তের ভিতর পবিত্র না হয় তাহলে পবিত্র হওয়ামাত্র আদায় করে নিবে। এক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে কোনো জরিমানা আসবে না। -রদ্দুল মুহতার ২/৫১৯

পবিত্র হওয়ার আগেই দেশে ফিরতে হলেঃ যদি কোনো মহিলা হায়েয বা নেফাস অবস্থায় থাকার কারণে তাওয়াফে যিয়ারত করতে না পারে, আর তার দেশে ফিরার তারিখ হয়ে যায়। কোনোভাবে তা বাতিল বা দেরি করা সম্ভব না হয় তবে এই অপারগতার কারণে অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করে নিবে। আর একটি উট বা গরু দম হিসাবে জবাই করতে হবে। সাথে আল্লাহ তাআলার দরবারে ইস্তিগফারও করবে। তাওয়াফে যিয়ারত না করে দেশে যাবে না। অন্যথায় তাকে আবার মক্কায় এসে তাওয়াফ করতে হবে। যতদিন তাওয়াফ না করবে ততদিন স্বামীর সাথে থাকতে পারবে না। -রদ্দুল মুহতার ২/৫১৮-৫১৯

মাসআলা : কোনো মহিলার ওষুধ সেবনের কারণে যদি স্রাব একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তবে সে গোসল করে তাওয়াফ করতে পারবে।

হজ্বের ৪র্থ দিন ১১ যিলহজ্ব

মাসআলা : ১১ ও ১২ যিলহজ্বের রাত্রিতে মিনায় অবস্থান করা সুন্নত। কেউ যদি মিনায় না থাকে তবে সুন্নতের খেলাফ হবে বটে কিন্তু কোনো প্রকার জরিমানা দিতে হবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৩

১১ যিলহজ্ব রমীর সময়ঃ জোহরের সময় থেকে নিয়ে আগত রাত্রের সুবহে সাদিক পর্যন্ত রমীর সময়। তবে সম্ভব হলে সূর্যাস্তের আগে করে নেওয়া ভাল। সূর্যাস্তের পর মাকরূহ সময়। কিন্তু মহিলা, দুর্বল ও অধিক ভীড়ের কারণে সূর্যাস্তের পর রমী করতে কোনো অসুবিধা নেই।

মাসআলা : ১১ যিলহজ্ব তিন জামরাতেই রমী করতে হবে। প্রথম দুই জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করে কিবলামুখী হয়ে দুআ করা সুন্নাত। জামরায়ে আকাবার রমীর পর দুআ নেই। -সহীহ বুখারী ১/২৩৬, রদ্দুল মুহতার ২/৫২১

পঞ্চম দিন ১২ যিলহজ্ব

রমীর তৃতীয় দিনঃ ১২ যিলহজ্ব যোহরের সময় থেকে রাতের সুবহে সাদিক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশ্য সম্ভব হলে সূর্যাস্তের আগে রমী করা মুস্তাহাব। আজও তিন জামরাতেই কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

মাসআলা : ১১ ও ১২ তারিখ যোহরের পূর্বে রমীর সময় শুরুই হয় না। তাই এ সময় কেউ রমী করলে তা আদায় হবে না। প্রকাশ থাকে যে, ১১ ও ১২ তারিখে নির্ধারিত সময়ের ভিতর যদি কেউ রমী করতে না পারে তবে ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত তা কাযা করার (অর্থাৎ রমী করার) সুযোগ আছে। কিন্তু ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের আগে কাযা করতে না পারলে এরপরে আর রমী করার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে দম দেওয়া জরুরি। -রদ্দুল মুহতার ২/৫২১

১৩ যিলহজ্ব, রমী করা

মাসআলা : ১২ তারিখ দিবাগত রাতে মিনায় থাকা উত্তম এবং ১৩ তারিখ রমী করাও উত্তম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ দিন অর্থাৎ ১৩ তারিখ রমী করেই মিনা ত্যাগ করেছিলেন।

অবশ্য কেউ যদি ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে রমী করে মিনা ত্যাগ করতে না পারে তবে সূর্যাস্তের পর মিনা ত্যাগ করা মাকরূহ হবে। তবে এ কারণে দম বা কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি মিনায় ১৩ তারিখ সুবহে সাদিক হয়ে যায় তবে ঐ দিন রমী করা ওয়াজিব। রমী না করে চলে যাওয়া না জায়েয এবং এতে দম ওয়াজিব হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৫২১, আহকামে হজ্ব ৮৫

মাসআলা : ১৩ তারিখ যোহরের পূর্বেও রমী করা জায়েয। তবে যোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় হচ্ছে রমী করার সুন্নত ওয়াক্ত। -রদ্দুল মুহতার ২/৫২১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৩

তাওয়াফে বিদা

মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী হাজীদের জন্য মক্কা মুকাররামা ত্যাগ করার আগে একটি তাওয়াফ করা ওয়াজিব। একে তাওয়াফে বিদা বলা হয়। এই তাওয়াফটি মক্কা থেকে বিদায়ের সময় করা উত্তম। আর মক্কা ও মীকাতের ভিতর অবস্থানকারীদের জন্য তাওয়াফে বিদা ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। -রদ্দুল মুহতার ২/৫২৩

তাওয়াফে যিয়ারতের পর হাজী কর্তৃক আদায়কৃত যে কোন তাওয়াফ ছাড়া বিদায়ী তাওয়াফের ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

লক্ষণীয় :

হজ্বের মৌলিক বিষয়গুলো উপরে উল্লেখ করা হল। এ ছাড়া হজ্ব করতে গিয়ে ভুল। এছাড়া হজ্ব ভুল-ভ্রান্তি বা অন্য কারণে হাজীগণ আরো অনেক মাসআলার সম্মুখীন হতে পারেন সে ক্ষেত্রে কোনো নির্ভরযোগ্য আলেম থেকে তা জেনে নেওয়া আবশ্যক।

অনুশীলনী- ১৮ঃ সেপ্টেম্বর-৩য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা ফীল,

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (٥)

অর্থ : তুমি কি দেখনি যে, তোমার প্রতিপালক হাতি-ওয়ালাদের সাথে কিরূপ (আচরণ) করেছিলেন? (০১) তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন নি? (০২) তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়েছিলেন। (০৩) যারা তাদের উপর পোড়া মাটির কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিল। (০৪) অতঃপর তিনি তাদের চিবানো তৃণ-ঘাসের মতো করে দিয়েছিলেন। (০৫)

নামকরনঃ সূরা ফিল আল-কুরআনের ১০৫তম সূরা। এটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয় । এর আয়াত সংখ্যা পাঁচটি। ফিল অর্থ হাতি। এ সূরায় হস্তিবাহিনীর করুণ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় এ সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা ফিল।

শানে নুযুলঃ হাবশার বাদশাহর তরফ থেকে আরবের ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্তার নাম ছিল আবরাহা। সে ছিল খ্রিষ্টান। সে সানআ নামক স্থানে একটি সুন্দর ও বহু মণিমুক্তা খচিত গির্জা তৈরি করে । অতঃপর মানুষকে তার গির্জায় উপাসনার জন্য আহ্বান করে। সে চাইল মানুষ যেন মক্কা শরিফে অবস্থিত পবিত্র কাবাগৃহ ছেড়ে তার গির্জায় উপাসনার জন্য আগমন করে। কিন্তু মানুষ কাবাগৃহকে খুব সম্মান করত। সুতরাং তারা তার আহ্বানে সাড়া দিল না । তারা আগের মতোই কাবাগৃহে উপাসনা করতে লাগল। এতে আবরাহা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে চিন্তা করল- কাবাগৃহ ধ্বংস না করলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। এ জন্য সে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে কাবাগৃহ ধ্বংসের জন্য মক্কা নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সে বহু সৈন্য সংগ্রহ করে এবং ১৩টি বিশালকায় শক্তিশালী হাতি নিয়ে অগ্রসর হয়। আবরাহার আক্রমণের সংবাদ পেয়ে আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশদের পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বললেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন রাসুলুল্লাহ (স.)-এর দাদা ও কুরাইশদের সর্দার। তিনি জানতেন যে কাবা হলো আল্লাহর ঘর। সুতরাং এ ঘরের রক্ষার দায়িত্বও আল্লাহরই উপর । আব্দুল মুত্তালিবের নির্দেশে কুরাইশগণ পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নিল। পরদিন ভোরে আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে কাবা অভিমুখে রওয়ানা হলো। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করলেন। এগুলো ছিল একপ্রকার ছোট পাখি। এরা দুই পায়ে দুটি এবং ঠোঁটে একটি করে কংকর নিয়ে এলো। অতঃপর এগুলো আবরাহার বাহিনীর উপর নিক্ষেপ করল। ফলে আবরাহার সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। আর আবরাহা আহত অবস্থায় পালিয়ে গেল। পরে তার ক্ষতস্থানে পচন ধরে এবং ভয়ঙ্কর কষ্টের পর সে মারা যায় । এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঘরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন।

হস্তিবাহিনীর ঘটনাটি ৫৭০ সালে সংঘটিত হয়। আমাদের প্রিয়নবি (স.) এ বছরই জন্মগ্রহণ করেন। এ অলৌকিক ঘটনা তাঁর জন্মের ৫০দিন পূর্বে ঘটেছিল। আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করে এ বিশেষ ঘটনা সকলকে জানিয়ে দেন।

ব্যখ্যাঃ আয়াত-১

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِيۡلِ‌ؕ ١

তুমি কি দেখনি (কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য আগত) হাতীওয়ালাদের সঙ্গে তোমার প্রতিপালক কীরূপ ব্যবহার করেছিলেন?

(১) এখানে أَلَمْ تَرَ "আপনি কি দেখেননি" বলা হয়েছে। বাহ্যত এর দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কোন কোন মুফাসসির এর সমাধানে বলেন, এখানে শুধু কুরাইশদেরকেই নয় বরং সমগ্র আরববাসীকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তারা এই সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল। কুরআন মজিদের বহু স্থানে 'আলাম তারা' বা আপনি কি দেখেননি? শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নয় বরং সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করাই উদ্দেশ্য। [কুরতুবী]

অপর কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সে ঘটনার জ্ঞানকেও দেখা বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। তাছাড়া, এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে; যেমন কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, আয়েশা ও আসমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা দুজন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখেছিলেন। বাইহাকী: দালায়েলুন নাবুওয়াহ, ১/৫২] *[আত-তাহরীর ওয়াততানওয়ীর] তাফসীরে জাকারিয়া*

আয়াত-২ اَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِىۡ تَضۡلِيۡلٍ

তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি?

(১) যদি আয়াতটিকে পূর্বের আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ধরা হয়, তখন এ আয়াতটির অর্থ হয়, "তিনি কি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান নি?" পক্ষান্তরে যদি আয়াতটিকে প্রথম আয়াতটির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন এর অর্থ হবে, "আপনি কি দেখেন নি, তিনি তাদের উপর ঝাকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন?" [আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর]

আয়াত-৩ وَّ اَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا اَبَابِيۡلَ

(২) أبابيل শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে, ঝাঁকে ঝাঁকে, যা একটার পর একটা আসে। কারও কারও মতে, শব্দটি বহুবচন। (أَبَابِيل) আবাবিল পাখির ঝাঁক-কোন বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। [তাবারী] বলা হয়ে থাকে যে, এ জাতীয় পাখি পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। [কুরতুবী]

আয়াত-৪ تَرۡمِيۡهِمۡ بِحِجَارَةٍ مِّنۡ سِجِّيۡلٍ

(১) উপরে سجيل এর অর্থ করা হয়েছে, পোড়া মাটির কঙ্কর। [মুয়াস্‌সার] কারও কারও মতে, ভেজা মাটি আগুনে পুড়ে শক্ত হয়ে যে, কংকর তৈরি হয়, সে কংকরকে سجيل বলা হয়ে থাকে। [জালালাইন] আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ অতি শক্ত পাথরের কঙ্কর। [আদওয়াউল বায়ান]

আয়াত-৫ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَّاۡكُوۡلٍ

অতঃপর তিনি তাদেরকে করলেন ভক্ষিত শস্যপাতার ন্যায়।

(১) عصف এর অর্থ শুষ্ক তৃণ-লতা, শুকনো খড়কুটো।। কঙ্কর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সেনাবাহিনীর অবস্থা শুষ্ক তৃণ ভক্ষিত হওয়ার পর যা হয়, তদ্রুপই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। [তাবারী, ইবন কাসীর]

এ সূরা থেকে আমরা যে **শিক্ষা** পাই-

১. কাবা মহান আল্লাহর ঘর, আর এটি সংরক্ষণ তিনিই করবেন। দুনিয়ার কোনো শক্তি এটি ধ্বংস করার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না।
২. মহান আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা অসীম। পৃথিবীর কোনো শক্তি তাঁর মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়।
৩. যারাই মহান আল্লাহর নাফরমানি করবে, তিনি তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবেন।
৪. আল্লাহদ্রোহী ও নাফরমানদের শাস্তি শুধু পরকালেই হবে, তা নয় বরং দুনিয়াতেও তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে।
৫. ইসলামের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের সমস্ত কৌশল ও ষড়যন্ত্র মহান আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন। কেননা তিনিই সর্বোত্তম কৌশলী।

বইঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতিঃ
ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি
মূল নামঃ ইসলামী দাওয়াত আউর তরিকে কাম
লেখক- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

বইটির গুরুত্ব

১. বইটি নিরেট একটি সাংগঠনিক বই।
২. দায়ীদের উদ্দেশ্যে বইটি রচিত।
৩. যারা দ্বীনকে জীবন উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত তাদের উদ্দেশ্যে ।
৪. ইসলামকে জীবনাদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠাকারীদের জন্য বইটি গুরুত্বপূর্ণ।
৫. এটি ১৯৪৫ সালের ১৯শে এপ্রিল দারুল ইসলাম পাঠান কোটে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত আমীরে জামায়াতের ভাষণ।

ভুমিকায় ৩টি বিষয়ের আলোচনা ঃ

আমাদের দাওয়াতে হতাশার দিক

১. আমাদের আন্দোলন শুষ্ক, নীরস ও স্বাদহীন।
২. আমাদের দাওয়াত দুনিয়ার রাজনৈতিক বাজারে একটি অচল পণ্য।
৩. আমাদের কর্মনীতিতে আন্দোলনকে তীব্র ও জনগণকে আকৃষ্ট করতে বর্তমান কালের উপায় উপকরণ নেই।

আমাদের দাওয়াতে আশার দিক

১. ধীরে ধীরে বহু লোক আমাদের দাওয়াতে আকৃষ্ট হচ্ছে।
২. সম্মেলন সমুহে দূর-দুরান্ত থেকে লোকজন যোগদান করছে।
৩. এ সকল লোকদের আকর্ষণ নিশ্চিত সত্যের দিকে।

তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা

১. "মুসলিম লীগ" মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে ভারত বিভাগ করে পাকিস্তান কায়েমের আন্দোলন করে।
২. অপর দিকে"কংগ্রেস" অখন্ড ভারত রক্ষার আন্দোলনে জোরালো ভুমিকা রাখে।
৩. এ সময় জামায়াত রাজনৈতিক মিছিল-মিটিংএ যোগ না দিয়ে নীরবে দাওয়াত-সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য

অতীতের কাজ যাচাই করা, দোষ-ত্রুটিসমূহ অনুধাবন করা এবং তাহা দূর করবার জন্য চিন্তা করার অবসর লাভ করাই এই সম্মেলনের লক্ষ্য।

ক. আমাদের সম্মেলন সমুহের উদ্দেশ্য হলো

১. সদস্যগণের পরস্পর পরিচিতি, সংঘবদ্ধ ও গভীরভাবে মিলিত হওয়া।
২. পারস্পরিক পরামর্শ ও সহযোগিতার উপায় উদ্ভাবন করা।
৩. নিজেদের সাংগঠনিক কাজকে সামনের দিকে অগ্রসর করা।
৪. বিপদ, সমস্যা, বাধা-বিপত্তি সমুহ দূর করার পন্থা নির্ধারণ করা।
৫. অতীত কাজের দোষ-ত্রুটি অনুধাবন ও তা দূর করতে চিন্তা করার অবসর লাভ।
৬. সমর্থকদেরকে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দাওয়াত ও কাজ বুঝার সুযোগ করে দেয়া।
৭. সত্য নীতি সম্পর্কে মনের ভ্রান্ত ধারণা দূর হলে তারা জামায়াতে যোগদান করবে।

খ. সাধারণ লোকেরা কেন সম্মেলনে আসে

১. মুষ্টিমেয় কিছু লোক আল্লাহর নামে যে কাজ শুরু করেছে, তা সুক্ষ দৃষ্টিতে যাচাই করার জন্য।
২. প্রকৃত পক্ষে মুষ্টিমেয় লোকদের কাজ আল্লাহর জন্য কিনা তা অনুসন্ধান করার জন্য।

আমাদের দাওয়াত

ক. দাওয়াতী কাজে অভিযোগ বা বাধা

১. দাওয়াত দিতে গেলেই বলা হয়, আমরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার দাওয়াত দিই।
২. আমাদের লক্ষ্য বুঝানো হয়-আমরা ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনীতি করি।
৩. আমাদেরকে পার্থিব স্বার্থবাদী আখ্যা দেয়া হয়।

খ. অভিযোগ কারীদের ধারণা

১. অথচ মুসলমানরা তো দ্বীন-ইসলাম ও পরকালের জন্যই কাজ করে।
২. হুকুমত দাবী করার বস্তু নয়, ধার্মিক জীবন যাপনের কারণে আল্লাহর তরফ থেকে আসে।

গ. অভিযোগের কারণ ৩টি

১. প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝার কারণে।
২. চালাকীর সাথে করে, যাতে সাধারণ লোক সত্যের আন্দোলন/দাওয়াত থেকে বিরত থাকে
৩. আলেম-পীরেরা কেন রাজনীতির দাওয়াত দেয় না, তারাই ইসলাম বেশী বুঝে (নিজ)

ঘ. আমাদের উদ্দেশ্য বা চুড়ান্ত লক্ষ্য

১. মানুষের সামগ্রিক জীবনে ইসলাম নির্ধারিত পরিপূর্ণ বিপ্লব সৃষ্টি করা।
২. নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য-১টি মুসলিম জাতি গঠন, নবীদের কাজই এখন আমাদের।

ঙ. আমাদের দাওয়াত ৩টি দফাঃ

১. আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণঃ সাধারণতঃ সকল মানুষকে বিশেষত মুসলমানদেকে আহবান জানাই।
২. মুনাফেকী ত্যাগঃ যারা মুসলমান হওয়ার দাবী করে, তাদেরকে মুনাফেকী ও কর্মে বৈষম্য দূর করে ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশের দাওয়াত দিয়ে থাকি।
৩. নেতৃত্বের আমুল পরিবর্তন ঃ বাতিল, ফাসেকী ও কাফিরদের নেতৃত্বের আমুল পরিবর্তন করে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নেক বান্দাদের হাতে সোপর্দ করা।

চ. খোদার বন্দেগী সম্পর্কে কিছু লোকের ভ্রান্ত ধারণা

১. নিজকে বান্দা মনে করাই যথেষ্ট, নৈতিক-সমষ্টিগত জীবনে দাসত্ব না করলেও ক্ষতি নেই
২. আল্লাহকে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও মাবুদ স্বীকার করতে হবে এবং বাস্তব জীবনে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে আল্লাহকে অপসারিত করা অসংগত হবে না।
৩. ধর্মীয় জীবনে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, হালালহারামের কয়েকটি শর্ত মানাই বন্দেগী।
৪. বৈষয়িক ব্যাপারে খোদার বন্দেগী হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেমন-তামাদ্দুন, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি।

ছ. কাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম?

১. যতখানি কাফের জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই।
২. ততখানি তিব্রতার সাথে বন্দেগীর এই ভূল ধারণার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম।

জ. কেন আমাদের সংগ্রাম উল্লেখিত ধারণা সমুহ দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি ও রূপকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দিয়েছে।

মুনাফেকীর মুলকথা

ক. মুনাফেকীর নীতি ৪টি ঃ

১. ঈমান ও দ্বীনের সম্পূর্ণ বিপরীত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত দেখে সন্তুষ্ট হওয়া।
২. এর আমুল পরিবর্তন করে নিজের জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা না করা।
৩. প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা অনুকূল মনে করে তাথেকে নিজের ফায়দা হাসিলের চেষ্টা।
৪. কিছু লোক চেষ্টা করলেও তা আরেকটি ফাসেকী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে করে।

খ. খালেস-নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানের পরিচয়ঃ

১. যে জীবন ব্যবস্থার প্রতি ঈমান আনবে, তা জীবন-বিধান ও আইন হিসাবে চালু করবে।
২. এই পথে যতই প্রতিবন্ধকতা আসুক, আমাদের প্রাণ ব্যকুল ও কাতর হয়ে উঠবে।
৩. প্রকৃত ঈমান তার বিকাশে সামান্যতম বাধা বরদাশত করবে না।

গ. সুস্পষ্ট ভ্রান্ত ধারণাঃ

১. কিছু দেশে ইসলামের কিছু আইন-নীতি অক্ষতিকর মনে করে অনুগ্রহ করে চলতে দেয়।

২. সমগ্র জীবন দ্বীনের বিপরীত নিয়মে চলে, এতে ঈমানের ক্ষতি হয় না বলে মনে করে।

৩. এমনকি সেখানে কুফুরী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে স্থায়ী নিয়তি মনে করা হয়।

ঘ. বান্দাকে মুনাফেকী হতে পবিত্র করাই আমাদের লক্ষ্য

১. খোদার বন্দেগীর সঠিক ধারণা অনুযায়ী নিষ্ঠার সাথে প্রচেষ্টা চালাব।

২. আল্লাহ প্রদত্ত জীবন পদ্ধতি পূর্ণ জীবনে অনুসরণ করব।

৩. জীবনের ক্ষুদ্র কাজেও বাতিলের প্রভাব বরদাশত করবো না।

কর্মীর বৈসাদৃশ্যের তত্ত্বকথা

ক. কর্মীয় বৈসাদৃশ্য কাকে বলেঃ

১. কথা ও কাজের গরমিলকে বলে।

২. মুখে ঈমানের দাবী রেখে কাজে তার বিপরীত করাকে।

৩. বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করাকে।

৪. বন্দেগীর বিপরীত কাজ করাকে।

খ. বৈসাদৃশ্য, অসামঞ্জস্য, মুনাফেকীর ও বহুরুপী কাজের উদাহরণ

১. তাওহীদ, রেসালত, আখেরাত, শরীয়তকে মানার দাবী করে বৈষয়িক স্বার্থ লাভের জন্য বস্তুবাদী, তাওহীদের বিপরীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করার জন্য যাওয়া।

২. ঈমানের দাবী করে খোদার দুশমনদের রচিত আইনে স্থাপিত আদালতের বিচারের উপর নির্ভর করি।

৩. মসজিদে নামাজ আদায় ও বাইরে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নফসের অনুসরণ করি।

৪. একদিকে আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি প্রদান, অন্যদিকে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মুর্তির পুজা করা।

গ. দ্বীন সম্পর্কে বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা

১. ঈমান ও ইসলামের স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট হবে।

২. তাওহীদ-রেসালতের সাক্ষ্য ও নামাজ-রোজাসহ কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনেই যথেষ্ট।

৩. বাস্তব জীবনে দ্বীন ও ঈমান বিরোধী কর্মনীতি অবলম্বন করলে ঈমানের কোন ক্ষতি নেই।

ঘ. যার ফলশ্রুতিতে ক্ষতি হচ্ছে

১. ফাসেকী, কাফেরী, পাপ, নাফরমানী ও যুলুমকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।

২. ঈমানের বিপরীতে মুসলমানরা সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে-তা বুঝার জ্ঞানটুকু নেই। উদাহরণঃ লবনের খনিতে বিচ্ছিন্নভাবে যতলোক প্রবেশ করবে তারা লবনের সাথে মিশে যাবে।

ঙ. আমাদের আহবান

১. সম্পূর্ণ একমুখী নীতি-আদর্শের অনুসারী হয়ে দ্বীনের বিপরীত কাজ-কর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

২. ঈমানের দাবীকে গভীরভাবে উপলব্ধি ও তা পূরণ করার আহবান।

নেতৃত্বের মৌলিক পরিবর্তনের আবশ্যকথা

ক. ঈমানের দাবী / মুমীনের অনিবার্য দাবী- বর্তমান জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টি করা

১. যিনি নিজকে খোদার দাসত্বের নিকট সোপর্দ করেন।

২. জীবনে কোন প্রকার মুনাফেকী ও বৈসাদৃশ্যের ফাঁক না রাখেন।

৩. একনিষ্ঠ মুমীন হওয়ার চেষ্টা করেন-তার উপর।

খ. বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি কিসের উপর স্থাপিত

১. কুফরীর উপর-পুজিবাদ বা বস্তুবাদ =আমেরিকা
২. নাস্তিকতার উপর-কমিউনিজম ও সেকুলারিজম =তুরষ্ক
৩. শিরকের উপর-রাজতন্ত্র-সৌদি আরব =কুয়েত
৪. ফাসেকীর উপর-জাতীয়তাবাদ
৫. অসচ্চরিত্রতার উপর-গনতন্ত্র =বাংলাদেশ

গ. নেতৃত্বের মৌলিক পরিবর্তন কেন দরকারঃ এ কাজ না করলে ক্ষতি ৩টি

১. দুনিয়াতে খাঁটি মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়।

২. খোদার দাসত্বকে জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

৩. ভবিষ্যত বংশধরদের ইসলামের উপর বিশ্বাসী রাখা সম্ভব নয়।

ঘ. মুমীনের কর্তব্য

১. খোদার সন্তোষ অর্জন,

২. ধবংস ও বিপর্যয় থেকে সমাজকে রক্ষা,

৩. শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে পৌছতে বাধাঃ- প্রতিষ্ঠিত অসৎ নেতৃত্ব।

ঙ. কেন বিশ্বে অশান্তি-যুলুম বৃদ্ধি পায়ঃ বিবেকের মতামত কি?

১. কারণঃ বিশ্বের নেতারা অসৎ, ফাসেক, ফাজির, খোদাদ্রোহী, শয়তানের দাসানুদাসগণ।

২. ফলাফলঃ যুলুম, নির্যাতন, অশান্তি, বিপর্যয় ও অত্যাচার বৃদ্ধি পাবে।

চ. মুসলমানের অপরিহার্য কাজঃ

১. পথভ্রষ্ট নেতৃত্ব খতম করা।

২. কুফর ও শিরকের প্রধান্য বিচুর্ণ করা।
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সাধনা করা।

নেতৃত্ব পরিবর্তন কিরূপে হবে

ক. বিশ্ব পরিচালনার জন্য কি দরকার
১. যোগ্যতাঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান
২. শক্তিঃ আধুনিক প্রযুক্তি সমুহ
৩. বৈশিষ্ট্যঃ মৌলিক মানবীয় গুণাবলী
খ. যাদের হাতে আল্লাহ নেতৃত্ব দেবেন তাদের গুণাবলী ৪টি
১. ঈমানঃ যাদের খাটি ঈমান আছে
২. সততাঃ যারা প্রকৃতভাবে সৎ
৩. মানবিক যোগ্যতাঃ যাদের দেশ পরিচালনার অপরিহার্য গুণাবলী আছে।
৪. শক্তিঃ যাদের শক্তি ও ক্ষমতা কাফেরদের চেয়ে বেশী আছে।-(নূর-৫৫নং)
গ. আমাদের উদ্দেশ্যঃ ২টি
১. দল গঠনঃ ঈমান ও সৎ লোকদের একটি দল গঠন করা। -আলে ইমরান-১০৩
২. সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাঃ দুনিয়ার নেতৃত্ব কাফেরদের হাত থেকে সৎ ও ঈমানদারদের হাতে সোপর্দ করা তাওবা৩৩, ফাতাহ-২৮, সফ-৯
ঘ. আমাদের দাওয়াতের মুল আবেদনঃ
১. ঈমানদার ও সৎ লোকদের নিয়ে দল গঠন
২. নিষ্ঠাবান ইসলামের অনুসারী হওয়া
৩. তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিগত চরিত্র হবে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ
৪. সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ যোগ্যতার অধিকারী হবে

বিরুদ্ধতা ও উহার কারণ

ক. কাদের থেকে বিরোধীতা আসে
১. মুসলমানঃ সর্বপ্রথম দাওয়াতে বিরোধীতা আসে মুসলমানদের পক্ষ থেকে।
২. দ্বীনদারঃ আবার তাও মুসলমানদের মধ্যে যারা দ্বীনদার তারাই আগে বাধা দেয়।
৩. ইসলামী দলঃ তার মধ্যেও আবার বেশী তৎপর ধর্মপন্থী দলগুলো।
খ. আমাদের দাওয়াত সম্পর্কে অমুসলিমদের মন্তব্য
১. অমুসলিমরা আজ পর্যন্ত বিরোধীতার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হয় নাই।
২. ইসলাম সম্পর্কে একজন হিন্দু, শিখ ও ইংরেজও সত্য নয় একথা বলে নাই।
৩. ইহার বিরোধীতা করার প্রয়োজনীয়তাও প্রকাশ করে নাই।
৪. তারা একথাও বলেছে-যদি দেশে ইসলামের দাওয়াত আগেই পেশ করা হত এবং মুসলমানরা যদি তা কায়েম করার চেষ্টা করতো তবে দেশের অবস্থা ভিন্নরূপ হত।
গ. বিরোধীতার ধরণ
১. আমাদেরকে কেউ সম্মুখ দিক থেকে আক্রমন করতে পারে না-
২. তাই তারা পিছন দিক থেকে বিভিন্নভাবে আক্রমন করে বলেঃ
ঘ. দাওয়াত ঠিক আছে, তবে সমস্যা আছে-
১. দায়ীদের মধ্যে কিছু দোষ-ত্রুটি আছে।
২. এই কাজের জন্য সাহাবীদের মত লোক প্রয়োজন।
৩. এই যুগে এই দাওয়াত চলার মত নয়, ইহা অচল মতবাদ।
৪. মুসলমানদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে এ দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে না
ঙ. বিরোধীতাকারীদের পরিচয়
১. সর্ব প্রথমে যারা বাধা দিবে- পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব।
২. ধার্মিক ও মুত্তাকীরা-যাদের কপালে সিজদার চিহ্ন পড়ে গেছে।
৩. যারা ২৪ ঘন্টা ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা করে তারাও বিরোধীতা করতে সংকোচ করে না।
৪. তাদের পুত্র-ভ্রাতা কিংবা আত্মীয়দের আন্দোলনে যোগদান আদৌ সহ্য করতে পারে না।
চ. বিরোধীতার পরিবর্তে পুষ্প ও প্রশংসা আসত যদি আমরা
১. দাওয়াতকে নিছক একটি জ্ঞান-গবেষণা মূলক আন্দোলন হিসাবে পেশ করতাম।
২. এই উদ্দেশ্য বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে লোকদের আহবান না জানাইতাম।
ছ. নবী-রাসুলদের আন্দোলনের বিরোধীতার কারণ
১. কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের বিরোধীতা করার কারণ ঃ
২. শিরকের ভিত্তিতে স্থাপিত জীবন/সমাজ ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে খালিস তাওহীদের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে পেশ করার কারণে তারা তা গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না।
৩. বংশীয় প্রথা, আত্ম গৌরব, আভিজাত্য, পারিবারিক বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে তাওহীদের ভিত্তিতে জাতি গঠন করার আহবান জানানোর কারণে।
৪. অর্থনৈতিক ও পারিবারিক স্বার্থ-পরতা ও লোভ-লালসার প্রবৃত্তি ত্যাগ করে নৈতিক চরিত্রের মূলনীতি সমুহকে বাস্তব জীবনের ভিত্তি হিসাবে স্থাপিত করতে বলার কারণে। >> রাসুল (সা.) এই লক্ষ্যে একটি আন্দোলনের মাধ্যমে লোকদের সংঘবদ্ধ করে দেশের তাহযীব তামাদ্দুন ও নৈতিকতাকে আদর্শ দিয়ে পরিবর্তন করার চেষ্টা সাধনা করেছেন।

জ. বাতিল সমাজ ব্যবস্থার সাথে মুসলমানদের সমঝোতার ধরণ

১. মুসলমানরা বাতিল ব্যবস্থার সাথে সমঝোতার ফলে তাদের উপর বিরুধীতা আসে নাই।

২. এই সমঝোতায় বৈষয়িক ও ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা ছিল।

৩. পরহেজগারীর ধুম পড়া লোক পযন্ত বাতিল সমঝোতার সাথে জড়িত।

৪. বাতিল মতবাদের অধীনে তাকওয়া, ইবাদাতসহ কয়েকটি অনুষ্ঠান পালনেই যথেষ্ট মনে করা।

৫. বহু আধ্যাত্মিক লোকের বাতিলের সাথে সমঝোতার ফলে আধ্যাত্মিকতার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় নাই

৬. কুফর, জাহেলিয়াত, ফাসেকী ও ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদ ও ত্রুটি বর্ণনা করে মুখে সাহাবা যুগের মনোমুগ্ধকর চিত্র অংকন করা ইসলামের কর্তব্য পালনে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

৭. আত্মীয়-স্বজন, আগামীদেরকে বাতিল সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রাখা সম্পূর্ণ হালাল

ঝ. আমাদের মারাত্মক অপরাধ কি/কেন বিরুধীতা করা হচ্ছে

১. বাতিলের সাথে সকল সুযোগ সুবিধা ত্যাগ করতে বলছি।

২. নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দ্বীনের অনুসরণ করতে আহবান জানাচ্ছি।

৩. সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল, সময়-শ্রম উৎসর্গ করে চেষ্টা সাধনা করার আহবান জানাচ্ছি।

ঞ. আমাদের দাওয়াতকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হলে তাকে যে কোন একটি পথ বেছে নিতে হবে-

১. স্বার্থের কুরবানী বরদাশত করে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। অথবা

২. স্বীকার করার পর মনের দূর্বলতার দোহাই দিয়ে আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে হবে

ট. এই পথ অবলম্বন করা সহজ নয়ঃ কারণ-এতে

১. পরকালের গ্যারান্টি নষ্ট হয়ে যাবে।

২. আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে।

ঠ. এই জন্য বড় একটি দল তৃতীয় একটি পথ অবলম্বন করে

১. আমাদের দাওয়াত ও আন্দোলনকে ভুল বলতে পারে না

২. সত্যতা স্বীকার করলেও মুলনীতিকে বাদ দিয়ে বিশেষ কোন ব্যক্তির বিষোদাগার করে ঘোলাটে করে আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকে।

ড. পরিণামঃ তারা যুক্তি দিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করলেও খোদার মুখ বন্ধ করতে পারবে না।

আমাদের কর্মনীতি

ক. আমাদের র্কর্মনীতির উৎস

১. কুরআন

২. হাদিস এবং

৩. নবী-রাসুলদের কর্মনীতি

খ. যারা দাওয়াত গ্রহণ করে তাদের প্রতি কর্মনীতি/আহবান

১. খোদার দাসত্ব অনুযায়ী জীবন গড়ে তুলতে বলি।

২. কাজে নিজের ঐকান্তিকতার পরিচয় দিতে বলি।

৩. ঈমানের বিপরীত কাজ হতে নিজকে পবিত্র রাখতে বলি।

গ. আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে কর্মনীতি ত্যাগ করতে হবে

১. বড় হওয়ার লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের গগণচুম্বি স্বপ্ন-প্রাসাদ ধুলিস্যাৎ করতে হয়।

২. অবৈধ পথে অর্জন করা ধন-সম্পদ ত্যাগ করে সর্বহারা হতে হয়।

৩. জীবিকা নির্বাহের শরীয়ত বিরোধী পথ ত্যাগ ও পবিত্র পন্থা গ্রহণ করা, তা যতই নিকৃষ্ট হোক।

ঘ. উপরোক্ত কর্মনীতিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাথমিক যে অগ্নি পরীক্ষা/বাঁধা/সমস্যা আসে

১. প্রথমে পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয় স্বজন, তার ঈমানের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।

২. অনেক মানুষের মায়া মুহাব্বত ও স্নেহ নীড় বোলতার বাসায় পরিণত হয়।

ঙ. প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে যে তাকওয়ার সৃষ্টি হয়

১. যে তাকওয়া ফিকাহ শাস্ত্রের মান দন্ডের উত্তীর্ণ নয়।

২. যে তাকওয়া খানকা শরীফের মানদন্ডে অসম্পূর্ণ।

৩. কিন্তু সে তাকওয়া বিশ্ব পরিচালনার গুরু দায়িত্ব ও আমানাতের দুর্বহ ভার বহন করার মত।

৪. খানকার তাকওয়া একশত ভাগের এক ভাগও বহন করার মত নয়।

চ. দ্বিতীয় দায়িত্ব

নিকটবর্তী পরিবেশে সকল লোকদের মধ্যে দাওয়াত বিকীর্ণ করা।

ছ. দাওয়াতের ফলাফল বা লাভ ২টি

১. দাওয়াতের মাধ্যমে জীবনে ঈমান বিরোধী ভুলত্রুটি থেকে পরিশুদ্ধ করার অবকাশ পায়।

২. দাওয়াতের ফলে নিজের মধ্যে অনেক গুণ বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়।

জ. যে সব দিক হতে বিপদ/সমস্যা আসতে পারে

১. প্রথমে হতাশা ব্যাঞ্জক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

২. অপমানকর উক্তি ও ভর্ৎসনা করা।

৩. মুর্খতা মুলক কার্য দ্বারা অসম্মান করা।

৪. নানা প্রকার অভিযোগ ও দোষারোপ করা।

৫. ফেতনায় জড়ানোর উপায় অবলম্বন করা।

৬. ঘর হতে বিতাড়িত করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

৭. তার জীবন দুর্বিসহ করা।

ঝ. এ সব বিপদ মসিবতে কর্মীর মধ্যে যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়

১. সাহস হারা হয়ে সত্যের আন্দোলন থেকে বিরত থাকে না।
২. বাতিলের সামনে আত্মসমর্পন করে না।
৩. বিক্ষুব্ধ হয়ে বিবেক-বুদ্ধি হারায় না।
৪. বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা, বুদ্ধিমত্তা, নমনীয় দৃঢ়তা, স্থিরতা, সততা, পরহেজগারীর অধিকারী হওয়া
৫. একনিষ্ঠ মন নিয়ে নিজ আদর্শের উপর অটল অবিচল থাকে।
৬. পরিবেশকে অনুকুল করার অবিশ্রান্ত চেষ্টা চালায়।

ঞ. আদর্শ প্রচারে কুরআনে উপস্থাপিত কর্মীর কর্মনীতি

১. উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত উপস্থাপন করা।
২. স্বাভাবিক পদ্ধতিতে দ্বীনের মুলনীতির ভিত্তিতে বাস্তব জীবনের দাওয়াত পেশ করা।
৩. সাধ্যাতীত খোরাক দান না করা।
৪. খুটিনাটি বিষয় পেশ না করা ও অবৈজ্ঞানিক কাজ করতে নিষেধ করা।
৫. মৌলিক দোষ-ত্রুটি দুর করার আগে বাহ্যিক দোষ-ত্রুটি দুর করার চেষ্টা করা।
৬. অবজ্ঞা মিশ্রিত ব্যবহার না করা।
৭. মন্দের বিপরীতে উত্তম ব্যবহার।
৮. অত্যাচার ও নিপীড়নের ফলে ধৈর্য্য ধারণ করা।
৯. অর্থহীন কথাবার্তা উপেক্ষা করা।

ট. যে কর্মনীতির আলোকে লোকদেরকে আন্দোলনে টানা যায়

১. রিয়া ও প্রদর্শন মুলক কাজ হতে বিরত থাকা।
২. নিজেদের কীর্তি-কলাপ গৌরবের সহিত লোকদের সামনে পেশ না করা।
৩. সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা ও তার কাছে ফলাফল আশা করা।
৪. মনের মধ্যে সর্বদা আল্লাহর ভয় থাকা।
৫. তড়িৎ ফলাফল না আসলে কৃত্রিম ও প্রদর্শন মুলক কর্মনীতি গ্রহণ না করা।

ঠ. আমাদের রাজনৈতিক কর্মনীতি

১. বাতিল শাসন ব্যবস্থার আইন-আদালতের সাহায্য গ্রহণ করবো না।
২. জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মান রক্ষার জন্য বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করবো না।
৩. যারা এই সীমা লংঘন করবে তাদের জামায়াতের মধ্যে থাকতে দেয়া হবে না।
৪. যারা স্বার্থের-আত্মীয়তা রক্ষার জন্য মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়ে জামায়াতে তার স্থান নেই।

ড. আমাদের কর্মনীতির যুক্তিকতা ও স্বার্থকতা ৪টি

প্রথমতঃ আমরা একটি আদর্শবাদী জামায়াত কিনা তা প্রমাণ করা যায়।
দ্বিতীয়তঃ সদস্যদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার সন্দেহাতীত মানদন্ড।
তৃতীয়তঃ সদস্যরা আইনের পরিবর্তে নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে সমাজের সাথে সম্পর্ক করবে।
চতুর্থতঃ সমাজে নৈতিক ও বাস্তব অবস্থা উলংগ করে দেখা সম্ভব হয়। ধর্মের আবরণে লুকায়িতদের চরিত্র ফুটে উঠবে।

ঢ. শেষকথাঃ

আমাদের কর্মনীতিকে যাচাই করার আহবান

১. আমাদের কর্মনীতি কি ধরনের,
২. মানুষকে কোন দিকে ডাকছি এবং সেই দাওয়াত কতখানি সত্য,
৩. কুরআন ও হাদিসের সাথে সামঞ্জস্য আছে কি না,
৪. বর্তমান সমাজের রোগ প্রতিষেধক হিসাবে বাতিল মতবাদ নির্মূল করার মত কি না।

আলেম ও পীর সাহেবদের দোহাই

ক. আলেম ও পীর সাহেবদের প্রতি প্রশ্ন/ জিজ্ঞাসা

১. বড় আলিম ও পীর সাহেবরা কি দ্বীন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল নহেন ?
২. জামায়াত ইসলামের যে রূপ প্রচার করে থাকে, তারা কি তা বুঝতে পারে নাই।
৩. তাদেরকে বার বার বলা সত্ত্বেও তারা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নহে-তার কারণ কি।

খ. এই প্রশ্নের উত্তর

১. আমি (মওদুদী) দ্বীন-ইসলামকে বর্তমান ও অতীত ব্যক্তিদের থেকে বুঝতে চেষ্টা করি নাই।
২. ইসলামকে কুরআন ও রাসুলের সুন্নাহ থেকে বুঝার চেষ্টা করেছি।
৩. দ্বীন আমার ও ইমানদারের নিকট কী দাবী করে, তা জানার জন্য কোন বুজুর্গ ব্যক্তি কি করেন/বলেন-সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করি নাই।
৪. বরং আমি এক্ষেত্রে কুরআন ও নবী-রাসুলের কর্মনীতি বুঝার চেষ্টা করেছি।

গ. আলিম ও পীর সাহেবদের প্রতি আমার আহবান

১. গৃহীত কর্মনীতি কুরআনের নির্দেশ ও নবীদের কার্যকলাপ হতে প্রমানিত হয় কিনা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তা বিচার করুন।
২. আপনারা কুরআন ও সুন্নাহ হতে জ্ঞান লাভ করতে প্রস্তুত থাকুন।
৩. আপনারা আমার দাওয়াত গ্রহণ করে আমার সাথে মিলিত হোন।
৪. আমাদের দাওয়াতে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত কিছু থাকলে তা প্রমাণিত করুন।
৫. কুরআন-সুন্নাহ হতে সরে গেছি প্রমাণিত হলে সত্য গ্রহণে মুহুর্ত বিলম্ব করব না।
৬. কিন্তু হক ও বাতিলের প্রমাণ করার জন্য যদি কুরআনসুন্নাহ ব্যাতীত ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করেন, তা আপনাদের ইচ্ছাধীন।

দরবেশীয় বিদ্রুপ

ক. অনেকের অভিযোগ হলো

১. জামায়াতে ইসলামী কতগুলো দরবেশ ও দুনিয়া ত্যাগী লোকদের দল।

২. পৃথিবীর বাস্তবতা ও রাজনীতি থেকে তারা অনেক দূরে।

৩. মুসলমানদের বর্তমান সংকটপূর্ণ সময়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা তাদের নাই।

৪. যাদের বাস্তব জীবনের সমস্যার দিকে নজর বেশী, তারা এ আন্দোলনে যোগদিতে পারে না

খ. তাদের প্রতি উত্তর হল

বর্তমান রাজনীতিবীদরা স্থুলদৃষ্টি নিয়ে মাঠে নেমেছেন।

তারা শুধু রাজনৈতিক সমস্যা ও বাহ্যিক রদ-বদলকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

কিন্তু রাজনীতির প্রাসাদ যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাতে তাদের দৃষ্টি এখনো পৌছে নাই।

গ. বর্তমান (ভারতের) রাজনৈতিক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করার কারণ হচ্ছে

১. সমাজের নৈতিক চরিত্র, বিশ্বাস, তাহযীব যে ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল তা দুর্বল হয়ে পড়ে পথভ্রষ্ট ইঙরেজ্ ১টি জাতি (ইংরেজরা) সহস্র মাইল দূর থেকে এসে দেশকে পরাভূত করে।

২. মুসলমানদের এই পরাধীনতা ও দূর্বলতার সুযোগে তাদের প্রতিবেশী জাতি শক্তিশালী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা আরম্ভ করে। > তাই ঘরের শত্রুও বাইরের শত্রুকে মুকাবেলা করা জটিল হয়ে পড়ে।

ঘ. বর্তমান বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের কারণ

১. নিজেদের নৈতিকতা, তাহযীব, অর্থনীতি, রাজনীতির ভিত্তি রেখেছে খোদাদ্রোহী শক্তির উপর

২. ফাসেকী ও কুফুরী ব্যবস্থার বাহ্যিক রূপ পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৩. আমার (মওদুদী) দৃষ্টিতে-মুলতঃ ইসলামের দৃষ্টিতে এই রাজনীতি একেবারেই অর্থহীন।

ঙ. বর্তমান বিশ্ব মুসলিমের সমস্যা-জটিলতার সমাধান হচে

১. তার বিধানকে নিজেদের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা।

২. পৃথিবীর কর্তৃত্ব খোদাদ্রোহী, কাফির, ফাসিকদের থেকে নেকবান্দাদের হাতে তুলে দেয়া।

৩. সকলে মিলে খোদার দাসত্ব করা।

চ. আমরা কি রকম দল গঠন করতে চাই

১. যারা তাকওয়ার দিক থেকে সমাজের সাধারণ পরহেজগারদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর হবে।

২. বিশ্ব পরিচালনার যোগ্যতা-দক্ষতার দিক দিয়ে বর্তমান লোকদের থেকে বেশী অগ্রসর হবে

ছ. বর্তমানে পরহেজগারী মনে করা হয় ঘরের কোণায় বসে বাস্তব জগতের কাজ কর্মের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করাকে।

জ. বিপর্যয় সংশোধনের উপায় হচ্ছে

১. খোদার নেক বান্দাদের একটি সুসংবদ্ধ জামায়াত গঠন।

২. দলের প্রত্যেকটি লোক খোদাভীরু, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বাস ভাজন হবে।

৩. খোাদার মনোনীত চরিত্র ও গুণাবলীতে ভূষিত হবে।

৪. সে সংঙ্গে দুনিয়ার লোকদের পরাজিত করার মত বিশ্ব পরিচালনার যোগ্যতাও সর্বাধিক হবে >- আমাদের দৃষ্টিতে ইহা অপেক্ষা বড় রাজনীতি আর হতে পারে না।

জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের প্রতি মাওলানা মওদুদীর উপদেশ

১. জেনে বুঝে আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে দায়িত্ব নিয়েছেন, তা গভীরভাবে উপলব্ধি করুন এবং এই গুরু দায়িত্ব পালন করুন।

২. দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো অনুধাবন করে খুটিনাটি বিষয় গুলো পরিত্যাগ করে চলুন।

৩. অনেক কর্মীরা আদর্শ, উদ্দেশ্য ও মতবাদ বুঝেছে, কিন্তু কর্মনীতি আদৌ বুঝে নাই। তাই কর্মনীতিও ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করুন।

৪. স্থুলদর্শিতা, প্রদর্শন মুলক মনোবৃত্তি এবং দ্রুত ফলাফল পাওয়ার মানসিকতা পরিহার করুন।

৫. দাওয়াত ও প্রচারণার ক্ষেত্রে নির্মমতা ও কঠোরতা পরিহার করে সহজ ও সরলভাবে যুক্তির মাধ্যমে দাওয়াত উপস্থাপন করুন।

ইমানি পরীক্ষা সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল বাকারা: ২১৪, আনকাবুত: ১,২,৩ ও পৃষ্ঠা- ১১২

ইমানি পরীক্ষা সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, পৃষ্ঠা- ১১২

মাসয়ালা: হাজ্ব (পৃষ্ঠা-১১৭) ও নামাজ (পৃষ্ঠা-৮) সংক্রান্ত।

অনুশীলনী -১৯(**অক্টোবর-১ম সপ্তাহঃ**)

দারস তৈরী -সূরা হুজুরাত ১ম রুকু, বই: ইসলাম পরিচিতি, আনুগত্য সংক্রান্ত ১টি আয়াত মুখস্ত আন নিসা: ৫৯ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালা: আক্বিকা সংক্রান্ত।

অনুশীলনী -২০(**অক্টোবর-৩য় সপ্তাহঃ**)

সহী কোরআন তেলাওয়াত, নামাজে পঠিত আমপারার সূরাগুলোর সহী তেলাওয়াত ও অর্থ। দারস তৈরী -সূরা আহযাব (৩৫ নং আয়াত), বই: ইসলামী সংগঠন, বিভিনড়বদোয়া মুখস্ত, মাসয়ালা: আক্বিকা সংক্রান্ত।

অনুশীলনী -২১(**নভেম্বর -১ম সপ্তাহঃ**)

সহী কোরআন তেলাওয়াত, নামাজে পঠিত আমপারার সূরাগুলোর সহী তেলাওয়াত ও অর্থ। দারস তৈরী -সূরা ইখলাস, বইঃ পলাশী থেকে বাংলাদেশ, পরামর্শ সংক্রান্ত ১টি আয়াত ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালাঃ সাদাকা সংক্রান্ত।

অনুশীলনী -২২(**নভেম্বর -৩য় সপ্তাহঃ**)

নভেম্বর-৩য় সপ্তাহঃ

সহী কোরআন তেলাওয়াত, নামাজে পঠিত আমপারার সূরাগুলোর সহী তেলাওয়াত ও অর্থ। দারস তৈরী -সূরা কাউসার, বইঃ ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ, ত্যাগকুরবানী সংক্রান্ত ১টি আয়াত ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালাঃ নামাজ সংক্রান্ত।

অনুশীলনী -২৩(**ডিসেম্বর -১ম সপ্তাহঃ**)

ডিসেম্বর-১ম সপ্তাহঃ

সহী কোরআন তেলাওয়াত, নামাজে পঠিত আমপারার সূরাগুলোর সহী তেলাওয়াত ও অর্থ। দারস তৈরী -সূরা হজ্ব (১ ও ২ নং আয়াত), বইঃ ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্তআয়াত মুখস্ত আল-বাকারাঃ ২৬১, আল-ইমরানঃ ৯২, আল-হাদীদঃ ১১ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালাঃ দাফন-কাফন সংক্রান্ত।

অনুশীলনী -২৪(**ডিসেম্বর -৩য় সপ্তাহঃ**)

ডিসেম্বর-৩য় সপ্তাহঃ

সহী কোরআন তেলাওয়াত, নামাজে পঠিত আমপারার সূরাগুলোর সহী তেলাওয়াত ও অর্থ। দারস তৈরী -সূরা হাশর শেষ রুকু, বইঃ সত্যের সাক্ষ্য, তাওহিদ সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত সূরা বাকারাঃ ২৮৫ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, মাসয়ালাঃ দাফন-কাফন সংক্রান্ত।